Ὠριγένης (অরিগেনেস)

Περὶ εὐχῆς (প্রার্থনা প্রসঙ্গ)

Εἰς μαρτύριον προτρεπτικὸς λόγος (সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী)

গ্রীক পাঠ্য : P. Koetschau (1899)। পুস্তকটা on-line না থাকায়, বিকল্প গ্রীক পাঠ্য এই দু'টো লিংকে (প্রার্থনা প্রসঙ্গ, সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী) পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে Koetschau-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : December 8, 2022

Version 1.0.4 (June 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

অরিগেনেস

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

- অরিগেনেসের সংক্ষিপ্ত জীবনী
- লেখক হিসাবে অরিগেনেস
- অরিগেনেসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

- প্রস্তাবনা
- প্রার্থনা বিষয়ক সার্বিক আলোচনা
- প্রভুর প্রার্থনা - বিস্তারিত ব্যাখ্যা
- প্রার্থনা বিষয়ক অতিরিক্ত আলোচনা
- উপসংহার

সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী

- প্রারম্ভিক বাণী
- প্রতিমাপূজা ও বিশ্বাস-অস্বীকার বিষয়ে সাবধান
- বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকা
- সাক্ষ্যমরণে মাকাবীয় ভাইদের আদর্শ
- পাপক্ষমা লাভে সাক্ষ্যমরণের ভূমিকা
- খ্রিষ্টীয় জীবন আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎ
- বিশ্বাস ক্ষেত্রে অলসতা দণ্ডনীয়
- সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে শেষ উৎসাহ-বাণী

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)

গণনা (গণনা পুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

বিচারক (বিচারকগণ)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

২ শামু (শামুয়ের ২য় পুস্তক)

১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)

২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)

১ বংশ (বংশাবলি ১ম পুস্তক)

২ বংশ (বংশাবলি ২য় পুস্তক)

২ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

উপ (উপদেশক)

পরমগীত (পরম গীত)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

এজে (এজেকিয়েল)

দা (দানিয়েল)

হো (হোশেয়া)

হাবা (হাবাকুক)

জাখা (জাখারিয়া)

মালা (মালাখিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)
তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

অরিগেনেসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(ছবি Wikipedia থেকে নেওয়া)

অরিগেনেস ১৮৫ (বা ১৮৬) সালে রোম-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মিশর প্রদেশে, আলেক্সান্দ্রিয়া শহরে, একটা খ্রিষ্টিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা লেওনিদাস ছিলেন রোম-নাগরিকত্বের অধিকারী গ্রীক কৃষ্টির মানুষ; ও তাঁর মাতা, যাঁর নামা অজানা, সম্ভবত ছিলেন সাধারণ একজন মিশরীয় মহিলা। পিতা লেওনিদাস উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হওয়ায় নিজেই সন্তান অরিগেনেসকে সাহিত্য ও দর্শনবিদ্যা ছাড়া বাইবেল ও খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়েও শিক্ষাদান করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেকদিন অরিগেনেসকে বাইবেলের নানা অংশ মুখস্থ করাতেন; সেজন্য পরবর্তীকালীন জীবনে অরিগেনেস প্রয়োজন বোধে বাইবেলের দীর্ঘ অংশ অক্ষরে অক্ষরে অবাধে আবৃত্তি করতে পারতেন।

২০২ সালে রোম-সম্রাট সেপ্টিমিউস সেভেরুস এমন রাজাজ্ঞা জারি করেন যা অনুসারে যে যে রোমীয় নাগরিক খ্রিষ্টধর্ম প্রকাশ্যে পালন করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; পিতা লেওনিদাস অধিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হওয়ায় সেই রাজাজ্ঞা অনুসারে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে যান। সেসময় অরিগেনেসের বয়স মোটামুটি ১৭ বছর; তিনিও সাক্ষ্যমর হবার ইচ্ছায় নিজেকে ধরিয়ে দিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু তাঁর মা তাঁর কাপড় চোপড় লুকিয়ে রাখার ফলে তিনি ঘর থেকে বেরোতে পারেন না। পিতা লেওনিদাস রোমীয় নাগরিকত্বের অধিকারী হওয়ায় তাঁর শিরশ্ছেদ হলে (রোমীয় নাগরিকত্বের অধিকারী নয় এমন খ্রিষ্টিয়ানদের ক্রুশে দেওয়া হত) ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলে অরিগেনেস নয় ভাইবোনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ায় পরিবারের পুরো দায়িত্বভার গ্রহণ করে আলেক্সান্দ্রিয়ার ধর্মশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক পদে নিয়োগ অর্জন করতে কৃতকার্য হন, এবং শিক্ষাদানের পাশাপাশি বাইবেল ও দর্শনবিদ্যা অধ্যয়ন চালিয়ে যান।

আনুমানিক ২০৭ সালে তিনি শিক্ষক পদ ত্যাগ করে ভূমধ্য সাগরের পার্শ্ববর্তী নানা দেশের ধর্মশিক্ষা কেন্দ্রগুলো দেখবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করতে শুরু করেন; ২১২ সালে তিনি রোমে উপস্থিত, ও তাঁর মেধার কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগলে আরবের (আজকালের সিরিয়া ও যর্দান) রোমীয় প্রদেশপাল নিজেই ২১৩ (বা ২১৪) সালে অরিগেনেসকে দেখবার জন্য ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে গভীরতর পরিচিত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে আরবে আহ্বান করেন।

২১৫ সালে কারাকাল্লা বলে অভিহিত রোম-সম্রাট মার্কুস আউরেলিউস আন্তনিনুস আলেক্সান্দ্রিয়ায় যান। শহরের ছাত্ররা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে তিনি অপমানিত হয়ে শহর থেকে সকল শিক্ষিত মানুষকে নির্বাসিত করেন। তাই অরিগেনেসও শহর ছাড়তে বাধ্য হয়ে রোম-সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত পালেস্তিনীয় অঞ্চলের কায়েসারিয়া শহরে যান ও সেখানকার ও যেরুশালেমের বিশপদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হন; এমনকি বিশপদ্বয় তাঁকে নিজ নিজ গির্জায় উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। ব্যাপারটা আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ দেমেত্রিওসের কাছে জানা হলে বিশপ ভীষণ অসন্তোষ দেখান কেননা অরিগেনেস পুরোহিত না হওয়ায় তাঁর অনুমতি ছাড়া উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সাথে সাথে ব্যবস্থা করেন যাতে অরিগেনেস আলেক্সান্দ্রিয়ায় ফিরে আসেন।

আলেক্সান্দ্রিয়ায় ফিরে গিয়ে তিনি শিক্ষাদান, অধ্যয়ন ও বাইবেল সংক্রান্ত নানা ব্যাখ্যা-পুস্তক লেখায় নিবিষ্ট থেকে বার বার বিশপ দেমেত্রিওসকে পৌরোহিত্য শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হবার জন্য আবেদন রাখেন। উদ্দেশ্যটা ছিল, তিনি যেন গির্জায় উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু বিশপ কখনও তাতে সম্মত হন না।

২৩১ সালের দিকে, নানা স্থানে দীর্ঘ এক যাত্রাকালে, অরিগেনেস কায়েসারিয়াতে গিয়ে পৌঁছে সেখানকার বিশপকে পৌরোহিত্য শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হবার আবেদন রাখলে বিশপ সম্মত হয়ে তাঁকে পৌরোহিত্য প্রদান করেন। এবারও আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ দেমেত্রিওস ভীষণ অসন্তোষ দেখিয়ে অরিগেনেসের পৌরোহিত্য মেনে নেন না ও তাঁকে অনধীনতা দায়ে অভিযুক্ত করেন। ফলে অরিগেনেস আলেক্সান্দ্রিয়ায় ফিরে না গিয়ে কায়েসারিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হতে সিদ্ধান্ত নেন, আর এতেও বিশপ দেমেত্রিওস নিজেকে অপমানিত বোধ করে অরিগেনেসের বিরুদ্ধে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা অভিযোগ তোলেন যা অরিগেনেসকে ভ্রান্তমত কলঙ্কে কলঙ্কিত করে।

যাই হোক, কায়েসারিয়ায় থাকাকালে অরিগেনেস বিশপের অনুরোধে ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁর অভ্যাস মত শিক্ষাদান, অধ্যয়ন ও বাইবেল সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-পুস্তক লেখা চালিয়ে যান।

২৫০ সালে, খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে রোম-সম্রাট ত্রাইয়ানুস দেকিউসের জারীকৃত নির্যাতনকালে অরিগেনেস গ্রেপ্তার হয়ে দু' বছর ধরে নানা পীড়নযন্ত্রের অধীন হওয়া সত্ত্বেও খ্রিষ্টধর্ম অস্বীকার করেন না, এবং ২৫১ সালে সেই সম্রাটের মৃত্যুতে নির্যাতন শেষ হলে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু কারাবাসে থাকাকালে ভোগ করা সেই বহু পীড়ন ও ক্ষতের ফলে কয়েক মাস পরে মারা যান; এতে তিনি 'সাক্ষ্যদাতা' হলেন (নির্যাতনকালে যারা সাক্ষ্যদানের সময়েই প্রাণ দিতেন তাঁদের 'সাক্ষ্যমর' বলা হত, ও যাঁরা বেঁচে যেতেন, তাঁদের 'সাক্ষ্যদাতা' বলা হত)।

লেখক হিসাবে অরিগেনেস

অরিগেনেস বহু বহু ধর্মীয় লেখার লেখক; সবগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা। বাইবেল অধ্যয়ন সংক্রান্ত তাঁর প্রধান লেখার নাম হল 'হেক্সাপ্লা', অর্থাৎ তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় পুরাতন নিয়মের প্রচলিত ছ'টা পাঠ্য পাশাপাশি ছ'টা কলামে বিন্যস্ত করেন। অরিগেনেসের মৃত্যুর পরেও তাঁর এই লেখার অনুলিপি প্রধান প্রধান মণ্ডলীগুলোতে বিস্তার লাভ করে।

এ মহৎ লেখা বাদে যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, ইশাইয়া, উপদেশক ও যোহনের সুসমাচারের নানা কঠিন পদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা; আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, যোশুয়া, বিচারকগণ, শামুয়েল ১ম পুস্তক, নানা সামসঙ্গীত, পরম গীত, ইশাইয়া, যেরেমিয়া, এজেকিয়েল ও লুকের সুসমাচার সংক্রান্ত উপদেশসমূহ; ৩২ খণ্ড বিশিষ্ট যোহনের সুসমাচারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, ২৫ খণ্ড বিশিষ্ট মথির সুসমাচারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, ১৫ খণ্ড বিশিষ্ট রোমীয়দের কাছে পত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও পরম গীতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য।

ঐশতত্ত্ব ক্ষেত্রে ৪ খণ্ড বিশিষ্ট 'প্রাথমিক তত্ত্বমালা' ও ভ্রান্তমতপন্থী 'কেল্‌সোর বিপক্ষে' পুস্তক লেখেন।

খ্রিষ্টীয় সাধনা জীবন সংক্রান্ত লেখাগুলোর মধ্যে 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' ও 'সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী' পুস্তিকা দু'টো উল্লেখযোগ্য।

অথচ ‘কেল্‌সোর বিপক্ষে’, ‘প্রার্থনা প্রসঙ্গ’ ও ‘সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী’ বাদে, উপরে উল্লিখিত প্রায়ই সমস্ত লেখাগুলো আর নেই, সেগুলোর লাতিন ভাষায় অনূদিত আংশগুলো মাত্রই থেকে গেছে। এর কারণ হলো এই যে, অরিগেনেসের মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টীয় লেখকগণ দু’ভাগ হন তথা তাঁরা যাঁরা তাঁর সমর্থক ও তাঁরা যাঁরা তাঁকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে চিহ্নিত করছিলেন ও সেজন্য তাঁর লেখাগুলো নিজেরা পুড়িয়ে দিতেন ও অন্যান্যকে পোড়াতে উৎসাহিত করতেন। অরিগেনেসের সমর্থনকারীদের মধ্যে ছিলেন ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর সাধু বাসিল, সাধু গ্রেগরি, নিকেয়া-মহাসভার মহত্তম সমর্থক সাধু আথানাসিউস, ইতিহাসের লেখক এউসেবিওস, সাধু সিরিল, সাধু আম্ব্রোজ, সাধু আগস্তিন, সাধু যেরোম, অরিগেনেসের লেখাগুলোর লাতিন ভাষায় অনূবাদক তিরান্নুস রুফিনুস ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব, যদিও সাধু যেরোম পরবর্তীকালে তাঁর লেখাগুলো অসমর্থন করেন কিন্তু একই সময় সেই লেখাগুলোর যথেষ্ট অংশ নিজের লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

যাই হোক, অরিগেনেস যে প্রাচীন খ্রিষ্টিয়ান লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবিষয়ে আজকালেও কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জ্ঞান এমন ছিল যে, খ্রিষ্টধর্ম ক্ষেত্রে বিষয়টা মহৎ হোক বা খুঁটিনাটি হোক তিনি সমস্ত বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার পর নিজের সুচিন্তিত বা প্রস্তাবমূলক অভিমত প্রকাশ করতেন; তেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধির জন্যই তিনি সঙ্গতভাবে ‘আদামান্তিওস অরিগেনেস’ অর্থাৎ ‘হীরকের মত অখণ্ডনীয় অরিগেনেস’ বলেও পরিচিত। এদিকে একথা স্মরণযোগ্য যে, তিনি সেই খ্রিষ্টিয়ান লেখকদের অন্যতম যাঁরা ৪র্থ শতাব্দীর নিকেয়া-মহাসভার আগেকার মানুষ, সুতরাং সেই অন্যান্য লেখকদের মত তিনিও নানা ক্ষেত্রে এমন ধারণা ব্যক্ত করেন যা নিকেয়া-মহাসভা পরবর্তীকালে গ্রাহ্য করেনি; কিন্তু এর অর্থ এমনটা হতে পারে না যে, এই কারণে নিকেয়া-মহাসভার আগেকার সমস্ত লেখকগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিকেয়া-মহাসভার তত্ত্বসমূহের বিরুদ্ধ তত্ত্ব সমর্থন করতেন। এমনকি, নিজের সুচিন্তিত বা প্রস্তাবমূলক অভিমত সম্পর্কে অরিগেনেস নিজে বলতেন যে, নিজের অভিমত মণ্ডলীর কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিল না রাখলে, তাঁর সেই অভিমত যেন নির্দ্বিধায় বর্জন করা হয়, কেননা, তাঁর নিজের কথায়, তিনি জীবনকালে মণ্ডলীর বিশ্বস্ত সেবক ছাড়া অন্য কিছু হতে ইচ্ছা করেননি।

অরিগেনেসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

অরিগেনেসের সময়ে প্রচলিত পুরাতন নিয়ম ছিল সত্তরী বলে পরিচিত গ্রীক পাঠ্য যা আজকালের হিব্রু ভাষা থেকে অনূদিত পুরাতন নিয়মের সঙ্গে সূক্ষ্মতম মিল রাখে না।

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

একসময় অরিগেনেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আম্ব্রোজ ও তাতিয়ানা নামক অজানা একজন ভক্তপ্রাণ মহিলা তাঁকে প্রার্থনা বিষয়ে কিছুটা লিখতে অনুরোধ করেন। তিনি, আনুমানিক ২৩৩ বা ২৩৪ সালে, 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটা লিখে তাঁদের অনুরোধে সাড়া দেন।

পুস্তিকার প্রথম পর্বে তিনি 'প্রার্থনা' শব্দটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার পর ও যারা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন মনে করে তাদের যুক্তি খণ্ডন করার পর খ্রিষ্টীয় জীবনে ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ও ঈশ্বরের কাছে আত্মাকে উত্তোলন করার লক্ষ্যে প্রার্থনার উৎকৃষ্টতা ও উপকারিতা স্পষ্ট করে তোলেন। স্বয়ং প্রার্থনার গুরু সেই খ্রিষ্ট প্রভুর বাণীকে ভিত্তি করে তিনি আজকালের পাঠক-পাঠিকাকেও প্রেরণা দেন তারা যেন প্রার্থনাকালে পার্থিব নয় বরং স্বর্গীয় ও মহৎ বিষয়ই যাচনা করে। কেননা শুধু আত্মিক হয়ে উঠেই মানুষ উপযুক্ত ভাবে প্রভুর শেখানো প্রার্থনার মাহাত্ম্য ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে।

পুস্তিকার দ্বিতীয় পর্বে অরিগেনেস প্রভুর শেখানো প্রার্থনাকে অক্ষরে অক্ষরে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, আজকালের মানুষও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম যুক্তি ছাড়া তাঁর প্রেরণাপূর্ণ আধ্যাত্মিকতারও সামনে বিস্মিত না হয়ে পারে না।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

প্রস্তবনা

১। [১] এমন মহত্তম বিষয়গুলো রয়েছে যা মানুষের ঊর্ধ্বস্থিত হওয়ায় ও আমাদের নশ্বর প্রকৃতির চেয়ে বহুগুণে ঊর্ধ্বতম হওয়ায় বোধসীমিত ও মরণশীল মানবজাতির পক্ষে বোধ-অসাধ্য; অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিষয়গুলো বোধসাধ্য হয়ে ওঠে সেই বহুবিধ ও অসীম অনুগ্রহ গুণে যা আমাদের সীমাহীন অনুগ্রহের সেবাকর্মী সেই

যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা ও সহযোগী সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বর থেকে মানুষের উপর বর্ষিত। তাই, সমস্ত কিছু যা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যেহেতু মানব প্রকৃতির পক্ষে সেই প্রজ্ঞাকে অর্জন করা অসাধ্য ছিল (বাস্তবিকই দাউদ অনুসারে ঈশ্বর *প্রজ্ঞায় সবকিছু* (ক) গড়েছেন), সেজন্য যা অসাধ্য ছিল, তা আমাদের পক্ষে সাধ্য হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা *যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি* (খ)। *কোন্ মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানতে পারে? কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে? মরমানুষের চিন্তাধারা তো দুর্বল, আমাদের যত ধ্যানধারণাও তত সুস্থির নয়; কারণ ক্ষয়শীল এক দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়, মাটির এই তাঁবুও মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা। পার্থিব বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা, আমাদের পক্ষে তা যখন যথেষ্টই কঠিন, আমাদের নাগালে যা রয়েছে, তাও যখন শুধু কষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারি, তখন স্বর্গীয় বিষয় কে আবিষ্কার করতে পারে?* (গ)। এদিকে, স্বর্গীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করা যে মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তেমন কথা কেবা অস্বীকার করবে? অথচ যা অসাধ্য, তা *ঈশ্বরের অতিমহান অনুগ্রহ গুণে* (ঘ) সাধ্য হয়ে উঠেছে; আর আসলে যাঁকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তিনি সম্ভবত সেই তিনটে স্বর্গের বিষয়ের অনুসন্ধান করলেন, কারণ অকথনীয় এমন কথা শুনেছিলেন, যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই (ঙ)। আর কেইবা বলতে পারবে যে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের মন জানা সাধ্য? তবুও ঈশ্বর তেমনটাও মঞ্জুর করেন সেই খ্রিষ্টের দ্বারা [যিনি বলেন, '*আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি*'(চ)। যাঁরা সুসমাচার শোনেন, তাঁরা আনন্দিত হন] (ছ) যখন সুসমাচার তাঁদের সেই প্রভুর ইচ্ছা জানিয়ে দেয় যিনি তাঁদের প্রভু হতে আর ইচ্ছুক নন; যিনি আগে তাঁদের প্রভু ছিলেন, তিনি এখন নিজেকে তাঁদের বন্ধুতে পরিণত করেন। কিন্তু তবু, যেমন *মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেউই মানুষের অন্তরের কথা জানে না, তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না*'(জ)। তবে, যখন ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন মানুষের পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুটা জানা সাধ্য নয়। তবু ভালভাবে মনোযোগ

দাও কীভাবে এও সাধ্য হয়ে ওঠে, কেননা তিনি বলেন, '*আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি*'(ঝ)।

২। [১] এদিকে, হে অধিক ধর্মপ্রাণ ও আগ্রহী আম্ব্রোজ ও অধিক গুণবতী ও বীরত্বপূর্ণা তাতিয়ানা (কেননা তোমার সম্পর্কে আমি এতে নিশ্চিত আছি যে, যেমন একসময়ে সেই সারা, তেমনি তুমিও নারীজাতীয় সবকিছু ছেড়ে দিয়েছ (ক)), তোমরা হয় তো এতেই বিস্মিত যে, যখন আমার প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু হলো প্রার্থনা, তখন আমি কেনই বা আমার উপরের প্রস্তাবনায় এমন বিষয়াদির কথা বলেছি যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে সাধ্য হয়ে ওঠে। আমার দুর্বলতা যতদূর আমাকে বলতে দেয় সেই অনুসারে আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে, যা কিছু অসাধ্য, তার মধ্যে প্রার্থনা প্রসঙ্গে সূক্ষ্মরূপে ও ঈশ্বরোপযোগী ভাষায় কথা বলা অন্যতম—কেমন ও কেন প্রার্থনা করা উচিত, প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কী বলা উচিত, প্রার্থনার জন্য কোন সময় অন্য সময়ের চেয়ে অধিক উপযুক্ত [...] (খ); [তাছাড়া আমরা জানি যে সেই পল] যিনি নিজের পাওয়া ঐশপ্রকাশের মহত্ত্বের কারণে সতর্ক ছিলেন পাছে কেউই তাঁকে দে'খে ও তাঁর কথা শুনে তাঁর বিষয়ে বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করে (গ), তিনি নিজে স্বীকার করেন যে, 'কীবা প্রার্থনা করা উচিত' তা তিনি জানতেন না। বস্তুত তিনি বলেন, '*উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না*'(ঘ)। কেননা প্রার্থনা করা যে উচিত তা শুধু নয়, উচিত মত প্রার্থনা করা ও যা উচিত সেবিষয়ে প্রার্থনা করাও প্রয়োজন; কারণ যদিও আমরা বুঝতে পারতাম কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তবু তা যথেষ্ট হত না, যদি না সেই 'উচিত মত'ও যোগ না করতাম। একই প্রকারে, 'উচিত মত' প্রার্থনা করায় কী লাভ, যদি না জানি কিবা যাচনা করা উচিত?

[২] তবে দু'টো বিষয় দাঁড়াচ্ছে; আমি বলতে চাই: একদিকে, 'কীবা যাচনা করা উচিত', তা প্রার্থনার বস্তু সংক্রান্ত বিষয়; অন্যদিকে, 'উচিত মত' কথাটা প্রার্থীর মনোভাব সংক্রান্ত বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ এ হল কয়েকটা বিষয় যা 'কীবা প্রার্থনা করা উচিত' সংক্রান্ত: 'তোমরা মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ কর ও সামান্য বিষয়ও তোমাদের

বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে; স্বর্গীয় বিষয়ের অন্বেষণ কর ও পার্থিব বিষয় তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে’[ক]; *যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর*[খ]; *তোমরা ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান*[গ]; *তোমরা প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়*[ঘ]; *প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পালিয়ে যাওয়াটা শীতকালে বা সাব্বাৎ দিনে না ঘটে*[ঙ]; *আর প্রার্থনাকালে তোমরা বেশি কথা ব্যবহার করো না*[চ] ইত্যাদি সদৃশ বচনগুলো। আর ‘উচিত মত’ প্রার্থনা সংক্রান্ত একটা উদাহরণ এরূপ, *আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থানে পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক’রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প’রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক*[ছ]। এই বচনও ‘উচিত মত’ প্রার্থনা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে: *তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর*[জ]। কেননা পাপকর্মের দুর্গন্ধ জানে না এমন মন থেকেই যখন প্রার্থনা নিবেদিত, তখন যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীব তেমন প্রার্থনার সুগন্ধ ছাড়া ঈশ্বরের কাছে আর কী মহত্তর উপহার উত্তোলন করতে পারে? ‘উচিত মত’ প্রার্থনা সংক্রান্ত আর একটা উদাহরণ এটা, *তোমরা একে অন্যকে বঞ্চিত করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে সীমিত কালের মত পৃথক থাকতে পার; পরে আবার মিলিত হও, পাছে শয়তান তোমাদের দুর্বল আত্মসংযমের সুযোগ নিয়ে তোমাদের বিষয়ে উল্লসিত হয়*[ঝ]। কেননা ‘উচিত মত’ প্রার্থনার সার্থকতা হ্রাস পায় যদি না সেই দাম্পত্য-রহস্য যা সম্পর্কে পুরা নীরবতা বজায় রাখা মানায়, সেই রহস্য অধিক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ইচ্ছাকৃত ভাবে ও লালসাহীনভাবে সম্পাদিত হয়। কেননা এই বচনে যে “সম্মতির” কথা উল্লিখিত, সেই সম্মতি লালসার মতভেদ নিঃশেষিত করে, অসংযম ধ্বংস করে ও শয়তানকে অপকর্মে “উল্লাস করতে” বাধা দেয়। উল্লিখিত বচনগুলো ছাড়া এই বচনটাও ‘উচিত মত’ প্রার্থনা

সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করে, *আর যদি তুমি দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, তাহলে যদি কারও বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর* (ঞ) ; এবং পলে আমরা এটা পাই, *যে পুরুষ প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে; কিন্তু যে নারী প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে* (ট)। এই কথা 'উচিত মত' প্রার্থনা স্পষ্ট করে তোলে।

[৩] তাছাড়া, যিনি এ সমস্ত বচন জানতেন, এবং বিধান ও নবী-পুস্তকগুলো থেকে এবং সুসমাচারে প্রকাশিত সেগুলোর পূর্ণতা থেকে (ক) আর কতই নাকি বচন উল্লেখ করতে ও সেগুলোর এক একটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বৈচিত্রময় ব্যাখ্যা করতে পারতেন, সেই স্বয়ং পল নিজের স্বভাবের আত্মসংযম গুণে শুধু নয় বরং নিজের সত্যবাদিতা গুণেও এমনটা লক্ষ করেন যে, এসমস্ত জানা সত্ত্বেও তিনি "উচিত মত" প্রার্থনা বিষয়টা জানা থেকে বহুদূরে রয়েছেন, আর এজন্য তিনি *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না* (খ) কথাটা নিজের বক্তব্যে যোগ করেন; এতে তিনি বলতে চান যে, এক্ষেত্রে যা কিছুর অভাব, তা এমন ব্যক্তিকে যুগিয়ে দেওয়া হবে যে ব্যক্তি না জানলেও তবু নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে তার অভাব পূরণ করা হয়। বস্তুত তিনি বলেন চলেন, '*কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন*'(গ)। পবিত্রজনদের হৃদয়ে '*আব্বা, পিতা*'(ঘ) ডাকতে থাকেন যিনি, সেই পবিত্র আত্মা যেহেতু জানেন যে, পতিত ও পথভ্রষ্ট যারা, এই তাঁবুতে তাদের সেই আর্তনাদ তাদের আরও ভারাক্রান্ত করা ছাড়া বেশি কিছু করতে পারে না, সেজন্য তিনি মানবজাতির প্রতি মহা মঙ্গলময়তা ও নিজের করুণার সঙ্গে আমাদের আর্তনাদ আপন করে 'ঈশ্বরের কাছে অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন'। এবং নিজেতে যে প্রজ্ঞা রয়েছে, সেই প্রজ্ঞা গুণে তিনি যখন দেখতে পান, *আমাদের প্রাণ ধুলায় তলিয়ে রয়েছে* (ঙ) ও *হীনাবস্থার এই দেহে* (চ) বন্দি , তখন ঈশ্বরের কাছে সাধারণ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে নয়, বরং এমন *অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়েই আমাদের হয়ে প্রবল*

অনুরোধ করেন, যে আর্তনাদ সেই অকথনীয় কথারই সমরূপ যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই (ছ)। উপরন্তু, ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে অনুরোধ করায় তুষ্ট না হয়ে পবিত্র আত্মা বরং নিজের অনুরোধ আরও প্রবল করে 'অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে প্রবল অনুরোধ করেন'; আমার ধারণায় তিনি তাদেরই হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন যারা বিশেষভাবে বিজয়ী, যেইভাবে পল বলেন, '*এসব কিছুতে আমরা বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী*'(জ)। এক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে যে, তিনি কেবল তাদেরই হয়ে প্রার্থনা করেন যারা অধিক বিজয়ী বলে গণিত না হলেও তবু বিজয়ী ও নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না।

[৪] *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন* (ক) বচনটা *আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব* (খ) বচনটার সঙ্গে সম্পর্কিত; কেননা আমাদের মন প্রার্থনা করতে পারে না, যদি না তার আগে প্রথমে সেই আত্মাই প্রার্থনা করেন যাঁকে মন কেমন যেন শোনার জন্য প্রবৃত্ত; ফলে মন তাল, সুর ও লয় বজায় রেখে ও মৃদুকণ্ঠে খ্রিষ্টে পিতার গুণকীর্তন ও প্রশংসাগানও করতে পারে না, যদি না যিনি *সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন* (গ), সেই আত্মাই আগে তাঁর গুণকীর্তন ও স্তুতিগান করেন, যাঁর গভীরতম বিষয় তলিয়ে দেখেছেন ও সাধ্যমত তা উপলব্ধি করেছেন (ঘ)। প্রভু প্রার্থনা শেষ করলে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যিনি তাঁকে বলেছিলেন, '*প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজ শিষ্যদের শেখালেন*'(ঙ), আমার ধারণায় সেই শিষ্য নিজেতে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, কেমন করেই যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, মানব দুর্বলতা তা থেকে বহু দূরে রয়েছে; এবং পিতার কাছে প্রার্থনাকালে ত্রাণকর্তা যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মহান বাণী উচ্চারণ করছিলেন, তা শুনতে পেয়ে তিনি এবিষয়ে আরও নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন। পুরা বচনটা এরূপ, *একদিন তিনি এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন* (চ) [...] (ছ)। তবে এমনটা কি মেনে নিতে হবে

যে, বিধান-শাসন পালনে মানুষ হয়ে যে ব্যক্তি নবীদের বাণী অবিরতই শুনেছিলেন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজগৃহে যোগ দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি কোন "এক জায়গায়" প্রার্থনায় রত প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত প্রার্থনা করতে আদৌ জানতেন না? তেমনটা বলা অবশ্যই নির্বোধের কথা। কেননা তিনি ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী প্রার্থনা করতেন, কিন্তু এও দেখতে পেরেছিলেন যে, প্রার্থনা ক্ষেত্রে তাঁর আরও জ্ঞান লাভ করা দরকার ছিল। আরও, যে সমস্ত শিষ্য যেরুশালেম থেকে, সমস্ত যুদেয়া থেকে ও যর্দনের সমস্ত অঞ্চল থেকে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য যোহনের কাছে আসত (জ), প্রার্থনা সম্বন্ধে যোহন তাদের কীবা শেখাতেন যদি না নবীর চেয়েও মহাব্যক্তি হওয়ায় (ঝ) তিনি প্রার্থনা বিষয়ে এমন ধারণা পেয়েছিলেন, যা সকল দীক্ষাপ্রার্থীর কাছে নয়, সম্ভবত কেবল তাদেরই কাছে গোপনে শিখিয়ে দিতেন, যারা বিশেষ শিক্ষা পাবার আগ্রহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছে আসত? (ঞ)।

[৫] এমন প্রার্থনাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক ছিল এবং ছিল অপরূপ ও রহস্যময় তত্ত্বে পরিপূর্ণ, কারণ পবিত্রজনদের হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মা নিজেই প্রার্থনা করেন। রাজাবলির প্রথম পুস্তকে আন্নার প্রার্থনা আংশিকভাবে রয়েছে, কেননা তিনি *প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে করতে* যেহেতু *নিজের হৃদয়েই প্রার্থনা করছিলেন* (ক), সেজন্য পুরা প্রার্থনা লিপিবদ্ধ হয়নি। ১৭ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হলো 'দাউদের প্রার্থনা', ৮৯ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হলো 'ঈশ্বরের লোক মোশির প্রার্থনা,' এবং ১০১ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হল, 'দুঃখীর প্রার্থনা: অবসন্ন হয়ে সে প্রভুর কাছে মনের কথা ভেঙে বলে।' তেমন প্রার্থনাগুলো যেহেতু পবিত্র আত্মা দ্বারাই সত্যিকারে গঠিত ও ব্যক্ত, সেজন্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞার নির্দেশগুলিতেও পরিপূর্ণ, ফলে সেগুলির মধ্যে যা যা প্রতিশ্রুত, তার বিষয়ে বলা যেতে পারে: কে এমন প্রজ্ঞাবান যে একথা উপলব্ধি করবে? কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে? (খ)।

[৬] সুতরাং, যেহেতু প্রার্থনা বিষয়ে আলোচনা করা এমন কঠিন কাজ যে, আমাদের পক্ষে পিতা দ্বারা আলোকিত হওয়া, প্রথমজাত বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া, ও আত্মা দ্বারা উপকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেজন্য যেন তেমন উৎকৃষ্ট বিষয় উপলব্ধি করা ও সেই

বিষয়ে উপযোগী কিছু কথা বলা সম্ভব হতে পারে আমি মানুষ হিসাবে প্রার্থনা বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আত্মার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তেমন বিষয়ে আমাকে পূর্ণ ও আত্মিক জ্ঞান মঞ্জুর করা হয়, ও সুসমাচারে লিপিবদ্ধ প্রার্থনাগুলোও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং এখন আমি প্রার্থনা বিষয়ক আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি।

প্রার্থনা বিষয়ক সার্বিক আলোচনা

‘এউখে’ ও ‘প্রসেউখে’ শব্দদ্বয় সম্পর্কে

৩। [১] ‘প্রার্থনা’ [εὐχὴ, ‘এউখে’] কথাটার যে প্রথম উল্লেখ আমি লক্ষ করতে পেরেছি, তা তখনই ব্যবহৃত যখন নিজের ভাই এসৌর রোষ থেকে পালাবার সময়ে যাকোব ইসহাক ও রেবেকার পরামর্শমত মেসোপতামিয়ার দিকে রওনা হচ্ছিলেন। পাঠ্যটা এরূপ, ‘যাকোব এই বলে এই প্রার্থনা (ক) প্রার্থনা করলেন, ঈশ্বর যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং এই যে যাত্রা করছি, তিনি যদি সেই যাত্রাপথে আমাকে রক্ষা করেন, তিনি যদি আমাকে আহারের জন্য খাদ্য ও পরনের জন্য বস্ত্র দান করেন ও সুষ্ঠুভাবে পিতৃগৃহে ফিরিয়ে আনেন, তবে প্রভু হবেন আমার আপন ঈশ্বর, এবং এই যে পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তা আমার জন্য ঈশ্বরের গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, আমি তার দশমাংশ তোমাকে অর্পণ করব (খ)। [...] (গ)।

[২] উল্লিখিত বচনে এটা লক্ষ করার বিষয় যে, ‘প্রার্থনা’ [εὐχὴ, ‘এউখে’] শব্দটা ‘প্রসেউখে’ [προσευχή] শব্দ থেকে বহুবার ভিন্ন অর্থ বহন করে, বিশেষভাবে তখনই যখন এমন ব্যক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে ব্যক্তি মানত ক’রে এমন অঙ্গীকার করে যে, ঈশ্বর থেকে নির্দিষ্ট কোন কিছু পেলে সে কিছু না কিছু করবে। যাই হোক, শব্দটা সেই অর্থেও ব্যবহৃত যে অর্থ অনুসারে আমরা নিজেরা সাধারণত তা ব্যবহার করি (ক)। তাই যাত্রাপুস্তকে, দশ আঘাতের মধ্যে দ্বিতীয় যে আঘাত, সেই বেঙ-আঘাতের পরে আমরা শব্দটা এই অর্থ অনুসারে পাই। [সেসময় ফারাও মোশি ও আরোনকে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে আজ্ঞা করেছিলেন যেন তিনি ফারাও ও তাঁর জনগণের কাছ থেকে সেই সমস্ত বেঙ সরিয়ে দেন যা সবকিছু দখল করেছিল। বচনটা এরূপ,] (খ) *ফারাও তখন*

মোশি ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর [Εὔξασθε, ‘এইক্সাস্থে’] *যেন তিনি আমা থেকে ও আমার জনগণের মধ্য থেকে এই সমস্ত বেঙ দূর করে দেন; তাহলে আমি জনগণকে যেতে দেব, তারা যেন প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারে* (গ)। আর এক্ষেত্রে কেউ না কেউ এমনটা অবিশ্বাস্য মনে করে যে, ফারাও দ্বারা উচ্চারিত ‘প্রার্থনা’ [Εὔξασθε, ‘এইক্সাস্থে’] শব্দটা আগেকার উল্লিখিত ‘প্রার্থনা’ [εὐχὴ, ‘এউখে’] শব্দটা থেকে আগত ও একই সাধারণ অর্থ অনুসারেও ব্যবহৃত, তাহলে সে পরবর্তী বচনটা লক্ষ করুক, *মোশি ফারাওকে বললেন, আপনি নিজেই সেই সময় স্থির করুন, কবে আপনার, আপনার পরিষদদের ও জনগণের জন্য আমাকে প্রার্থনা করতে হবে* [Εὔξασθε, ‘এইক্সাস্থে’] *যেন আপনার ও আপনার জনগণের কাছ থেকে ও আপনার সমস্ত ঘর থেকে বেঙগুলো সরিয়ে দেওয়া হয় ও বেঙ যেন কেবল নদীতেই থাকে* (ঘ)।

[৩] আমরা লক্ষ করেছি যে, তৃতীয় আঘাত, মশার সেই আঘাতে, ফারাও কোন প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করেননি, মোশিও প্রার্থনা করেননি। চতুর্থ আঘাতে তথা ডাঁশের আঘাতে তিনি বলেন, ‘*আমার হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর*’(ক), এবং মোশি বললেন, ‘*আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, যেন ফারাও, তাঁর পরিষদ ও তাঁর জনগণ থেকে আগামীকাল যত ডাঁশের ঝাঁক দূরে যায়*’(খ), এবং একটু পরে বলা রয়েছে, *মোশি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন* (গ)। আরও, যদিও পঞ্চম ও ষষ্ঠ আঘাতে ফারাও প্রার্থনার জন্য কোন অনুরোধ রাখেন না ও মোশিও প্রার্থনা করেন না, তবু সপ্তম আঘাতে *ফারাও লোক পাঠিয়ে মোশি ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, এবার আমি পাপ করেছি! প্রভু ধর্মময়, আমি ও আমার জনগণই দোষী। তাই তোমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরের বজ্রধ্বনি, শিলাবৃষ্টি ও আগুন বন্ধ হয়* (ঘ)। এবং কয়েক পদ পরে লেখা আছে, *মোশি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে প্রভুর দিকে হাত বাড়ালেন ও বজ্রধ্বনি বন্ধ হল* (ঙ)। শাস্ত্র আগের মত ‘তিনি প্রার্থনা করলেন’ না বলে কেনই বা ‘তিনি প্রভুর দিকে হাত বাড়ালেন’ বলে, এবিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা যেতে পারবে। অষ্টম আঘাতে ফারাও বলেন, ‘*তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমা*

থেকে এই মরণ দূর করে দেন। এবং মোশি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন’(চ)।

[৪] আমরা বলেছিলাম, ‘এউখে’ [εὐχὴ, ‘প্রার্থনা’] শব্দটা বহুবার সাধারণ ব্যবহারের চেয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত, যেমন যাকোব সংক্রান্ত সেই বচনে ব্যবহৃত (ক)। লেবীয় পুস্তকও সেইভাবে ব্যবহৃত, *প্রভু মোশিকে বললেন, ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: যদি কেউ প্রভুর উদ্দেশে নিজের প্রাণের মূল্যে মানত করে, তবে কুড়ি বছর থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষের মূল্য হবে পবিত্র ওজন অনুযায়ী পঞ্চাশ রুপোর দিদ্রাক্মা* (খ)। এবং গণনা পুস্তকে *প্রভু মোশিকে বললেন, ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যখন প্রভুর উদ্দেশে নিজেকে পৃথক রাখবে বলে বিশেষ মানতে নিজেকে আবদ্ধ করবে, তখন সে আঙুররস ও উগ্র পানীয় থেকে নিজেকে পৃথক রাখবে* (গ), এবং পরবর্তী বচনগুলো সেই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যাকে ‘নাজিরীয়’ বলে অভিহিত। তারপর, কয়েক পদ পরে, লেখা রয়েছে, *যে দিনে সে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেকে পবিত্রীকৃত করে, সেই একই দিনে সে মানত-কাল ধরে নিজের মাথা পবিত্রীকৃত করবে* (ঘ)। এবং এক পদ পরেও লেখা রয়েছে, *যে সেই মানত করেছিল, যে দিন সে নিজের মানত-কাল পূরণ করবে, সেই দিনে তার জন্য এটাই হবে বিধান* (ঙ); এবং কয়েক পদ পরে লেখা রয়েছে, *এরপর, যে সেই মানত করেছিল, সে আঙুররস পান করতে পারবে। যে কেউ নিজের মানতের জন্য প্রভুর কাছে নিজের মানত সংক্রান্ত অর্ঘ্য নিবেদন করে, তার হাত পবিত্রীকরণ-বিধান অনুসারে যা কিছু পায়, তা বাদে, যে সেই মানত করেছে, তার জন্য বিধান এই* (চ)। এবং গণনাপুস্তকের শেষের দিকে আমরা পড়ি, *মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর নেতাদের বললেন: এটাই সেই বাণী যা প্রভু আজ্ঞা করেছেন: কোন পুরুষ যদি প্রভুর উদ্দেশে মানত করে, বা শপথ করে ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে বা নিজের প্রাণের দিব্যি দিয়ে ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে, তবে সে নিজের কথা লঙ্ঘন করবে না, নিজের মুখ থেকে যে সমস্ত কথা নির্গত হল, সেই অনুসারে ব্যবহার করবে। কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে নিজের পিতৃগৃহে বাস করার সময়ে প্রভুর উদ্দেশে মানত করে ও নিজের প্রাণকে ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ করে, এবং তার পিতা যদি তার মানত, ও যা দিয়ে সে নিজের প্রাণ আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধনের কথা শুনে তাকে কিছু না বলে, তবে*

তার সকল মানত বলবৎ থাকবে, এবং যা দিয়ে সে নিজের প্রাণ আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকবে (ছ)। এবং একথার পর পরে এমন বিধান রয়েছে যা তেমন স্ত্রীলোক সংক্রান্ত। একই অর্থে প্রবচনমালায় লেখা রয়েছে, [*আমার মিলন-যজ্ঞ দেওয়ার কথা ছিল; আজ আমি আমার মানত পূরণ করব* (জ); আরও, *নির্বোধ সন্তান নিজের পিতার লজ্জার বস্তু, ভাড়াটে বেশ্যার নিবেদিত প্রার্থনাগুলো শুচি নয়* (ঝ), এবং *কোন কিছু হঠাৎ করে পবিত্রীকৃত করা মানুষের পক্ষে ফাঁদস্বরূপ*] (ঞ); *কেননা তেমন মানত করার পর সে মন পাল্টাতেও পারে* (ট)। এবং উপদেশকে লেখা রয়েছে, *মানত করে তা পূরণ না করার চেয়ে বরং মানত না করাই শ্রেয়* (ঠ)। এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে আমরা পড়ি, *আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যাদের মানত রয়েছে* (ড)।

৪। [১] আমার এমনটা যুক্তিহীন মনে হল না যে, আমি সর্বপ্রথমে শাস্ত্র অনুযায়ী অর্থ নির্দিষ্ট করব, যেহেতু ‘এউখে’ [εὐχὴ] শব্দটার দ্বিবিধ অর্থের অধিকারী। ‘প্রসেউখে’ [προσευχή] শব্দটার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি, এই যে শব্দ, যা প্রায়ই তার সাধারণ ও স্বাভাবিক অর্থ অনুসারে ব্যবহৃত, সেই অর্থ ছাড়া, আমাদের কাছে যে অর্থ অসাধারণ তথা ‘এউখে’ [εὐχὴ, ‘প্রার্থনা’] অসাধারণ অর্থ অনুসারেও ব্যবহৃত হয় [তথা ‘মানত’], এবং শামুয়েলের প্রথম পুস্তকে আন্নার বেলায় শব্দটা ঠিক সেই অসাধারণ অর্থ অনুসারেই ব্যবহৃত: *যাজক এলি সেসময়ে প্রভুর মন্দিরদ্বারের বাজুর পাশে নিজের চৌকিতে বসে ছিলেন। মর্মজ্বালায় আন্না তিক্ত অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা* [προσευχή, ‘প্রসেউখে’] *করছিলেন। তিনি এই বলে মানত* [εὐχὴ, ‘এউখে’] *করলেন, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান দাও, তাহলে আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না* (ক)।

[২] তথাপি, ‘তিনি প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা [προσευχή, ‘প্রসেউখে’] করছিলেন’ ও ‘তিনি মানত [εὐχὴ, ‘এউখে’] করলেন’ বাক্য দু’টো তুলনা করলে তবে একজন এমনটা বলতে পারে যে, আন্না যদি দু’টো জিনিস করে থাকেন তথা, ‘প্রভুর উদ্দেশে

প্রার্থনা করলেন’ ও ‘মানত করলেন’, তাহলে ‘তিনি প্রার্থনা করলেন’ সেই অর্থে ব্যবহৃত যে অর্থ অনুসারে আমরা সাধারণত ‘এউখে’ শব্দটা ব্যবহার করি, অন্যদিকে ‘তিনি মানত করলেন’ বাক্যটা সেই অর্থে অর্থেই ব্যবহৃত যে অর্থ আমরা লেবীয় ও গণনাপুস্তকে দেখেছিলাম (ক)। কেননা ‘আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব’ বাক্যটা প্রকৃতপক্ষে একটা ‘প্রসেউখে’ নয়, বরং সেই ‘মানত’ [‘এউখে’] যা যেফ্তা এই বচনে মানত করেছিলেন, *যেফ্তা প্রভুর কাছে একটা মানত মানত করলেন, তিনি বললেন, তুমি যদি আম্মোন-সন্তানদের আমার হাতে তুলে দাও, তবে আমি যখন আম্মোন-সন্তানদের কাছ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসব, তখন আমার বাড়ির দরজা থেকে যেই কেউ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসবে, সে প্রভুরই হবে, আর আমি তাকে আহুতি রূপে উৎসর্গ করব* (খ)।

প্রার্থনা-বিরোধীদের নানা আপত্তি

৫। [১] আর তোমরা যেমন অনুরোধ করেছ, সেই অনুসারে যদি আমাকে এই প্রথম বক্তব্যের পরে তাদেরই অভিযোগ উপস্থাপন করতে হয় যারা এমনটা সমর্থন করে যে, প্রার্থনার ফলে কোন ফল হয় না ও সেইজন্যই প্রার্থনা করা এমন কিছু যা না করলেও চলে, তাহলে আমি আপাতত প্রার্থনা [εὐχή, ‘এউখে’] এর জন্য সাধারণ ও সরল শব্দটা ব্যবহার ক’রে আমার সাধ্যমত বিষয়টা নির্দ্বিধায়ই ব্যক্ত করব। [···] (ক)। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এতই হীনতম, ও বিশিষ্ট কোন ব্যাখ্যাতারও সমর্থন পায়নি যে, যারা ঐশদূরদৃষ্টির (খ) কথা মানে ও ঈশ্বরকে বিশ্বের উপরে স্থান দেয়, তাদের মধ্যে প্রায়ই এমন কেউ নেই যে প্রার্থনার বিপক্ষে দাঁড়ায়। তেমন অভিমত তাদেরই যারা একেবারে নাস্তিক ও ঈশ্বর যে আছেন তা অস্বীকার করে, অথবা ঈশ্বরকে কেবল একটা নাম হিসাবেই মেনে নেয় কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি বাতিল করে দেয়। তাসত্ত্বেও সেই বিরোধী প্রভাব (গ) খ্রিষ্ট-নামের উপরে ও ঈশ্বরের সন্তানের শিক্ষাবাণীর উপরে একেবারে ভক্তিহীন শিক্ষা চাপিয়ে দিতে কামনা করে এবং প্রার্থনা না করার বিষয়ে কয়েকজনের মন জয় করতে কৃতকার্য হয়ে গেছে। তারাই তেমন অভিমতের সমর্থক, যারা সুবিবেচিত সমস্ত কিছু একেবারে পরিহার করে, বাপ্তিস্মও পালন করে না, এউখারিস্তিয়াও পালন

করে না, ও নিন্দাজনক যুক্তিতে শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করে এমনটা বলে যে, যখন শাস্ত্র প্রার্থনার কথা বলে, তখন সম্পূর্ণরূপে আলাদা কিছু শেখাতে অভিপ্রায় করে।

[২] আচ্ছা, যারা বিশ্বের উপরে ঈশ্বরকে স্থান দেওয়া সত্ত্বেও ও তাঁর দূরদৃষ্টি (ক) বাস্তব বলে সমর্থন করা সত্ত্বেও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে, (কেননা যারা ঈশ্বরকে ও তাঁর দূরদৃষ্টি একেবারে অস্বীকার করে, তাদের অভিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আপাতত আমার কাজ নয়), তাদের নানাবিধ যুক্তি এরূপ: সবকিছু হওয়ার আগে ঈশ্বর সেই সবকিছু জানেন, ও যা কিছু ঘটে, তাতে এমন কিছুই ঘটে না যা তাঁর কাছে প্রথমবারের মত তখনই মাত্র জ্ঞাত হয় যখন তা ঘটে। অতএব, আমরা প্রার্থনা করার আগে যিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন জানেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার অর্থ কি? বস্তুতপক্ষে আমাদের কী কী প্রয়োজন, আমরা যাচনা করার আগেও স্বর্গস্থ পিতা তা জানেন (খ)। তবে, যিনি যা কিছু আছে সেইসব ভালবাসেন ও যা কিছু গড়েছেন সেগুলোর কিছুই ঘৃণা করেন না (গ), সেই পিতা ও বিশ্বনির্মাতা যে ত্রাণকর্তা হিসাবে মানুষের প্রার্থনা বাদেও এক একজনের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবেন, এমনটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। তিনি এতে এমন পিতার মত ব্যবহার করেন যিনি নিজের সন্তানদের রক্ষা করেন ও এমনটা অপেক্ষা করেন না যে, তারা তাঁর কাছে যাচনা করবে, যেহেতু হয় তারা যাচনা ব্যক্ত করতে একেবারে অসমর্থ, না হয় এই কারণে যে, অজ্ঞতাবশত তারা প্রায়ই এমনটা চায় যা তাদের সুবিধা ও উপকারের বিপরীত। সাধারণ সন্তানেরা নিজেদের পিতার মনোযোগ থেকে যতখানি দূরবর্তী, তার চেয়ে মাসুষ হিসাবে আমরা ঈশ্বর থেকে আরও বেশি দূরবর্তী।

[৩] [প্রার্থনা বিরোধী যারা তারা এও বলে যে, এমনটাও বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, যা কিছু ঘটবার, ঈশ্বর যে সেবিষয়ের পূর্বজ্ঞানের অধিকারী তা শুধু নয়, বরং তিনি নিজেই সেবিষয়ের পূর্বব্যবস্থাও করেন, এমনকি, এমন কিছু হতে পারে না যা তাঁর সেই পূর্বব্যবস্থার বিপরীত হতে পারে। সুতরাং, কেউ যদি এমন প্রার্থনা করত যাতে সূর্যের উদয় হয়, তাহলে সে নির্বোধ বলে পরিগণিত হত যদি সে এমনটা ভাবত যে, তার প্রার্থনা বাদেও যা ঘটবার, তা তার প্রার্থনার ফলেই ঘটেছে। একই প্রকারে, যে কেউ এমনটা মনে করে যে, তার নিজের প্রার্থনার জোরেই এমন কিছু ঘটে যা সে সেবিষয়ে

প্রার্থনা না করলে আদৌ ঘটত না, সেও নির্বোধ বলে পরিগণিত হবে। আরও, গরমকালে রোদের চাপে ভারাক্রান্ত ও একেবারে দগ্ধ হয়ে যে কেউ এমনটা ভাবত যে, ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করার লক্ষ্যে তার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সূর্য বসন্তকালীন কক্ষে স্থানান্তর হবে, সে পাগলামির শীর্ষচূড়ার নাগাল পাবে। তেমনিভাবে যে কেউ এমনটা ভাবত যে, মানবজাতির বেলায় অশুভ যা কিছু ঘটবার অবশ্যম্ভাবী, সে প্রার্থনার মাধ্যমেই তা এড়াতে পারবে, সেও পাগলামির আরও ঊর্ধ্বতর শীর্ষচূড়ার নাগাল পেত।

[৪] আরও, [প্রার্থনা বিরোধীরা বলে যে,] যখন *পাপীরা মাতৃগর্ভে থাকতেই পথভ্রষ্ট* (ক) কিন্তু যে ধার্মিক তাকে *নিজের মাতৃগর্ভে থাকতে স্বতন্ত্র* করে রাখা আছে (খ), এবং যখন এমনটা লেখা আছে যে, *সেই সন্তানদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তাঁরা ভাল-মন্দ কিছু করেননি, এমন সময়—যেন মনোনয়ন অনুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে,* [অর্থাৎ, যেন] *কর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং আহ্বান করেন যিনি তাঁর ইচ্ছারই ভিত্তিতে [সেই সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে]—বলা হয়েছিল, জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে* (গ), তখন এসবকিছুর ভিত্তিতে এমনটা দাঁড়ায় যে, পাপের ক্ষমা যাচনা করা ও যাতে খ্রিষ্ট আমাদের শক্তি যুগিয়ে সবকিছুতে আমাদের বলবান করে তোলেন (ঘ) সেই লক্ষ্যে পরাক্রমের আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য যাচনা করাও বৃথা কাজ। কেননা আমরা পাপী হলে তবে 'মাতৃগর্ভে থাকতেই আমরা পথভ্রষ্ট'; এবং 'আমরা মাতৃগর্ভে থাকতেই আমাদের স্বতন্ত্র করে রাখা হলে' তবে আমরা প্রার্থনা না করলেও আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট সবকিছু ঘটবেই। বস্তুতপক্ষে, যাকোব জন্ম নেবার আগে কোন্ প্রার্থনাই বা নিবেদন করেছিলেন যে প্রার্থনায় এমনটা পূর্বঘোষিত ছিল যে তিনি এসৌর উপর প্রবল হবেন ও তাঁর ভাই তাঁর নিজের দাস হবেন? এবং জন্ম নেবার আগে এসৌ অভক্তিময় কোন্ কর্মই বা সাধন করেছিলেন যার ফলে তিনি ঘৃণার পাত্র হবেন? (ঙ)। এবং '*পাহাড়পর্বত স্থাপিত হওয়ার আগে ও পৃথিবী ও জগৎ গঠিত হবার আগে*' যদি ঈশ্বর হন মোশির '*আশ্রয়দুর্গ*' (চ), তাহলে ৯০ নং সেই সামসঙ্গীতে যেভাবে লেখা রয়েছে, কেনই বা মোশি সেইভাবে প্রার্থনা করেন? [...] (ছ)।

[৫] তাছাড়া [প্রার্থনা বিরোধীরা বলে যে], এফেসীয়দের কাছে পত্রে এমনটা লেখা রয়েছে যে, খ্রিষ্টে যাদের পরিত্রাণ পাবার কথা, পিতা সেই সকলকে খ্রিষ্টে *জগৎপত্তনের*

আগেই বেছে নিয়েছিলেন তারা যেন তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়, এবং ভালবাসায় তিনি আগে থেকে তাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন তারা যেন খ্রিষ্টের মাধ্যমে তাঁর দত্তকপুত্র হয় (ক)। তবে তাদের মধ্যে যখন প্রত্যেককেই 'জগৎপত্তনের আগেই' বেছে নেওয়া হয়েছে বলে তার পক্ষে সেই বেছে নেওয়াটা থেকে কাটা পড়া সম্ভব নয়, তখন এক্ষেত্রে কোন প্রার্থনা দরকার হয় না; অন্যথা, যখন তাকে বেছে নেওয়া হয়নি ও আগে থেকে তার বিষয়ে কিছুই নিরূপণ করা হয়নি, তখন এক্ষেত্রে তার প্রার্থনা বৃথা কেননা সে সহস্রবার প্রার্থনা করলেও সে সাড়া পাবে না। কেননা ঈশ্বর *আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন ...। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন* (খ)। আর কেনই বা সেই যোশিয়া কষ্টভোগ করেছিলেন, অথবা কেনই বা তিনি প্রার্থনা করতে করতে উদ্বিগ্ন ছিলেন ঈশ্বর তাঁর কথা শুনবেন কিনা যখন বহু প্রজন্মের আগেই একটা ভাববাণীতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল ও তিনি যে কী করবেন তা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, এমনকি তা পূর্বঘোষিত শুধু নয় বরং বহুজনের সাক্ষাতেই তা পূর্বঘোষিত হয়েছিল? (গ); আর কেনই বা যুদা প্রার্থনা করেন যখন তাঁর প্রার্থনা পাপ বলে গণ্য (ঘ) যেহেতু আগে থেকে, দাউদের সময় থেকেই, এমনটা জানানো হয়েছিল যে, তিনি নিজের পদ হারাবেন ও অন্য একজন তাঁর কাছ থেকে সেই পদ নেবে? (ঙ)। সুতরাং, যেহেতু ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল ও আগে থেকে সবকিছুর জন্য ব্যবস্থা করেছেন ও যা পূর্বব্যবস্থা করেছেন তাতে স্থিতমূল থাকেন, সেজন্য প্রার্থনা দ্বারাই যে তাঁর সেই পূর্বব্যবস্থার পরিবর্তন হবে, তেমন চিন্তা একেবারে যুক্তির বাইরে। কেননা তেমনটা হলে তবে এর মানে হত যে, তিনি কোন পূর্বব্যবস্থা করেননি, এমনকি তিনি এক একজনের প্রার্থনা পাবার অপেক্ষায় আছেন যাতে করে এক একটা প্রার্থনার ভিত্তিতে তিনি প্রতিটি প্রার্থীর সুবিধা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে পারেন, ও যা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করেন, তিনি ঠিক সেই সময়েই সেটার ব্যবস্থা করেন কেমন যেন তিনি আগে তা লক্ষ করেননি।

[৬] এই পর্যায়ে সেই প্রকৃত যুক্তি উপস্থাপন করা হোক যা তুমি আমার কাছে লেখার সময়ে উপস্থাপন করেছিলে: "প্রথমত, যা ঘটবার, সেবিষয়ে যদি ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান থাকে ও তেমনটা ঘটা অপরিহার্য, তাহলে প্রার্থনা অর্থহীন। দ্বিতীয়ত, সবকিছু যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, ও তাঁর বিধিসমূহ স্থিতমূল ও তিনি যা যা ইচ্ছা করেন সেই সবকিছুর একটারই পরিবর্তন হতে পারে না, তাহলে প্রার্থনা অর্থহীন।" যে যে বাধা মানুষকে প্রার্থনা ক্ষেত্রে উদাসীন করে, আমার মতে সেই বাধাসমূহ সমাধান করার লক্ষে আমার এই পরবর্তী উপস্থাপনা উপকারী হবে।

উপরোল্লিখিত আপত্তিগুলো খণ্ডন

৬। [১] যা কিছু গতিশীল, সেই বস্তুসমূহের মধ্যে কয়েকটা বাইরে থেকেই নিজ নিজ গতিবিধি গ্রহণ করে, যেমন সেই প্রাণবিহীন বস্তুগুলো যা নিজ নিজ গঠন দ্বারা একীভূত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে কোন না কোন বস্তু রয়েছে যেগুলো প্রকৃতি দ্বারা ও নিজ নিজ প্রাণের দ্বারা চালিত, কেননা যখন সেগুলো চালিত হয় তখন সেগুলো যা দ্বারা গঠিত হয় তা দ্বারা চালিত হয় না, বরং সেইভাবেই চালিত হয় যেভাবে সেই বস্তুগুলো চালিত হয় যেগুলো নিজ নিজ গঠন দ্বারা একীভূত। উদাহরণ স্বরূপ, খনি থেকে কাটা যে পাথর বা ছেদন করা যে ডাল বৃদ্ধিলাভ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, সেগুলো কেবল নিজ নিজ গঠন দ্বারাই একীভূত হয়ে থাকে ও বাইরে থেকেই চালনাশক্তি গ্রহণ করে। তাছাড়া, সজীব প্রাণীর দেহ ও গাছগাছালির ফলাদি যখন কারও দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, তখন সেগুলো সজীব প্রাণী ও গাছ হিসাবে স্থানান্তর করে না বরং সেইভাবে স্থানান্তরিত হয় যেভাবে সেই পাথর ও ডালও স্থানান্তরিত হয় যা বৃদ্ধিলাভ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। যদিও এমনটা বলা যেতে পারে যে, এগুলোরও পরিবর্তন হচ্ছে যেহেতু সমস্ত ক্ষয়শীল দেহ পচনক্রিয়া সাপেক্ষ, তবু এগুলোর পরিবর্তন এমন ধরনের পরিবর্তন যা পচনক্রিয়ার ফল। এগুলো বাদে গতিশীল বস্তুগুলোর দ্বিতীয় একটা শ্রেণি রয়েছে যেগুলো নিজ নিজ সহজাত প্রকৃতি বা প্রাণ দ্বারা চালিত। যারা কথনে সূক্ষ্ম শব্দ ব্যবহার করে থাকে, তাদের দ্বারা এমনটা বলা হয় যে, সেই বস্তুগুলো 'আপনা আপনিই' গতিশীলতা দ্বারা চালিত। তৃতীয় শ্রেণির গতি হলো সজীব প্রাণীর গতিশীলতা যা 'নিজ নিজ থেকে' চালিত বলে অভিহিত। আর আমার মতে যুক্তিবিশিষ্ট প্রাণীর গতিশীলতা হলো 'নিজ নিজ দ্বারা'

চালিত গতিশীলতা। আমরা যদি কোন সজীব প্রাণী থেকে সেই ‘নিজ নিজ থেকে’ ধরনের গতিশীলতা সরিয়ে দিতাম, তবে আমরা সেই প্রাণীকে আর প্রাণী বলে গণ্য করতে পারতাম না; সেই প্রাণী বরং একটা গাছের মত হত যা কেবল বৃদ্ধি-প্রক্রিয়া গুণেই চলমান, অথবা সেই প্রাণী হত একটা পাথরের মত যা নিজের বহিরাগত শক্তি দ্বারা ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি যেকোনে কিছুর গতি নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তির কর্মফল হয়, তাহলে সেটা ‘নিজ নিজ দ্বারা’ গতিশীলতা গুণেই চালিত হয় ও অবশ্যই যুক্তিবিশিষ্ট বলে পরিগণিত হওয়া চাই (ক)।

[২] অতএব, যারা এমনটা বলতে চায় যে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (ক) নেই, তারা অবশ্যই একেবারে বোধশূন্য কিছুই মেনে নিতে বাধ্য হবে: প্রথমত, তারা এ মেনে নিতে বাধ্য যে, আমরা সজীব প্রাণী নই, দ্বিতীয়ত এও মেনে নিতে বাধ্য যে, আমরা যুক্তিবিশিষ্ট নই। তাদের মতে, যেহেতু আমরা নিজ নিজ দ্বারা আদৌ চালিত নই বরং আমরা আমাদের বহিরাগত কোন কিছু দ্বারা চালিত, সেজন্য আমরা যতই মনে করতে পারি যে আমরা যা করছি তা নিজ নিজ দ্বারাই করছি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তা বহিরাগত কোন চালনা-শক্তি দ্বারাই তা করছি। এক একজন নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা ভেবে দেখুক; সে কি এমনটা সত্যিকারে বলতে পারে যে, সে যা ইচ্ছা করে তা নিজে থেকে ইচ্ছা করে না, সে যা খায় তা নিজে থেকে খায় না, সে যখন হাঁটে তখন সে নিজে থেকে হাঁটে না, সে যে সম্মতি দেয় বা কোন না কোন অভিমত মেনে নেয় ও অন্যদের ধারণা মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করে সে তা নিজে থেকে করে না? যেমন কোন না কোন অভিমত রয়েছে যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যদিও তেমন অভিমত সহস্র প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত ও সম্ভাব্য যুক্তি দ্বারা উপস্থাপিত, তেমনি মানব ব্যাপার সংক্রান্ত যত অভিমত আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার জন্য স্থান রাখে না, সেই অভিমতসমূহও মেনে নেওয়া অসম্ভব। কেননা, ‘নিশ্চিত বলতে কিছু নেই’ তেমন ধারণায় এতই আক্রান্ত এমন কেই বা আছে? অথবা এমন কে আছে যে এমন জীবন যাপন করে যে, সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে নিজের বিচার সারাক্ষণ ধরে স্থগিত করে থাকে? কেই বা নিজের দাসকে মারে না যখন সে ধারণা করে সেই দাস অনিষ্ট কিছু করেছে? এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ছেলেকে নিন্দা করবে না যখন সেই ছেলে নিজের পিতামাতাকে দেয় সম্মাণ দেয় না? অথবা কে ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে লজ্জাকর

কর্ম করার দায়ে নিন্দা করে না ও দোষী বলে গণ্য করে না? যখন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষিত ও তেমন স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়বস্তু হলো প্রশংসা বা নিন্দা, তখন সহস্র সহস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সত্য প্রশংসা ও নিন্দা আরোপ করতে আমাদের আপনা আপনিই বাধ্য করে।

[৩] তবে, যখন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষিত, তখন গুণ বা রিপুর প্রতি অথবা যা উচিত ও যা অনুচিত তার প্রতি সেই স্বাধীন ইচ্ছার যত প্রবণতা থাকুক, অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছার সেই সবকিছুও *জগতের সৃষ্টিলগ্ন* (ক) ও *জগৎপত্তনের সময় থেকে* (খ) ঈশ্বরের কাছে অবশ্যই জ্ঞাত রয়েছে, এমনকি কোন্ ধরনের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী সেইসব কিছু একদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে, তা ঘটবার আগেও তা তাঁর কাছে আগে থেকে জ্ঞাত রয়েছে। এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিটি কর্ম বিষয়ে ঈশ্বর যা দেখেছেন, সেই অনুসারে তিনি এমনটা ব্যবস্থা করেন যে, তাঁর দূরদৃষ্টি (গ) গুণে যা ঘটবার কথা ও সেইসঙ্গে ভাবী ঘটনাধারার অনুক্রম অনুযায়ী যা ঘটবার কথা, তা হবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিটি গতির পুণ্যকর্মের যথাযথ ফলাফল। তবু ভাবীকালে যা কিছু ঘটবার কথা ও আমাদের কামনা-বাসনা জনিত ও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় যত কর্ম সম্পাদিত হওয়ার কথা, ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান যে সেইসব কিছুর কারণ তা নয়। কেননা যদিও আমরা ধরে নিতাম যে ঈশ্বর ভাবী সবকিছু বিষয়ে অজ্ঞ, তবু সেই ভিত্তিতেও আমরা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম সম্পাদন করার ও বিশেষ বিশেষ কিছু ইচ্ছা করার অধিকার হারাতাম না। কিন্তু বিশ্বশাসনের জন্য যখন ঈশ্বর নিজের পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, জগৎ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমাদের স্বীয় স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা আরও বেশি উপযোগিতা রাখে।

[৪] সুতরাং, যদি প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছে জানা ও এর ফলে এক একজনের জন্য যা উত্তম ও অধিক উপযোগী তা তাঁর দূরদৃষ্টিতে (ক) আগে থেকে দৃশ্যগত ও সুবিন্যস্ত, তাহলে তেমনিভাবে এক একজন কেমন করে, কেমন মনোভাবে ও কেমন বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করবে ও কী আকাঙ্ক্ষা করবে, তাও তাঁর কাছে আগে থেকে জানা। আর যেহেতু এসমস্ত কিছু আগে থেকে পূর্বস্থিরীকৃত, সেজন্য সেসব কিছু বিশ্বগঠন অনুসারেই সুবিন্যস্ত হয়েছে যাতে ঈশ্বর কেমন যেন বলতে পারেন, "অমুক

ব্যক্তি প্রজ্ঞাবানের মত প্রার্থনা করে বিধায় সে যখন প্রার্থনা করে আমি তাকে সাড়া দেব; কিন্তু তমুক ব্যক্তি সাড়া পাবার যোগ্য নয় বিধায় আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না; বা এজন্যই তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না, কারণ সে এমন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে যা প্রার্থী হিসাবে পাওয়া তার পক্ষে মঙ্গলকর নয়, বা তা মঞ্জুর করা আমার পক্ষে উচিত নয়। তাই (কথার কথা) আমি অমুকের প্রার্থনায় সাড়া দেব, কিন্তু তমুকের প্রার্থনায় সাড়া দেব না।" ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান নির্ভুল—একথা মেনে নেওয়ায় কোন ব্যক্তি যদি অস্থির হয়ে ওঠে কারণ তেমন কিছু মেনে নিলে তবে আবশ্যকীয় নিরূপণও মেনে নিতে হবে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে আমরা উত্তরে একথা বলব যে, হ্যাঁ, ঈশ্বর ঠিক তাই জানেন, অর্থাৎ তিনি জানেন, অমুকের বাসনার বিষয় যে অবশ্যই ও সর্বদাই মঙ্গলকর হবে এমন নয়; তাছাড়া তিনি এও জানেন যে, তমুক যা বাসনা করে, তার পক্ষে তা এমন ক্ষতিকর হবে যে, সে ভবিষ্যতে লাভজনক কর্মের দিকে পরিবর্তন করতে অক্ষম হবে। কিন্তু—ঈশ্বর বলেন—"অযোগ্য ভাবে প্রার্থনা করেনি বরং প্রার্থনায় মনোযোগ দিয়েছে এমন ব্যক্তির প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সমীচীন। এই যে ব্যক্তি যথেষ্ট সময় ধরে প্রার্থনা করে আমি তাকে এমন সাড়া দেব যা তার *যাচনার চেয়েও অধিক বেশি* [খ]: সে যা যা যাচনা করতে সক্ষম, তার চেয়ে অধিক মঙ্গলদান মঞ্জুর করা ও দানশীলতায় তার উপর বিজয়ী হওয়া আমার শোভা পায়। আর যে ব্যক্তি তেমন স্বভাব দেখাবে, আমি তার কাছে এই রক্ষীদূত প্রেরণ করব যিনি এখন থেকে তার পরিত্রাণ সাধনে তাকে সহযোগিতা ও সময় মত সহায়তা দান করবেন; আর যে ব্যক্তি এ ব্যক্তির চেয়েও উত্তম, তার কাছে আমি আরও ঊর্ধ্বশ্রেণির রক্ষীদূত প্রেরণ করব। কিন্তু সেই আর এক ব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট শুভকর্ম সম্পাদনে নিবিষ্ট হওয়ার পর শিথিল হয়ে যায় ও পুনরায় পার্থিব চিন্তাধারায় পতিত হয়, আমি তার কাছ থেকে সেই উপযোগী সাহায্য ফিরিয়ে নেব, অর্থাৎ তার অপকর্মের ফলে আমার রক্ষীদূত তার কাছ থেকে চলে গেলেই অমঙ্গলকামী একটা প্রভাব হঠাৎ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত হবে, এবং তার শিথিলতা সুযোগ ক'রে ওত পেতে থাকবে ও তার দেখানো প্রবণতা অনুসারে তাকে পাপময় অবস্থায় আকর্ষণ করবে।"

[৫] তবে, যিনি সমস্ত কিছু নিরূপণ করেন, তাঁর বিষয়ে আমরা ঠিক তাই ভাবতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বলবেন, “আমোস যোশিয়ার জন্মদাতা হবে, আর এই যোশিয়া নিজের পিতার অপরাধের অনুকারী হবে না বরং এমন পথ খুঁজে পাবে যা পুণ্যের দিকে তাকে চালনা করবে, ও নিজের সাথীদের দ্বারা সে হবে সম্মাননীয় ও উত্তম, এবং *সেই বেদি ভঙে ফেলবে* যা *যেরবোয়াম* নিকৃষ্ট ভাবে গেঁথেছিল (ক)। আমি এও জানি যে, আমার পুত্র মানবজাতির মাঝে বাস করতে এলে সেই যুদা শুরুতে সম্মাননীয় ও উত্তম ব্যক্তি হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন হবে ও মানব পাপময়তায় পতিত হবে; এবং তেমন পাপগুলোর জন্য তাকে এধরনের কিছু ভোগ করতে হবে।” (এই যে পূর্বজ্ঞান যা সম্ভবত সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু কমপক্ষে যুদার বেলায় ও অন্যান্য রহস্যের বেলায় সম্পর্কযুক্ত, তা ঈশ্বরের পুত্রেরও অধিকার। কেননা ভাবী সব কিছুর আবর্তন বিষয়ে নিজের উপলব্ধি গুণে তিনি যুদাকে দেখেছিলেন ও যুদা যে যে পাপকর্ম করবে তাও দেখেছিলেন; এজন্যই যুদার জন্ম নেবার আগেও তিনি সূক্ষ্ম উপলব্ধি দ্বারা দাউদের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন, ‘*প্রভু, আমার প্রশংসাবাদে নিশ্চুপ থেকো না*’(খ), ইত্যাদি)। যা কিছু ঘটবার, ও কেমন করে পল প্রকৃত প্রভুভক্তির দিকে সংগ্রামরত থাকবেন, এসমস্ত কিছু আগে থেকে জেনে তিনি বলন, “নিজে থেকে জগৎ নির্মাণের আগে বা জগৎ গড়ার কাজে নিবিষ্ট হবার আগে আমি তাকে বেছে নেব। তার জন্মলগ্নেই আমি তাকে অমুক তমুক এমন প্রতাপ আরোপ করব যা মানব পরিত্রাণের জন্য সহযোগিতা করবে। হ্যাঁ, সে *মাতৃগর্ভে থাকতেই* আমি তাকে *স্বতন্ত্র* করে রাখব (গ); আমি এমনটা হতে দেব, সে যৌবনকালে অজ্ঞতাময় ধর্মাগ্রহে পতিত হবে, ভক্তির ছুতা নিয়ে সে তাদের *নির্যাতন* (ঘ) করবে যারা আমার খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, যারা আমার দাস ও সাক্ষী *স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই* সে তাদের *জামাকাপড় রাখবে* (ঙ) যাতে করে পরবর্তীকালে যখন তার যৌবনকালীন জেদ নিঃশেষ হয় ও সে ভালোর দিকে ফেরে সে যেন আমার *সামনে গর্ববোধ না ক’রে* (চ) বরং বলে, ‘*আমি প্রেরিতদূত নামের যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি*’(ছ)। এবং ধর্মাগ্রহের ছুতায় তার যৌবনকালীন সেই ভুলের পরে আমা থেকে সে যে ভাবী কৃপা পাবে, তা উপলব্ধি করে সে যেন ঘোষণা করতে পারে, ‘*আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের*

অনুগ্রহেই আছি’(জ)। এবং যুবক হওয়ার সময়ে সে খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে যা কিছু করেছিল সেই সবকিছুর সচেতনতা দ্বারা নিজেকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়ে সে *সেই ঐশপ্রকাশের মহত্ত্বের জন্য দর্প* (ঝ) করবে না যা আমি আমার মঙ্গলময়তায় তার কাছে প্রকাশ করব।”

৭। এবং যাতে সূর্যের উদয় হয় (ক), এমন প্রার্থনা সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে উত্তরটা এরূপ, সূর্যও এক প্রকার স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী যেহেতু চন্দ্রের সঙ্গে সে ঈশ্বরের প্রশংসা করে; কেননা লেখা আছে, *তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র* (খ)। তাতে এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, কথাটা চন্দ্রের জন্যও সত্য এবং এর ফলে সকল তারার জন্যও সত্য, কেননা শাস্ত্রে বলে, *তাঁর প্রশংসা কর, সকল তারা ও আলো* (গ)। তাই আমরা যেমন বলেছিলাম (ঘ), ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকজনের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার ক’রে পৃথিবীতে যারা রয়েছে তাদের কল্যাণের জন্য তা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করেন, তখন একই প্রকারে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির সেই স্বাধীন ইচ্ছাও ব্যবহার করেন যা স্থিরীকৃত, স্থিতমূল, দৃঢ়স্থাপিত ও প্রজ্ঞাময়; এবং এও ধরে নিতে হবে যে, ঈশ্বর *আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীকে* (ঙ) ও জ্যোতিষ্করাজির কক্ষ ও গতিকে বিশ্বমণ্ডলের সঙ্গতি বজায় রেখে বিন্যস্ত করেছেন। তাই যখন আমি স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট অন্য কারও একজনের বিষয়ে বৃথাই প্রার্থনা করি না, তখন কথাটা আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত যখন আমি আকাশের স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট তারকারাজির একটার জন্য প্রার্থনা করি যেগুলো নিজ নিজ কক্ষপথ অনুসরণ করায় বিশ্বের কল্যাণার্থে নিজ নিজ অবদান রাখে। এমনকি, এই পৃথিবীর বস্তুগুলো বিষয় সম্পর্কে এমনটাও বলা যেতে পারে যে, অবস্থা-পরিস্থিতি জনিত কোন না কোন অনুভূতি সেগুলোতে আরোপ করা হয় যা আমাদের মনে এমন অস্থিরতা জাগায় বা মনের এমন খারাপ অবস্থার দিকে আমাদের প্রভাবান্বিত করে, যার ফলে আমরা এক প্রকার বা অন্য প্রকার কথা বলি বা কর্ম সম্পাদন করি। কিন্তু আকাশের বস্তুগুলো ক্ষেত্রে এমন কোন্ অনুভূতি সেগুলোতে আরোপ করা যায় যা জগতের জন্য তত উপকারী কক্ষপথ থেকে সেগুলোকে চ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে যেগুলো এমন প্রাণের অধিকারী যা যুক্তি দ্বারা

গঠিত, নিজ নিজ প্রেরণা অনুযায়ী প্রভাবিত ও তেমন আকাশময় ও সূক্ষ্মতম দেহ মণ্ডিত?

৮। [১] তাছাড়া, প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মানুষকে উদ্দীপিত করার জন্য ও প্রার্থনা বিষয়ে শিথিলতা থেকে মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়। যেমন নারীকে ছাড়া ও সন্তান-জন্মাবার জন্য দরকারী শক্তি ছাড়া সন্তানদের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি উপযোগী ভাবে প্রার্থনা না করলে, উপযুক্তভাবে বিশ্বাস না করলে ও প্রার্থনার আগে উচিত মত জীবনযাপন করে না থাকলে কেউই প্রত্যাশিত ফল পেতে পারবে না। তাই *বেশি কথা ব্যবহার* করতে নেই (ক), সামান্য বিষয়ও যাচনা করতে নেই (খ), পার্থিব মঙ্গলও চাইতে নেই, '*ক্রুদ্ধ*'(গ) ও অস্থির মনের অবস্থায়ও প্রার্থনায় রত থাকতে নেই। এমনকি, মনের পরিশুদ্ধি ছাড়াও প্রার্থনার জন্য সময় দেওয়া সম্ভব নয় (ঘ) ; প্রার্থনায় পাপের ক্ষমা পাওয়াও সম্ভব নয় যদি না যে প্রার্থনা করে সে *অন্তর থেকে* অপরাধীকে ক্ষমা করে থাকে ও আপন *ভাইকে ক্ষমা* পাবার যোগ্য বলে মনে না করে (ঙ)।

প্রার্থনার উপকারিতা

[২] যে ব্যক্তি উচিত মত প্রার্থনা করে বা তেমনটা করার জন্য সাধ্যমত সচেষ্ট থাকে, আমার মতে সেই ব্যক্তির জন্য লাভজনক বেশ কিছু রয়েছে। প্রথমত, প্রার্থনায় যে নিজের মন নিবিষ্ট করে, সে যে কোন না কোন ভাবে লাভজনক বেশ কিছু পাবে তা অবশ্যম্ভাবী, কেননা তেমন মনোভাবের মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে হাজির হবার জন্য ও স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষাতে, কেমন যেন এমন একজনেরই সাক্ষাতে বলার জন্য নিজেকে অলঙ্কৃত করে যিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন ও নিজেই উপস্থিত। কেননা যেমন তেমন বিষয়গুলোর কোন না কোন অনুভূতি বা স্মৃতি যা স্মৃতিচারণ জাগায়, তা সেই অনুভূতির সঙ্গে জড়িত চিন্তাধারা বিকৃত করতে পারে, তেমনিভাবে, যিনি *হৃদয় পরীক্ষা করেন* ও *অন্তর তলিয়ে দেখেন* (ক), এমনকি যিনি উপস্থিত, যিনি লক্ষ রাখেন ও প্রতিটি সঙ্কল্প আগে থেকে জানেন, যখন আত্মা তেমন একজনেরই প্রীতির পাত্র হবার জন্য নিজেকে সজ্জিত করে, তখন আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, আমরা যাঁর উপরে আস্থা রেখেছি,

যিনি সেই আত্মার গুপ্ত কক্ষের যত গতি জানেন, সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করা লাভজনক। আর যদিও আমরা এমনটা ধরে নিতাম যে, যে কেউ নিজের মন প্রার্থনায় নিবিষ্ট রেখেছে তার বাড়তি কোন লাভ হয় না, তবু আমাদের এবিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত যে, যে কেউ প্রার্থনাকালে এত ভক্তির সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করে, সে এমন ফল পায় যা সাধারণ নয়। যখন এসমস্ত কিছু ঘনঘন হয়, তখন যারা প্রার্থনায় অধিক নিষ্ঠাবান, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানে যে, এই সাধনা কতগুলো পাপ থেকেই না আমাদের দূরে রাখে ও কতগুলো পুণ্যকর্মের প্রতিই না আকর্ষণ করে। কেননা যখন খ্যাতিমান বিশিষ্ট ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতি ও তার বিষয়ে চিন্তা তার অনুকরণের দিকে আমাদের উৎসাহিত করে ও আমাদের অমঙ্গলকর প্রবণতা প্রায়ই রোধ করে, তখন সকলের পিতা সেই ঈশ্বরের স্মৃতি আর সেইসঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনাও তাদের পক্ষে আরও কতই না লাভজনক হবে, যারা এবিষয়ে সচেতন যে, যিনি উপস্থিত ও তাদের কথা শোনেন, তারা তাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে।

৯। [১] যে সমস্ত কথা আমরা বলে এসেছি, তা পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা এইভাবে প্রমাণসিদ্ধ করা দরকার। যে প্রার্থনা করে, যে কেউ তার প্রতি অন্যায় করে থাকে তাকে ক্ষমা করায়, নিজের আত্মা থেকে ‘*ক্রোধের*’ দুর্মতি বর্জন করায়, কারও প্রতি বিরোধিতার ভাব বহন না করায় তাকে ‘*শুচি হাত*’ তুলতে হবে [ক]। তবে, যাতে অন্তর অযথা চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়, সেজন্য প্রার্থনাকালে সেই প্রার্থনা ছাড়া তাকে অন্য যত বিষয় বিস্মৃত হতে হবে। তেমন মানুষ যে অধিক সুখী, কেই বা তা সন্দেহ করতে পারে? বাস্তবিকই তিমথির কাছে প্রথম পত্রে স্বয়ং পল ঠিক এ উপদেশ দিয়ে বলেন, ‘*আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থানে পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক’রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক*’[খ]। এসমস্ত কিছু ছাড়া, একটি স্ত্রীলোক, বিশেষভাবে সে প্রার্থনারত থাকাকালে, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও নিজের মনোভাব থেকে লালসাময় ও নারীসুলভ যত চিন্তা বর্জন করে ও *চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়* অলঙ্কৃত না হয়ে বরং *ভক্তি-ব্রতিনী নারীর যেমন শোভা পায় সেইভাবে সজ্জিতা* হয়ে, বিশেষভাবে তখনই যখন সে প্রার্থনারত, তার পক্ষে আত্মায় ও দেহেও সরলতা ও শালীনতা বজায় রাখা উচিত। যে স্ত্রীলোক প্রার্থনার জন্য তেমন মনোভাব নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে, সে

যে কেবল এই মনোভাবের ভিত্তিতেও সুখী, এমন কেউ যদি তেমনটা বলতে দ্বিধা করত আমি বিস্মিত হতাম। এশিক্ষা পল নিজেই সেই একই পত্রে প্রদান করেন যখন বলেন, *‘একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প’রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক’*(গ)।

[২] নবী দাউদও এমনটা বলেন যে, যখন পবিত্র এক ব্যক্তি প্রার্থনা করে তখন সে অন্য কতগুলো বিশিষ্টতায় মন্ডিত। তেমন কিছু উল্লেখ করা গুরুত্বহীন নয়, যাতে করে যা কিছু অধিক উপযোগী তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদিও আমরা প্রার্থনার লক্ষ্যে কেবল সেই ব্যক্তিরই মনোভাব ও প্রস্তুতি-ক্রিয়া তুলে ধরি, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। দাউদ বলেন, *‘আমি চোখ উত্তোলন করেছি তোমার দিকে, তুমি যে স্বর্গে বসবাস কর’*(ক) ও *‘প্রভু, তোমার কাছে উত্তোলন করেছি আমার প্রাণ’*(খ)। কেননা মনশ্চক্ষু পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত চিন্তা থেকে ও জড় বস্তুর অনুভূতি সংক্রান্ত পরিতৃপ্তি থেকে উত্তোলিত। এমনকি সেই মনশ্চক্ষু এত উচ্চতেই উত্তোলিত যে, সেই চক্ষু সৃষ্ট যা কিছু তা ভেদ ক’রে কেবল ঈশ্বর-দর্শনেই নিবদ্ধ থাকে, ও যিনি তাদের শোনেন, তাঁর সঙ্গে সে শ্রদ্ধা ও বিনম্রতার সঙ্গে কথা বলে। যারা অনাবৃত মুখে প্রভুর গৌরবে চোখ নিবদ্ধ রাখে ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয় (গ), তারা কেমন করেই বা নিজেদের চোখ ক্ষেত্রে লাভবান হবে না? কেননা সেই ক্ষণে তারা এক প্রকার ঐশ্বরিক ও অধ্যাত্ম উজ্জ্বলতার অংশী হয়, যেইভাবে এই বাক্যে প্রমাণিত হয়, *তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর মুদ্রাঙ্কিত হল* (ঘ)। তাতে প্রাণ উত্তোলিত হয় ও পবিত্র আত্মার অনুসরণে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এমনকি, সেই প্রাণ কেবল পবিত্র আত্মার অনুসরণ করে না, তাঁর মধ্যেই রয়েছে, যেইভাবে ‘তোমার কাছে উত্তোলন করেছি আমার প্রাণ’ বচনটা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে। তবে নিজের অস্তিত্ব ত্যাগ করায় কেমন করে প্রাণ আত্মিক হয়ে ওঠে না?

[৩] অন্যায় ভুলে যাওয়া এমন পরমসিদ্ধি যে নবী যেরেমিয়া অনুসারে সেটাই হলো সমস্ত বিধানের সংক্ষিপ্ত সারকথা; কেননা তিনি বলেন, *‘যখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেসময়ে আমি এসমস্ত কিছু তাদের আজ্ঞা*

করেছিলাম, এমন নয়। বরং তাদের জন্য যে আজ্ঞা জারি করেছিলাম, তা ছিল এ: কেউই যেন আপন প্রতিবেশীর পাপ নিজের হৃদয়ে স্মরণে না রাখে’(ক)। আর যখন আমরা তেমন অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে প্রার্থনা করতে সম্মিলিত হই, তখন প্রভুর আদেশ পালন করি, তথা, *যখন তুমি দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, তখন যদি কারও বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর* (খ)। তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, যখন আমরা তেমন মনের অবস্থায় প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়াই, তখন উত্তম যা কিছু রয়েছে আমরা তা পেয়ে গেছি।

১০। [১] তেমন ফল ছাড়া আমাদের প্রার্থনার আর কোন ফল না থাকলেও, তবু কেমন করে উচিত মত প্রার্থনা করা উচিত, তা বুঝে ও তা পালন করলে তবে আমরা অধিক লাভবান হয়েছি—এধারণা নিশ্চিত বলে মনে করেই আমি উপরোক্ত সমস্ত কথা বলে এসেছি। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, এভাবে যে প্রার্থনা করে, যিনি শোনেন সে তাঁর পরাক্রম দর্শন করছে বলে ও প্রার্থনা করার আগে ঐশদূরদৃষ্টি (ক) সম্পর্কে সমস্ত অসন্তোষ বর্জন করেছে বলে সে কথা বলতে বলতে শুনতে পাবে, *এই যে আমি আছি* (খ)। একথা এ বচন দ্বারা ব্যক্ত, *তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙ্গুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও …* (গ)। বাস্তবিকই যে ব্যক্তি যা ঘটে তাতে খুশি, সে সমস্ত জোয়াল থেকে মুক্ত, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কখনও অঙ্গুলিতর্জনও করে না, কারণ তিনি আমাদের যাচাই করার জন্য তাঁর যা ইচ্ছে তাই স্থির করেন; আর শুধু তাই নয়, তেমন ব্যক্তি নিজের গোপন চিন্তায়ও গজ গজ করে না যদিও কোন মানুষ তার সেই চিন্তা শুনতে পায় না। তেমন গজগজানি ঠিক সেই দুষ্ট দাসের গজগজানির মত যে নিজের মনিবের নির্দেশ প্রকাশ্যে সমালোচনা করে না। আর আসলে এমনটি দেখা যাচ্ছে যে, যারা তাদের যা যা অমঙ্গল ঘটে সেবিষয়ে প্রকাশ্যে ও সমস্ত অন্তর দিয়ে ঐশদূরদৃষ্টির নিন্দা করতে সাহস পায় না, তারা নিজেদের অসন্তোষ বিশ্বপ্রভুর কাছে কেমন যেন গোপন রাখতে আশা রাখছে। আমার মতে এসমস্ত কিছু হলো যোব পুস্তকের এই বচনের অর্থ, তথা, ‘তাঁর যা যা ঘটেছিল, সেইসব কিছুতে যোব ঈশ্বরের সামনে *নিজের ওষ্ঠাধরে কোন পাপ করলেন না* (ঘ), কিন্তু নিজেই যাচাইকৃত হবার আগে লেখা আছে, *তাঁর যা যা ঘটেছিল, সেইসব কিছুতে যোব ঈশ্বরের সামনে কোন পাপ করলেন না* (ঙ)। এবং দ্বিতীয়

বিবরণে যে বচন এই ব্যাপারে সম্পর্কযুক্ত, সেই বচন এরূপ, *সাবধান, সপ্তম বছর, সেই ঋণক্ষমা-বর্ষ কাছে এসে গেছে, একথা ব'লে যেন তোমার হৃদয়েও তেমন গোপন চিন্তা না থাকে* (চ)।

[২] অতএব, যে কেউ এইভাবে প্রার্থনা করায় অধিক লাভবান হয়ে উঠেছে, সে সেই প্রভুর আত্মার সঙ্গে মিশে যেতে তৈরী হয়ে ওঠে যিনি গোটা জগৎকে নিজেতে পরিপূর্ণ করেছেন ও মর্ত ও স্বর্গকেও নিজেতে পরিপূর্ণ করেছেন ও নবীর মধ্য দিয়ে বলেন, '*স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?—প্রভুর উক্তি*'(ক)। তাছাড়া, উপরোক্ত পরিশুদ্ধির (খ) মধ্য দিয়ে ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েও সে ঈশ্বরের বাণীর সহভাগিতা লাভ করবে, যিনি তাদেরও মাঝে রয়েছেন যারা তাঁকে জানে না (গ), যিনি কারও প্রার্থনায় কখনও অনুপস্থিত নন ও যিনি পিতার কাছে তারই সঙ্গে প্রার্থনা করেন তিনি নিজেই যার মধ্যস্থ। কেননা ঈশ্বরের পুত্র হলেন আমাদের যজ্ঞ-বলিদানের *মহাযাজক* (ঘ) ও *পিতার কাছে সহায়ক* (ঙ): যারা প্রার্থনা করে, তিনি তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ও যারা অনুরোধ রাখে, তিনি তাদের সঙ্গে সহায়ক বলে অনুরোধ রাখেন। কিন্তু যারা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করতে নিষ্ঠাবান নয়, তিনি তেমন দাসদের জন্য প্রার্থনা করেন না; এবং *নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত* (চ) তাঁর এই নির্দেশের প্রতি যারা বাধ্য নয়, তাঁর সেই আপনজনদের পক্ষেও তিনি পিতার কাছে সহায়ক হবেন না। কেননা তিনি বলেন, 'নিরাশ না হয়ে যে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত', এপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যদের কাছে এই উপমা-কাহিনী শোনালেন; বললেন, '*এক শহরে একজন বিচারক ছিল …*'(ছ), ইত্যাদি। এবং এ বচনের আগে, *তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মাঝরাতে তাকে গিয়ে বলে, বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও, কারণ আমার এক বন্ধু পথে যেতে যেতে আমার কাছে এসে পড়েছে, ও তাকে খাবার মত দিতে আমার কিছু নেই* (জ); এবং কয়েক পদ পরে, *আমি তোমাদের বলছি, সে যদিও বন্ধুত্বের খাতিরে উঠে তা না দেয়, তবু ওর পীড়াপীড়ির জন্যই সে উঠে ওর যত প্রয়োজন তা দিয়ে দেবে* (ঝ)। যারা যিশুর মিথ্যা-বিরোধী মুখে বিশ্বাস রাখে, তারা কেমন করে ইতস্তত না করেই প্রার্থনার জন্য উদ্দীপিত হবে না যখন তিনি বলেন, '*যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে … কেননা যে যাচনা করে, সে পায়*'(ঞ)? কেননা আমরা যখন

মঙ্গলময় পিতার কাছে যাচনা রাখি তখন তিনি জীবনময় রুটিই আমাদের দান করেন, তাদেরই তিনি তা দান করেন যারা পিতা থেকে *দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মাকে পেয়েছে* [ট]; না, তিনি তো সেই পাথর দেন না যা সেই শত্রু যিশুকে ও তাঁর শিষ্যদের খাদ্য হিসাবে দিতে ইচ্ছা করে। আর যারা তাঁর কাছে যাচনা রাখে, *পিতা স্বর্গ থেকে* তাদের উপরে *সেই ভাল দান বর্ষণ ক'রে* তা তাদের দান করেন [ঠ]।

স্বর্গদূতগণ এমনকি খ্রিষ্টো আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন

১১। [১] যারা যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করে, তাদের সঙ্গে মহাযাজকই মাত্র যে প্রার্থনা করেন এমন নয়, স্বর্গে সেই স্বর্গদূতেরাও প্রার্থনা করেন যাঁরা, *মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে যত আনন্দ করেন, তার চেয়ে বেশি আনন্দ করেন যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে* [ক]। উপরন্তু, যাঁরা ইতিমধ্যে নিদ্রাগত হয়েছেন, সেই পবিত্রজনদের আত্মাও তেমনটা করে। বাস্তবিকই রাফায়েল যে তোবিত ও সারার হয়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মিক উপাসনা নিবেদন করেন, তাতে এসবকিছু প্রমাণিত। কেননা সেই দু'জন প্রার্থনা করার পর শাস্ত্রে বলে, *সেই দু'জনের প্রার্থনা মহান রাফায়েলের গৌরবের সাক্ষাতে শোনা হল, ও তিনি সেই দু'জনকে নিরাময় করতে প্রেরিত হলেন* [খ]। এবং রাফায়েল নিজে ঈশ্বরের নির্দেশের অধীনস্থ দূত বলে সেই দু'জনের বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করে বলেন, *তাই, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতিচিহ্ন সেই পবিত্রজনের সাক্ষাতে উপস্থিত করলাম* [গ]। এবং কয়েক পদ পরে, *আমি রাফায়েল, সেই সপ্ত দূতের একজন, যাঁরা [পবিত্রজনদের প্রার্থনা]* [ঘ] *উপস্থাপন করেন ও সেই পবিত্রজনের গৌরবের সাক্ষাতে প্রবেশ করেন* [ঙ]। সুতরাং, রাফায়েলের বাণী অনুসারে *প্রার্থনা যখন উপবাস, অর্থদান ও ন্যায়পরতার সঙ্গে মিলিত থাকে, তখন সেই প্রার্থনা উত্তম* [চ]। মাকাবীয় পুস্তকগুলোতে যেরেমিয়াও প্রদর্শিত: তিনি *শুভ্র কেশ ও মর্যাদার জন্য বিশিষ্ট এবং যে উৎকৃষ্টতায় তিনি পরিবৃত ছিলেন তা ছিল অপরূপ ও মহিমময়* [ছ], এবং তিনি *ডান হাত বাড়িয়ে যুদাকে সোনার একটা খড়্গা দান করলেন* [জ]। নিদ্রাগত আর এক পবিত্রজন এ বলে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন, *'ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি জনগণের ও পবিত্র*

নগরীর জন্য বহু প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন: হ্যাঁ, ইনি যেরেমিয়া, ঈশ্বরের সেই নবী’[ঝ)।

[২] আচ্ছা, যারা যোগ্য, যখন বর্তমানকালে তাদের কাছে জ্ঞান ‘*আয়নার মধ্য দিয়ে*’ ও ‘*ঝাপসা ঝাপসায়ই যেন*’ প্রকাশিত হয় এবং ‘*পরবর্তীকালেই মুখোমুখি হয়ে*’ প্রকাশিত হবে (ক), তখন অন্যান্য গুণাবলি ক্ষেত্রেও যে একইভাবে ঘটবে না, তেমনটা ধরে নেওয়া নির্বুদ্ধিতা স্বরূপ; কেননা এটাই নিশ্চিত যে, এজীবনে যা কিছুর জন্য আমাদের প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেই সমস্ত কিছু ‘পরবর্তীকালেই’ সিদ্ধতা প্রাপ্ত হবে।

ঐশবাণী অনুসারে উচ্চতম সদ্‌গুণাবলির মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ হল প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা; এজন্য আমাদের ধরে নিতে হবে, নিদ্রাগত পবিত্রজনেরা তাদেরই পক্ষে সেটির অনুশীলন করেন যারা এখনও পৃথিবীতে সংগ্রাম করছে—যারা এখনও মানব দুর্বলতায় রয়েছে, তারা যেভাবে অধিক দুর্বলদের সংগ্রামে সহায়তা দান করে, তার চেয়ে সেই পবিত্রজনদের সহায়তা অধিক শক্তিশালী বটে। কেননা *একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে* (খ) কথাটা যে শুধু এখানে, এই নিম্নলোকেই, তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা আপন ভাইদের ভালবাসে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ‘সকল মণ্ডলীর চিন্তা’ এর কথা বলা তাদেরও ভালবাসাকে মানায় যারা বর্তমান জীবনের বাইরে রয়েছে। *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* (গ)। তাছাড়া খ্রিষ্ট নিজেও স্বীকার করেন যে, পীড়িত পবিত্রজনদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনিই পীড়িত, ও সেইভাবে *কারারুদ্ধ, বস্ত্রহীন, প্রবাসী, ক্ষুধিত ও পিপাসিত* (ঘ)। যারা সুসমাচারও মাত্র পাঠ করেছে, তাদের মধ্যে কেইবা না জানে যে, বিশ্বাসীদের যা যা ঘটে, খ্রিষ্ট সেই সবকিছু নিজেরই বলে গণ্য করেন ও তাদের কষ্ট নিজেরই কষ্ট বলে পরিগণিত করেন?

[৩] আর যখন ঈশ্বরের দূতবৃন্দ যিশুর কাছে এসে তাঁর সেবা করছিলেন (ক), তখন আমাদের পক্ষে এমনটা মনে করা সমীচীন নয় যে, যে সময়ে যিশু তাঁর বিশ্বাসীদের মধ্যে ভোজে সহনিমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং সেবক হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন (খ), কেবল সেই সময়েই, অর্থাৎ মানুষদের মাঝে তাঁর শারীরিক উপস্থিতির সেই স্বল্প সময়েই মাত্র দূতেরা তাঁর সেবা করেছিলেন। তবে তিনি যখন *ইস্রায়েল সন্তানদের একে একে*

করে জড় করতে [গ] ও *বিক্ষিপ্ত যারা তাদের সংগ্রহ করতে* [ঘ] বাসনা করছেন যাতে যারা তাঁকে ভয় করে ও তাঁকে ডাকে তিনি তাদের সকলকেই ত্রাণ করতে পারেন [ঙ], তখন এমনটা কি সম্ভব নয় যে বহু বহু স্বর্গদূত যিশুর সেবা করবেন? কেননা মণ্ডলীর সমৃদ্ধি ও বিস্তার কাজে প্রেরিতদূতদের চেয়ে স্বর্গদূতেরাই অধিক সহযোগিতা দান করেন। এজন্যই ঐশপ্রকাশ পুস্তকে মণ্ডলীর কয়েকজন গণনেতা যোহন দ্বারা 'দূত' বলে অভিহিত [চ]। কেননা ঈশ্বরের দূতেরা যে এমনিই *মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন* [ছ] তা নয়, কেননা যে যে *চোখ জ্ঞানের আলো দ্বারা আলোকিত* [জ], তেমন চোখই তাঁদের দেখতে পায়।

[৪] তাই, প্রার্থনাকালে, যে প্রার্থনা করছে, তাঁরা তার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজনের কথা অবগত হয়ে তাঁদের দেওয়া সার্বিক দায়িত্ব অনুসারে তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা দান করেন। বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য একটা উদাহরণ উপযোগী হতে পারে। তাই ধরে নাও, ন্যায়পরায়ণ একজন চিকিৎসক এমন একজনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যে আরোগ্য প্রার্থনা করছে। যে ব্যক্তি প্রার্থনা নিবেদন করছে, তার রোগ যে কীভাবে নিরাময় করা যেতে পারে, সেই চিকিৎসক তা ভালই জানেন। এটাই স্পষ্ট যে, চিকিৎসক সেই প্রার্থনারত ব্যক্তিকে নিরাময় করতে অনুপ্রাণিত হবেন, সম্ভবত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে এই কারণে যে, তিনি উপলব্ধি করছেন সেটাই সেই ঈশ্বরের মন যিনি রোগমুক্তির বিষয়ে প্রার্থীর প্রার্থনা শুনেছেন। অথবা ধরে নাও, জীবনে যা প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক সম্পদশালী এক ব্যক্তি এমন গরিবের প্রার্থনা শুনছে যে নিজের প্রয়োজনের খাতিরে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ নিবেদন করছে। এটাই স্পষ্ট যে, সেই ব্যক্তি গরিবের প্রার্থনা পূরণ করবে ও তাতে সেই পিতার ইচ্ছার সেবাকর্মী হয়ে উঠবে যিনি প্রার্থনাকালে একই স্থানে সেই প্রার্থীকে নিয়ে এলেন ও সেই একজনকেও নিয়ে এলেন যে পরকে নিজের ধনের ভাগী করতে সক্ষম ও নিজের স্বভাবের ন্যায়পরতার জন্য তাকে উপেক্ষা করতে অক্ষম।

[৫] অতএব যখন এধরনের কিছু ঘটে, তখন আমাদের মনে করতে নেই, তা দৈবাৎ ঘটে, কারণ যিনি পবিত্রজনদের *মাথার চুলের হিসাবও রাখেন* [ক], তিনি প্রার্থনাকালে নিতান্ত উপযুক্তভাবে একত্র করেন সেই একজনকে যে শোনে ও

অভাবগ্রস্তের জন্য তাঁর দয়ার সেবাকর্মী হয়ে দাঁড়াবে, ও সেই ব্যক্তিকে যে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করেছে। একই প্রকারে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, যাঁরা ঈশ্বরের পরিদর্শক ও সেবক হিসাবে নিযুক্ত, সময় সময় তাঁদের উপস্থিতি কোন এক প্রার্থীর সঙ্গে একত্রে আনা হয় যাতে প্রার্থী যা যাচনা করছে সেই প্রার্থনার বস্তুতে দূতেরা ও প্রার্থী উভয়ই মিলিত হন। উপরন্তু, যিনি *অনুক্ষণ স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন* (খ) ও আমাদের নির্মাতার ঈশ্বরত্ব সন্দর্শনে নিত্য নিবদ্ধ আছেন, আমাদের প্রত্যেকের সেই দূত, মণ্ডলীতে যারা 'ক্ষুদ্রজন' তাদেরও দূত আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ও আমরা যা বিষয়ে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর সাধ্যমত সেই প্রার্থনা পূরণে সহযোগিতা দান করেন।

আমাদের গোটা জীবনই যেন একটা প্রার্থনা হয়

১২। [১] আমার বিবেচনায়, প্রার্থনাকালে পবিত্রজনেরা যখন বিশেষভাবে *আত্মা দিয়ে* ও *বুদ্ধি দিয়েও* প্রার্থনা করে (ক), তখন তারা যে যে কথা উচ্চারণ করে, সেই কথাগুলো এমন পরাক্রমে পরিপূর্ণ, যে পরাক্রম ঠিক যেন অন্তরে উদিত ও প্রার্থীর মুখ থেকে নির্গত এক আলোর মত সেই আধ্যাত্মিক বিষ নিঃশেষ করে যা বিরোধী শক্তিবৃন্দ সেই ব্যক্তিদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করায় যারা প্রার্থনা অবহেলা করে ও পলের সেই বাণী অমান্য করে, যা তিনি খ্রিষ্টের নির্দেশ অনুসারে উচ্চারণ করেছিলেন, '*তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর*'(খ)। কেননা জ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাস দিয়ে যে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা প্রার্থনারত পবিত্রজনের অন্তরের ভিতর থেকে ছোড়া তীরের মত বের হয়ে, যে অপদূতেরা পাপের বন্ধনে আমাদের জড়াতে বাসনা করে, সেই সকল ঈশ্বর-বিরোধী (গ) অপদূতকে আঘাত ক'রে তাদের ধ্বংস করে ও উল্টিয়ে ফেলে।

[২] উপরন্তু, যেহেতু সদ্‌গুণমণ্ডিত কর্ম ও আজ্ঞাপালন প্রার্থনার একটি অঙ্গ, সেজন্য সে-ই 'অবিরত' প্রার্থনা করে, যে প্রার্থনা শুভকর্মের সঙ্গে ও শুভকর্ম প্রার্থনার সঙ্গে মিলিত করে। কেননা *তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর* (ক) আদেশটা আমরা তবেই মাত্র বাস্তব রূপে মেনে নিতে পারি যদি এমনটা সমর্থন করি যে, সেই পবিত্রজনের গোটা জীবনই মহান ও অখণ্ড একটা প্রার্থনা। তেমন প্রার্থনার একটা অংশ সেটাই হলো যা সাধারণত 'প্রার্থনা' বলে অভিহিত, ও তেমন প্রার্থনা দিনে তিনবারের নিচে যেন সম্পাদন করা না হয়, যেমন সেই নবী দানিয়েলের দৃষ্টান্তে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যিনি

তীব্রতম বিপদের হুমকির মধ্যেও দিনে তিনবার প্রার্থনা করতেন (খ)। একইপ্রকারে পিতর প্রার্থনা করার জন্য মধ্যাহ্নের দিকে ছাদের উপরে উঠেছিলেন ও আকাশ থেকে *তার চার কোণ ধরে নামিয়ে দেওয়া সেই চাদর নামতে দেখেছিলেন* (গ)। সেসময়ে তিনি সেই তিন প্রার্থনার মধ্যবর্তী প্রার্থনাটা নিবেদন করছিলেন যা বিষয়ে দাউদ আগে উল্লেখ করে বলেছিলেন, '*প্রভাতে তুমি শুনবে আমার প্রার্থনা; প্রভাতে আমি তোমার সাক্ষাতে [আমার প্রার্থনা] উৎসর্গ করব ও চোখ তুলে চাইব*'(ঘ)। আর শেষ প্রার্থনা এ বাণী দ্বারা চিহ্নিত: *আমার উত্তোলিত দু'হাত সান্ধ্য অর্ঘ্যের মত* (ঙ)। আর শুধু তা নয়, আমরা রাত্রিকাল উপযুক্তভাবে যাপন করতে পারব না, যদি না সেই প্রার্থনা বাতিল করি যা লক্ষ করে দাউদ বলেছিলেন, *তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য আমি মাঝরাতে উঠে করি তোমার স্তুতি* (চ); এবং প্রেরিতদূতদের কার্যবিবরণীতে লেখা আছে যে, ফিলিপ্পিতে পল সিলাসের সঙ্গে মাঝরাতের দিকে প্রার্থনা করছিলেন ও ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, যার ফলে অন্যান্য *বন্দিরাও তাঁদের শুনতে পেয়েছিল* (ছ)।

১৩। [১] যখন যিশু নিজেও প্রার্থনা করেন, ও তাঁর প্রার্থনা বৃথা নয় যেহেতু তিনি যা যাচনা করেন প্রার্থনা দ্বারাই তা পান ও প্রার্থনা করা ছাড়া তিনি তা নাও পেতে পারতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেইবা প্রার্থনা অবহেলা করবে? কেননা মার্ক একথা বলেন যে, *ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন* (ক)। এবং লুক বলেন, *একদিন তিনি এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন ...* (খ), এবং অন্যত্র তিনি বলেন, *এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন* (গ)। এবং যোহন তাঁর প্রার্থনা উল্লেখ করে বলেন, *এই সমস্ত কথা বলার পর যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন* (ঘ)। এবং প্রভুর এই যে বচন একই সুসমাচার-রচয়িতা দ্বারা উল্লিখিত তথা *আমি জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন* (ঙ), সেই বচন দেখায় যে, যে 'সর্বদাই' প্রার্থনা করে, সে 'সর্বদাই' সাড়া পায়।

প্রার্থী যে সাড়া পায় তা বাইবেলে প্রমাণিত

[২] যারা উচিত মত প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে মহত্তম আশীর্বাদ অর্জন করেছে, আমাদের পক্ষে তাদের একটা তালিকা সঙ্কলন করার কী প্রয়োজন আছে যখন সেবিষয়ে এক একজন নিজ নিজ থেকেই শাস্ত্র থেকে আরও বেশি উদাহরণ বেছে নিতে পারে? যিনি মোশির পাশাপাশি উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য হলেন, সেই শামুয়েলের (ক) জন্মদানে আন্না নিজের সেবা অর্পণ করেছিলেন, কেননা যখন তিনি সন্তানবিহীন ছিলেন প্রভুর কাছে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন (খ)। যখন হেজেকিয়া ইশাইয়ার কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য, তখন তিনি সন্তানবিহীন হওয়ায় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন ও ত্রাণকর্তার বংশতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন (গ)। আর সেই হামানের ষড়যন্ত্র জনিত একটামাত্র রাজবিধির কারণে যখন গোটা জনগণ বিলুপ্ত হবার উপক্রম হচ্ছিল, তখন মোর্দেকাই ও এস্থারের উপবাস-সহ প্রার্থনা শোনা হল যার ফলে মোশির নির্দেশ করা পর্বগুলোর সঙ্গে জনগণকে *মোর্দেকাইয়ের* ফুর্তির *দিনও* যুক্ত হল (ঘ)। যুদিথ-ও পবিত্র প্রার্থনা নিবেদন করায় ঈশ্বরের সাহায্যে হলোফের্নেসকে পরাভূত করেন, তাতে একজনমাত্র হিব্রু মহিলা নেবুকাদ্রেজারের ঘরে লজ্জা আনলেন (ঙ)। এবং সেই আনানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েলের প্রার্থনাও শোনা হয়েছিল ও তাঁরা এমন *শিশিরময় বাতাসের মর্মরধ্বনি* গ্রহণ করতে উপযোগী বলে গণ্য হলেন যা *আগুনের শিখা* কার্যকর হতে বারণ করল (চ)। বাবিলনের সেই গর্তে সিংহদের মুখ দানিয়েলের প্রার্থনা দ্বারাই বন্ধ করা হয়েছিল (ছ), এবং সেই যোনা, যেহেতু যে *প্রকাণ্ড মাছ* তাকে গিলে ফেলেছিল *সেই মাছের পেট থেকে* তাঁর প্রার্থনা শোনা হবে বলে তিনি নিরাশ হননি, সেজন্য তিনিও সেই প্রকাণ্ড মাছের পেট থেকে বের হলেন ও নিনিভে-বাসীদের বিষয়ক ভাববাণীর যা তখনও অবশিষ্ট ছিল তা পূরণ করলেন (জ)।

আজও প্রার্থী সাড়া পায়

[৩] আমাদের যেকোন একজন যে সমস্ত উপকার গ্রহণ করেছে তার জন্য যদি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রশংসাবাদ নিবেদন করতে ইচ্ছা করত, তাহলে সে কত কিছু বর্ণনা করতে পারত? কারণ এমন প্রাণগুলো যা বহু দিন ধরে বন্ধ্যা ছিল, সেই

প্রাণগুলো যখন নিজেদের যৌক্তিকতার অনুর্বরতা ও নিজেদের মনের বন্ধ্যত্ব উপলব্ধি করেছে, তখন প্রার্থনা-নিষ্ঠার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হয়েছে ও এমন ত্রাণকারী বাণীর জন্ম দিয়েছে যা সত্য-উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ। আর যখন বিরোধী প্রতাপের বহু বিশাল বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছে, তখন আমাদের সেই শত্রুদের কতজনই না বিলুপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ 'যুদ্ধরথে' ও কেউ কেউ 'অশ্বে' সাহস পায়, কিন্তু আমরা যখন *আমাদের ঈশ্বর প্রভুর নাম করি* (ক), তখন দেখতে পাই যে, সত্যিই *অশ্ব তো ত্রাণের জন্য বৃথা আশা* (খ)। উপরন্তু, প্রভুর প্রশংসায় যে ভরসা রাখে (যুদিথ নামের অর্থই 'প্রশংসা'), সে প্রায়ই শত্রুদলের *প্রধান সেনাপতিকে* (গ), এমনকি সেই প্রতারণাময় ও প্ররোচনাময় বাণীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে যা তাদের অনেককেও ভয়েতে অভিভূত করে যারা নিজেদের বিশ্বাসী মনে করে। আর জয় করা কঠিন এমনকি যেকোন অগ্নিশিখার চেয়েও বেশি জ্বলন্তই পরীক্ষার বারে বারে সম্মুখীন হয়ে যারা তেমন পরীক্ষা থেকে কোন কষ্টভোগ করেনি বরং বিরোধী *আগুনের গন্ধেরও* ক্ষতি দ্বারা আঘাতগ্রস্ত না হয়ে (ঘ) তেমন পরীক্ষারও মধ্য দিয়ে একেবারে অবিক্ষত অবস্থায় পেরিয়ে গিয়েছে, সেই বহুজনের বিষয়ে আমাদের কী বলতে হবে? আরও, অপদূত ও নিষ্ঠুর মানুষের বেশে আমাদের বিরুদ্ধে হিংস্র করা বহু বন্য পশুর মধ্যে কতগুলোই না পতিত হয়েছে ও প্রার্থনার জোরে মুখ বন্ধ করেছে যেহেতু আমাদের মধ্যে যারা *খ্রিস্টের অঙ্গ* (ঙ) হয়েছিল তাদের গায়ে দাঁত বসাতে পারেনি? কেননা প্রতিটি পবিত্রজনের জন্য বারবার *প্রভু উপড়ে ফেললেন যত সিংহের দাঁত, আর সেগুলো সরে যাওয়া জলের মতই বিলীন হয়ে গেল* (চ)। আর আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরের আদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা মৃত্যু দ্বারা পরাজিত হলে পর ও তাদের *গিলে ফেলা* হলে পর তারা অনুতাপের মধ্য দিয়েই তেমন মহাবিপদ থেকে নিস্তার পেল, কারণ মৃত্যুর *পেটে* বন্দি অবস্থায় থাকাকালেও (ছ) তারা নিস্তার পাওয়ায় নিরাশ হয়নি। বস্তুত মৃত্যু জয়ী হয়ে তাদের কবলিত করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর পুনরায় প্রতিটি মুখ থেকে অশ্রুজল মুছে দিলেন (জ)।

[৪] প্রার্থনা যাদের উপকার করেছে, তাদের একটা তালিকা দেওয়ার পর, আমার মতে এসব কিছু বলা প্রয়োজন ছিল, যাতে যে কেউ খ্রিস্টে আত্মিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা

করে, প্রার্থনাকালে সে যেন অসার ও পার্থিব বস্তু যাচনা করা থেকে বিরত থাকে, এবং যারা এ লেখাটা পাঠ করছে, তাদের যেন সেই রহস্যগুলোর দিকেই ধাবিত করাতে পারি, পূর্বকথিত বিষয়গুলি যা দৃষ্টান্ত মাত্র। কেননা উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপিত যত আত্মিক ও রহস্যময় অনুগ্রহদানগুলোতে সম্পর্কযুক্ত যেকোন প্রার্থনা তারই দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে যে *মাংসের বশে সংগ্রাম করে না* (ক), বরং তারই দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে যে *আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটায়* (খ)। কেননা যারা আক্ষরিক ও প্রত্যক্ষ অর্থের ভিত্তিতে সেই উপকার ভাবে যা তারাই পাবে যারা প্রার্থনা করে, আমাদের পক্ষে এদের চেয়ে তাদেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত যারা সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত কিছুর আধ্যাত্মিক অর্থের অন্বেষণ করে। কেননা আমাদের এমন চর্চা করতে হবে যাতে যখন আত্মিক কান দিয়ে আত্মিক বিধান শুনি তখন যেন সেই বন্ধ্যত্ব ও অনুর্বরতা আমাদের সামনে না দাঁড়ায়, যাতে করে আমাদের বন্ধ্যত্ব ও অনুর্বরতায় আক্রান্ত অবস্থা ছেড়ে দিয়ে আমরা সেইভাবে আমাদের প্রার্থনায় সাড়া পেতে পারি যেভাবে আন্না ও হেজেকিয়া সাড়া পেয়েছিলেন, এবং মোর্দেকাই, এস্থার ও যুদিথ যেভাবে নিস্তার পেয়েছিলেন, আমরাও যেন তাঁদের মত সেই আধ্যাত্মিক শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারি যারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য সেই ধূর্তজন দ্বারা প্রেরিত। আর যেমন মিশর হলো এমন লোহা ঢালবার *হাপর* স্বরূপ (গ) যা পার্থিব যত স্থানের প্রতীক, তেমনি যে কেউ মানবজীবনের অনিষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছে ও পাপ দ্বারা অগ্নিদগ্ধ হয়নি বা যার অন্তর চুল্লির মত আগুনে পরিপূর্ণ হয়নি, তাকে কমপক্ষে তাঁদেরই মত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে যাঁদের সেই ‘শিশিরময়’ আগুনে (ঘ) যাচাই করা হয়েছিল। আর যে কেউ প্রার্থনা করার পর সাড়া পেয়ে বলে *যে প্রাণ তোমাকে ধন্য বলেছে তাকে তুমি দিয়ো না গো বন্যজন্তুর মুখে* (ঙ), ও যে কেউ কেউটে ও সাপের দ্বারা কোন কষ্ট ভোগ করেনি কারণ খ্রিষ্টের দ্বারা সে সেগুলোর উপর পা দিল ও *সিংহ ও দানবকে* (চ) মাড়িয়ে দিল সেই উন্নত অধিকার গুণে যা *সাপ ও বিছে পায়ের নিচে ও শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে মাড়াবার* (ছ) জন্য যিশু দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো দ্বারা আদৌ আঘাতগ্রস্ত হয়নি, তাকে দানিয়েলের চেয়েও আরও বেশি ধন্যবাদ জানাতে হবে কেননা তাকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর বন্যজন্তুগুলো থেকে নিস্তার করা হয়েছে। আর যে

প্রকাণ্ড মাছ যোনাকে কবলিত করেছিল, সেই মাছ যে কোন্ পশুর প্রতীক, তা যে বুঝতে পেরেছে ও এটাও উপলব্ধি করেছে যে, পশুটা হল সেই একই পশু যা বিষয়ে যোব বলেন, *যে সেই প্রকাণ্ড মাছের উপর জয়ী হতে চলছে, সেই দিনকে যে অভিশাপ দেয়, সে সেটাকে অভিশাপ দিক* (জ), তেমন ব্যক্তি যদি কোন সময় যেকোন প্রকার অবাধ্যতা বশত 'সেই প্রকাণ্ড মাছের পেটে' আছে বলে উপলব্ধি করে, তাহলে অনুতপ্ত মনে প্রার্থনা করুক ও সে সেখান থেকে বের হবেই। আর একবার বেরিয়ে এলে সে যদি ঈশ্বরের আদেশগুলির প্রতি বাধ্যতায় নিষ্ঠাবান থাকে, তবে পবিত্র আত্মার মঙ্গলময়তা গুণে সে নিনেভের সেই অধিবাসীদের কাছে ভাববাণী দিতে পারবে যারা বর্তমানকালে ধ্বংসের সম্মুখীন, ও তাদের জন্য পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠবে, কেননা সে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বিষয়ে নিরাশ হয়নি ও এমনটাও বাসনা করেনি যে, অনুতপ্ত যারা ঈশ্বর তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাতে থাকবেন।

[৫] সেই যে মহত্তম কাজ শামুয়েল প্রার্থনা দ্বারা সাধন করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়, যে কেউ সত্যিই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ও সাড়া পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছে, সেও সেই মহত্তম কাজ এখনও আত্মিকভাবে সাধন করতে পারে। কেননা লেখা আছে, 'এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন। আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন'। এবং কয়েক পদ পরে লেখা আছে, *তখন শামুয়েল প্রভুকে ডাকলেন ও প্রভু সেদিন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করলেন* (ক)। কেননা যারা পবিত্র ও সেই সকলে যারা যিশুর প্রকৃত শিষ্য, প্রভু তাদের বলেন, *চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সাদা হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; যে ফসল কাটে সে মজুরি পায় ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফল সংগ্রহ করে* (খ)। যারা নবীদের বাণী শোনে, ফসল কাটার এই সময়ে প্রভু তাদের চোখের সামনে একটা মহাকাজ সাধন করেন; কারণ যখন পবিত্র আত্মায় অলঙ্কৃত যেকোন ব্যক্তি প্রভুকে ডাকে, তখন ঈশ্বর আকাশ থেকে এমন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি দেন যা প্রাণকে জলসিক্ত করে, যাতে আগে যে কেউ পাপে লিপ্ত ছিল, সে যেন এখন প্রভুকে গভীরভাবে ভয় করে ও তাঁর অনুগ্রহের সেবাকর্মী হতে পারে, কারণ তার নিজের প্রার্থনার সাড়াতেই সে শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য বলে প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে। আর সেই

এলীয়ও ভক্তিহীনদের কারণে আকাশ *তিন বছর ছ'মাস ধরে* রুদ্ধ করে রেখেছিলেন, ও পরবর্তীকালে ঐশআদেশে তা খুলে দিয়েছিলেন (গ)। যে কেউ পাপের দরুন অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত ছিল, সে প্রার্থনা দ্বারা আত্মার জন্য বৃষ্টির জল পায়।

প্রার্থনার বিষয়বস্তু - প্রার্থনার নানা প্রকার - প্রার্থনার পাত্র ঈশ্বর

১৪। [১] আমরা এতক্ষণে সেই সমস্ত উপকারের কথা ব্যক্ত করে এসেছি যা পবিত্রজনেরা প্রার্থনা দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন; এখন এসো, এই বচনের দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরাই, *তোমরা মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ কর ও সামান্য বিষয়ও তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে; স্বর্গীয় বিষয়ের অন্বেষণ কর ও পার্থিব বিষয় তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে* (ক)। আচ্ছা, সত্যময় ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর তুলনায় প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো হল 'সামান্য' ও 'পার্থিব' বিষয়। এমনটা মনে হতে পারে যে, যখন ঐশবাণী পবিত্রজনদের প্রার্থনা অনুকরণ করতে আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন বাস্তবরূপে তা পেতে পারি যা তাঁরা কেবল প্রতীকাকারেই পেয়েছিলেন (খ), তখন তিনি সেই 'স্বর্গীয়' ও 'মহৎ' বিষয়গুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন যা পার্থিব ও সামান্য বিষয়গুলোতে প্রতীকাকারে নির্দেশিত। প্রকৃতপক্ষে বচনটা বলতে চায়, "তোমরা যারা আধ্যাত্মিক হতে ইচ্ছা কর, প্রার্থনা দ্বারা স্বর্গীয় ও মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ কর, যাতে সেগুলোকে 'স্বর্গীয়' বলে গ্রহণ করায় তোমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পার, ও সেগুলোকে 'মহৎ' বলে গ্রহণ করায় তোমরা মহৎ মঙ্গলদান ভোগ করতে পার। আর যে 'পার্থিব' ও 'সামান্য' বিষয়গুলো তোমাদের দেহের প্রয়োজনের জন্য দরকার আছে, তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলোকে পিতাই দান করবেন।"

[২] এদিকে, যেহেতু তিমথির কাছে প্রথম পত্রে প্রেরিতদূত প্রার্থনা বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত চারটে বিষয়বস্তুর জন্য চারটে শব্দ ব্যবহার করেন, সেজন্য তাঁর নিজের কথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, সেই চারটে শব্দ উল্লেখ করা, ও আমরা সেই চারটে শব্দের প্রতিটি অর্থ সঠিক ভাবে বুঝেছি কিনা তা সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা উপযোগী হতে পারে। তিনি যা বলেন, তা এ, *তাই আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়* ইত্যাদি (ক)। আচ্ছা, আমি মনি করি যে, 'মিনতি' হলো একটা প্রার্থনা

যা অনুনয়ের সঙ্গে নিবেদিত হয় যাতে এমন কিছু পাওয়া যায় যা বিষয়ে একজন ব্যক্তি অভাবী; অন্যদিকে 'প্রার্থনা' উৎকৃষ্ট মনা ব্যক্তি দ্বারা [ঈশ্বরের উদ্দেশে] গৌরবারোপণ সহ নিবেদিত হয়। 'অনুরোধ' কিছুটা পাবার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে এমন যাচনা যা সাহসের সঙ্গে নিবেদিত। এবং 'ধন্যবাদ-স্তুতি' হলো কৃতজ্ঞতা-স্বীকার যা এমন ব্যক্তি দ্বারা উচ্চারিত যে প্রার্থনা করার পর ঈশ্বরের কাছ থেকে মঙ্গলকর কিছু পেয়েছে; তেমন কৃতজ্ঞতা-স্বীকার গৃহীত আশীর্বাদের মহত্ত্বেরই স্বীকার স্বরূপ, কেননা আশীর্বাদের মহত্ত্ব তারই কাছে স্পষ্টতর হয় যার উপর তা বর্ষণ করা হয়েছে।

[৩] প্রথমটার, অর্থাৎ মিনতির উদাহরণ হিসাবে সেই বাণী হতে পারে যা গাব্রিয়েল তখনই জাখারিয়াকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন যখন জাখারিয়া অবশ্যই যোহনের জন্ম সম্পর্কে প্রার্থনা করছিলেন। বাণীটা এ, *জাখারিয়া, ভয় করো না, কারণ তোমার মিনতি গ্রাহ্য হয়েছে: তোমার স্ত্রী এলিশাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে* (ক)। আরও, যাত্রাপুস্তকে সেই সোনার বাছুর সম্পর্কে লেখা আছে, *মোশি ঈশ্বর প্রভুর সামনে মিনতি করে বললেন, প্রভু, তোমার যে জনগণকে তুমি মহাপরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে বের করেছ, তাদের উপরে তোমার ক্রোধ কেন জ্বলে উঠবে?* (খ)। আরও, দ্বিতীয় বিবরণে লেখা আছে, *পরে আমি, আগে যেমন করেছিলাম, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারের মত প্রভুর সামনে মিনতি করেছি; আমি চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি, তোমাদের সেই পাপের কারণে যা তোমরা সাধন করেছিল* (গ)। আরও, এস্থার পুস্তকে লেখা আছে, *মোর্দেকাই প্রভুর সমস্ত কর্মকীর্তি স্মরণ করে প্রভুর কাছে মিনতি করে বললেন: প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা* (ঘ)। আরও, এস্থার বিষয়ে লেখা আছে, *তিনি এই বলে ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে মিনতি জানালেন: হে প্রভু, হে আমাদের রাজা* (ঙ)।

[৪] দ্বিতীয় ধরনের প্রার্থনার উদাহরণ দানিয়েলে পাওয়া যেতে পারে, *তখন আজারিয়া উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা নিবেদন করলেন; আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি মুখ খুলে বললেন …* (ক)। আরও, তোবিত পুস্তকে লেখা আছে, *প্রাণে দুঃখ পেয়ে আমি এ বলে এ প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম: প্রভু, তুমি ধর্মময়, তোমার সকল কাজও ধর্মময়। তোমার সমস্ত কাজ দয়া ও সত্যমণ্ডিত। আর তুমি সত্য ও ন্যায় বিচার সম্পাদন কর*

চিরকাল (খ)। কিন্তু, যেহেতু পরিচ্ছেদনের যারা (গ), তারা দানিয়েলের বচনে একটা ‘অবেলুস’(ঘ) রাখল যা হিব্রু পাঠ্যে নেই, আর যেহেতু তোবিত পুস্তক [পুরাতন] নিয়মে নেই বলে তারা সেই পুস্তককে অস্বীকার করে, সেজন্য আমি আন্না সংক্রান্ত অতিরিক্ত একটা বচন উল্লেখ করব যা শামুয়েলের প্রথম পুস্তকে রয়েছে, *তিনি তিক্ত অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি এই বলে প্রার্থনা করলেন, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও* … (ঙ) ইত্যাদি। আরও, হাবাকুকে লেখা আছে, *নবী হাবাকুকের প্রার্থনা; সুর-বিশিষ্ট। প্রভু, আমি শুনেছি তোমার কণ্ঠ ও ভীত হয়েছি। প্রভু, তোমার কাজের কথা ভেবে আমি আতঙ্কিত। সেই দু’টো প্রাণীর মাঝখানে তুমি জ্ঞাত হবে, বর্ষগুলো ঘনিয়ে আসতে আসতে তুমি পরিচিত হবে* (চ)। তাতে আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট একটা উদাহরণ পাচ্ছি, কেননা যে প্রার্থনা করছে, সে প্রশংসা-সহই প্রার্থনা নিবেদন করছে। উপরন্তু, যোনায় লেখা আছে, *সেই প্রকাণ্ড মাছের পেটের ভিতর থেকে যোনা তাঁর ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন: আমার সঙ্কটে আমি আমার ঈশ্বর প্রভুকে ডাকলাম, আর তিনি আমাকে শুনলেন; পাতালের পেটের ভিতর থেকে তুমি শুনলে আমার কণ্ঠের চিৎকার। তুমি আমাকে সমুদ্রের হৃদয়-গভীরে নিক্ষেপ করলে, আর জলস্রোত ঘিরে ফেলল আমায়* (ছ)।

[৫] এবার তৃতীয় ধরনের প্রার্থনা তথা ‘অনুরোধ’ সংক্রান্ত উদাহরণ প্রেরিতদূতের সেই লেখায় উপস্থাপন করা হবে, যেখানে তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবে ‘প্রার্থনাকে’ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আরোপ করেন কিন্তু ‘অনুরোধকে’ [পবিত্র] আত্মার নিয়ন্ত্রণেই আরোপ করেন যেহেতু পবিত্র আত্মা [আমাদের চেয়ে] শ্রেয় ও যাঁর কাছে অনুরোধ রাখেন তাঁর সঙ্গে তিনি সাহস দেখাতে পারেন। বাস্তবিকই তিনি বলেন, *কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন* (ক)। বাস্তবিকই আত্মা ‘অনুরোধ’ করেন এমনকি ‘প্রবল অনুরোধ’ করেন, কিন্তু আমরা ‘প্রার্থনা’ করি। আমার মতে, গিবেয়োনে সূর্য থামাবার ব্যাপারে

যোশুয়া যা বলেন, তা একটা ‘অনুরোধ’: *যেদিন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে আমোরীয়দের তুলে দিলেন, ও তিনি গিবেয়োনে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন ও তারা ইস্রায়েলের সামনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল, সেদিন যোশুয়া বললেন: সূর্য গিবেয়োনে থামুক। চন্দ্রও এলোম উপত্যকায় থামুক* (খ)। এবং বিচারকগণ পুস্তকে, আমি মনে করি, শামশোন একটা ‘অনুরোধ’ রেখেছিলেন যখন বলেছিলেন, ‘ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমার প্রাণ যাক’। তেমনটা তখনই ঘটেছিল যখন তিনি *তাঁর সমস্ত বলে নিচু হয়ে পড়লেন, আর সেই গৃহ নেতাদের উপরে ও যত লোক ভিতরে ছিল, তাদের সকলের উপরে ভেঙে পড়ল* (গ)। যদিও এমনটা লেখা নেই যে যোশুয়া ও শামশোন ‘অনুরোধ’ করেছিলেন বরং কেবল ‘তিনি বললেন’ বাক্যটাই উল্লিখিত, তবু তাঁদের কথা স্পষ্টই অনুরোধ বলে বোধগম্য। আর আসলে শব্দগুলোতে সূক্ষ্ম অর্থ আরোপ করলে তবে মেনে নিতে হবে যে, তাঁদের কথা সাধারণ ‘প্রার্থনা’ থেকে ভিন্ন।

‘ধন্যবাদ-স্তুতি’ সংক্রান্ত একটা উদাহরণ হলো আমাদের প্রভুর কণ্ঠ যখন তিনি বলেন, *হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি* [এক্সোমোলোগুমাই], *কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ* (ঘ); কেননা ‘এক্সোমোলোগুমাই’ ও ‘এউখারিস্তো’ সমার্থক শব্দ [অর্থাৎ, ‘ধন্য বলি’ ও ‘ধন্যবাদ-স্তুতি করি’ বাক্যদ্বয় একই অর্থ বহন করে]।

[৬] তাই পবিত্রজনদের প্রতি [অর্থাৎ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি] মিনতি, অনুরোধ ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা আদৌ অনুচিত নয়। এমনকি, সেগুলোর মধ্যে দু’টো, অর্থাৎ অনুরোধ ও ধন্যবাদ-স্তুতি কেবল পবিত্রজনদের প্রতি নয়, অন্য সকল মানুষের প্রতিও নিবেদন করা যেতে পারে, কিন্তু ‘মিনতি’টা শুধু পবিত্রজনদের প্রতি নিবেদন করা যেতে পারে যদি এমন একজনকে পাওয়া যায় যিনি পল বা পিতরের সমতুল্য, যাতে করে, *পাপ ক্ষমা করার যে অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়েছিল* (ক), তাঁরা আমাদের তা পাবার যোগ্য করায় সহায়তা করেন। আর আমরা যদি পবিত্রজন নয় এমন কারও প্রতি অনিষ্টকর কিছু করি, তাহলে যখন আমরা তার প্রতি আমাদের পাপকর্মের বিষয়ে সচেতন হই, তখন তেমন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে পারি যেন, আমরা যে অনিষ্ট তার প্রতি সাধন করেছি, সে যেন আমাদের ক্ষমা করে। তেমন ধরনের প্রার্থনাগুলো যখন

পবিত্রজনদের প্রতি নিবেদন করতে হয়, তখন কি অধিকতর ভাবে খ্রিষ্টের প্রতিই ধন্যবাদ-স্তুতি জানানো উচিত নয় যিনি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তেমন আশীর্বাদ দানে আমাদের উপকৃত করেন? কিন্তু তবুও তাঁর প্রতি আমাদের অনুরোধ রাখতে হবে যেইভাবে স্তেফান তখনই করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না* (খ)। এবং সেই অপদূতগ্রস্ত ছেলের পিতার অনুকরণে আমাদের বলতে হবে *প্রভু, মিনতি করি, আমার ছেলের প্রতি দয়া করুন* (গ) অথবা 'আমার প্রতি' বা যেকোন একজনেরই প্রতি 'দয়া করুন'।

১৫। [১] এবার আমরা যদি প্রার্থনার স্বীয় প্রকৃতিকে লক্ষ করি, তাহলে আমাদের পক্ষে কোন নারীজাত ব্যক্তির কাছে, এমনকি স্বয়ং খ্রিষ্টের কাছেও প্রার্থনা করা উচিত নয়, কিন্তু কেবল বিশ্বপিতা সেই ঈশ্বরেরই কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাঁর কাছে, যেভাবে আমরা আগে এবিষয়ে ব্যাখ্যা করেছি (ক), আমাদের ত্রাণকর্তা নিজেও প্রার্থনা করছিলেন ও যাঁর কাছে প্রার্থনা করতে আমাদের শিখিয়েছিলেন। কেননা, যখন তিনি '*আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান*' কথাটা শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর নিজের কাছে নয়, বরং পিতারই কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন: হে আমাদের *স্বর্গস্থ পিতা* … (খ) ইত্যাদি। কেননা, যেমন অন্যত্র দেখানো হয়েছে (গ), যদি পুত্র এমন অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি পিতা থেকে স্বতন্ত্র (ঘ), তাহলে আমাদের পিতার কাছে নয় কিন্তু পুত্রেরই কাছে, অথবা উভয়েরই কাছে, বা কেবল পিতারই কাছে প্রার্থনা করা উচিত। পিতার কাছে নয় কিন্তু পুত্রেরই কাছে যে প্রার্থনাটা করা উচিত, তা একেবারে অযৌক্তিক বিষয়, এমনকি যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের বিপরীত এমন বিষয় যা সর্বস্থানে নিন্দার বস্তু। অপর দিকে আমরা যদি উভয়েরই কাছে প্রার্থনা করি, তাহলে এটাই স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, আমাদের পক্ষে বহুবচন ব্যবহার করেই আমাদের যাচনা নিবেদন করা উচিত, তাই প্রার্থনাকালে আমাদের বলতে হত, 'হে উভয়, এটা সেটা প্রদান করুন', 'হে উভয়, ধন্য হোন', 'হে উভয়, যুগিয়ে দিন', 'হে উভয়, ত্রাণ করুন' ইত্যাদি প্রার্থনা। তেমন কথন স্পষ্টভাবে অসঙ্গত, এবং এমন কেউই নেই যে এমনটা দেখাতে পারে, শাস্ত্রে সেই ধরনের উক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এটাই মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে যে, আমাদের কেবল পিতারই

কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কিন্তু সেই *মহাযাজককে* বাদ দিয়ে নয় যিনি পিতা দ্বারা এমন *শপথের মধ্য দিয়ে নিযুক্ত হয়েছেন* যা এ বচনে ব্যক্ত, *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না: মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক* (ঙ)।

[২] সুতরাং, যখন পবিত্রজনেরা নিজ নিজ প্রার্থনায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, তারা যিশুখ্রিষ্টের দ্বারাই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ ধন্যবাদ স্বীকার করে। যেমন এমনটাও সমুচিত যে, প্রার্থনা ক্ষেত্রে সুবিবেচক ব্যক্তি এমন একজনের কাছে প্রার্থনা করবে না যে নিজেও প্রার্থনা করে, বরং সে সেই একজনেরই কাছে প্রার্থনা করবে যাঁকে আমাদের প্রভু যিশু আমাদের প্রার্থনায় 'পিতা' বলে সম্বোধন করতে শিখিয়েছেন, তেমনিভাবে প্রভু যিশুর দ্বারা ছাড়া পিতার কাছে কোনও প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত নয়, কেননা তিনি নিজে বিষয়টা স্পষ্ট করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন। এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি; যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে* (ক)। বাস্তবিকই তিনি তো বলেননি, 'আমার কাছে যাচনা কর', এমনি 'পিতার কাছে যাচনা কর'-ও বলেননি, কিন্তু বলেছিলেন, 'পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন'। কেননা যতদিন যিশু একথা শিখিয়েছিলেন, ততদিন ধরে কেউই পুত্রের নামে পিতার কাছে যাচনা করেনি। আর যিশু যা বলেছিলেন, তা সত্য ছিল, 'এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি', এবং তাঁর এই একথাও সত্য ছিল, 'যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে'।

[৩] এসো, এমনটা ধরে নিই যে, কেউ না কেউ মনে করছে, স্বয়ং খ্রিষ্টেরই কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, এবং সে এমনটা সমর্থন করছে যে, আমরা তেমনটা করতে পারি যেহেতু সে বলে যে, দ্বিতীয় বিবরণের একটা বচনে, তথা *ঈশ্বরের সকল দূত তাঁকে উপাসনা করুন* (ক) বচনে খ্রিষ্টকে উপাসনা করা হয়, আর প্রকৃতপক্ষে বচনটা খ্রিষ্টকে লক্ষ করে। সেই ব্যক্তিকে বলা হোক যে, নবী দ্বারা যা যেরুশালেম বলে অভিহিত হয়, সেই মণ্ডলী সম্পর্কে এটাও বলা হয় যে, মণ্ডলীকে সেই রাজা-রানীদের দ্বারা উপাসনা করা হয় যারা সেই মণ্ডলীর প্রতিপালক পিতা ও ধাইমা। কথাটা এই

বচনে উল্লিখিত, *দেখ, হাত তুলে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব, জাতিসকলের জন্য আমার নিশানা উত্তোলন করব: তারা তোমার সন্তানদের কোলে করেই ফিরিয়ে আনবে, তোমার কন্যাদের কাঁধে করেই বহন করবে। রাজারাই হবে তোমার প্রতিপালক পিতা, তাদের রাজকন্যারা হবে তোমার ধাইমা। তারা মাটিতে অধমুখ হয়ে [তোমাকে] উপাসনা করবে, তোমার পায়ের ধুলা চেটে খাবে; তখন তুমি জানবে যে: আমিই প্রভু, আর তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না* (খ)।

[৪] *আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর* (ক), একথা কি খ্রিষ্ট নিজেই বলেননি? তিনি কি এধরনের কথা বলতে পারতেন না, "কেন তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর? তোমাদের পক্ষে কেবল সেই পিতারই কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাঁর কাছে আমিও প্রার্থনা করি। বিষয়টা পবিত্র শাস্ত্র থেকে শিখে নাও, কেননা এমনটা উচিত নয় যে, তোমরা পিতা দ্বারা তোমাদের জন্য নিযুক্ত এমন কোন মহাযাজকের 'কাছে' প্রার্থনা করবে যিনি পিতা থেকেই 'সহায়ক'(খ) ভূমিকা পেয়েছেন; না, তোমাদের বরং তাঁরই 'দ্বারা' প্রার্থনা করা উচিত যিনি মহাযাজক ও সহায়ক, যিনি তোমাদের *দুর্বলতার সমব্যথী হতে সক্ষম*, যিনি তোমাদের মত *সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন* কিন্তু পিতার স্বাধীন দানের মাধ্যমে *পাপ ছাড়াই* পরীক্ষিত হয়েছেন ও তাঁকে *পাপ ছাড়া* পাওয়া গেছে (গ)। অতএব, জেনে নাও, আমাতে *নবজন্ম লাভ* করার ফলে ও *দত্তকপুত্রত্বের আত্মাকে* লাভ করার ফলে তোমরা আমার পিতা থেকে কেমন মহা দান পেয়েছ যাতে তোমরা *ঈশ্বরের পুত্র* ও আমার আপন ভাই বলে পরিগণিত হতে পার (ঘ)। কেননা তোমাদের বিষয়ে আমা দ্বারা পিতাকে যা বলা হয়েছিল, তা তোমরা দাউদের কণ্ঠ দ্বারা অবশ্যই পড়েছ, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, তোমার প্রশংসা করব মণ্ডলীর মাঝে* (ঙ)। তাই তোমাদের যখন সেই ভাইয়ের সঙ্গে এক পিতার সহভাগী হওয়ার যোগ্য করা হয়েছে, তখন একটা ভাইয়ের কাছে প্রার্থনা করা একেবারে যুক্তিহীন। তোমাদের উচিত আমার সঙ্গে ও আমার দ্বারা কেবল পিতারই কাছে তোমাদের প্রার্থনা নিবেদন করা।"

১৬। [১] তাই যখন আমরা যিশুকে একথা বলতে শুনি, তখন এসো, একই কথা ব'লে ও যেভাবে প্রার্থনা করি সেইভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাঁরই দ্বারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

করি। কেউ কেউ পিতার কাছে ও কেউ কেউ পুত্রের কাছে প্রার্থনা করলে তবে আমরা কি বিচ্ছিন্ন নই? কেননা যারা পিতার সঙ্গে বা পিতাকে ছাড়া পুত্রের কাছে প্রার্থনা করে, তারা এবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে ও বিচার-বিবেচনার অভাবেও অধিক সরলতার কারণে একই পাপ করে। সেজন্য এসো, ঈশ্বর বলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, পিতা বলে তাঁর কাছে যাচনা করি, প্রভু বলে তাঁর কাছে মিনতি করি, এমন ঈশ্বর বলে তাঁর কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যিনি পিতা ও প্রভু কিন্তু কোন অর্থেই কোন দাসের প্রভু নন। কেননা পিতা সঙ্গতভাবেই প্রভু বলে গণ্য, কেবল পুত্রের নয়, বরং যারা তাঁর দ্বারা দত্তকপুত্রত্ব পেয়েছে তাদের সকলেরও পিতা। আর যেমন তিনি *মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর* (ক), তেমনি তিনি হীনতম জন্মগত দাসদের প্রভু নন, কিন্তু এমন দাসদের প্রভু যারা আদিতে বাল্যকালীন অবস্থার কারণে ভীত ছিল কিন্তু যাদের উন্নত করা হয়েছে, ও পরে ভালবাসার খাতিরে এমন সেবা নিবেদন করে যা ভীতিজনিত সেবার চেয়ে অধিক সুখময় সেবা। কেননা ঈশ্বরের দাসদের ও সন্তানদের চিহ্নগুলো আত্মায় রয়েছে, ও কেবল সেই একজনের কাছে দৃশ্যমান যিনি হৃদয়কে তলিয়ে দেখেন।

[২] অতএব, যে কেউ ঈশ্বরের কাছে পার্থিব ও সামান্য বিষয়ের অন্বেষণ করে, সে সেই ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য যিনি আদেশ করেন যেন আমরা, যিনি পার্থিব ও সামান্য বিষয় প্রদান করতে জানেন না, সেই ঈশ্বরের কাছে স্বর্গীয় ও মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ করি। এবং কেউ যদি প্রার্থনা দ্বারা পবিত্রজনদের কাছে মঞ্জুর করা পার্থিব বা সামান্য কোন বিষয় সম্পর্কে ও সুসমাচারের সেই উক্তি (ক) সম্পর্কে আপত্তি করে যে উক্তি আমাদের শেখায় যে পার্থিব ও সামান্য বিষয় বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে, তাহলে আমরা উত্তর দেব যে, যখন কেউ আমাদের পার্থিব কিছু দিলে যেমন আমরা এমনটা বলি না যে সে আমাদের একটা জিনিসের ছায়া দিয়েছে, যেহেতু সে ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের কাছে দু'টো জিনিস তথা জিনিসটা ও সেটার ছায়া মঞ্জুর না ক'রে বরং দাতা হিসাবে তার অভিপ্রায় হলো পার্থিব একটা জিনিস দেওয়া, আর ফলত আমরা যে ছায়াটা পেয়েছি তা দেওয়া জিনিসের উপর নির্ভর করে, তেমনিভাবে যদি আমাদের মন উন্নত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেই প্রধান প্রধান জিনিস উপলব্ধি করতে পারব যেগুলো ঈশ্বর দ্বারা আমাদের দান করা হয়েছে, আমরা বলতে পারব যে, পার্থিব বস্তুগুলো হলো সেই

মহৎ ও স্বর্গীয় *আত্মিক অনুগ্রহদানগুলোর* (খ) এমন উপযুক্ত বাড়তি যা পবিত্রজনদের মঙ্গলার্থে (গ) অথবা তাদের *বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে* (ঘ) বা দাতার *ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের এক একজনকে দেওয়া হয়* (ঙ)। আর যদিও আমরা প্রতিটি দান বিষয়ে দাতার যোগ্য কারণ বা যুক্তির বর্ণনা দিতে অক্ষম, তবু তাঁর ইচ্ছা প্রজ্ঞাময়।

[৩] তাই আন্নার প্রাণ যখন একপ্রকার বন্ধ্যত্ব ফেলে রেখেছিল, তখন, তাঁর দেহ শামুয়েলকে গর্ভে ধারণ করার (ক) চেয়ে তাঁর প্রাণ আরও বেশি ফল বহন করল। এবং হেজেকিয়া নিজের মন থেকে এমন পুত্রসন্তানদের জন্মদাতা হলেন, যারা, যখন তিনি নিজের দৈহিক বীজ থেকে পুত্রসন্তানদের জন্মদাতা হলেন, এদের চেয়ে ছিল অধিক ঐশ্বরিক। এবং এস্থার ও মোর্দেকাই ও গোটা [ইহুদী] জনগণ, হামান ও তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে আত্মিক ষড়যন্ত্র থেকে মহত্তর নিস্তার পেয়েছিলেন। [এবং যুদিথ] কুখ্যাত হলোফের্নেসের প্রতাপ ছিন্ন করার চেয়ে সেই *অধিপতির* (খ) প্রতাপ ছিন্ন করেছিলেন যে তাঁর প্রাণ ধ্বংস করতে সচেষ্ট ছিল। এবং কেই বা এমনটা মেনে নেবে না যে, সকল পবিত্রজনের উপর যে আশীর্বাদ নেমে আসে ও যা বিষয়ে ইসহাক যাকোবকে *‘ঈশ্বর তোমাকে আকাশের শিশির প্রদান করুন’* (গ) বলেছিলেন ও যা আনানিয়াস ও তাঁর সঙ্গীদের মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা সেই জড় শিশিরের চেয়ে মহত্তর ছিল যা নেবুকাদ্নেজারের আগুনের শিখা নিভিয়ে দিয়েছিল এবং দানিয়েল ইন্দ্রিয়গোচর সিংহের চেয়ে অদৃশ্যমান সিংহের মুখ বন্ধ করেছিলেন যারা তাঁর প্রাণের বিরুদ্ধে কোনও অনিষ্ট ঘটাতে অক্ষম ছিল; সেই সিংহগুলো বিষয়ে আমরা যারা শাস্ত্র পাঠ করেছি, সেই আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। এ থেকে এমনটা কি দাঁড়ায় না যে, যে প্রকাণ্ড মাছ সেই সকলকে গিলে ফেলে যারা ঈশ্বর থেকে পলাতক ও যা আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু দ্বারা পরাভূত হয়েছিল, সেই প্রকাণ্ড মাছের পেট থেকে যে কেউ রেহাই পেয়েছে, সে এমন যোনা হয়ে ওঠে যে পবিত্রজন হিসাবে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে সক্ষম?

১৭। [১] বলতে গেলে, ছায়া ছড়াতে সক্ষম সকল বস্তু যদি নিজ নিজ অনুযায়ী ছায়া না ছড়ায়, কিন্তু অন্য বস্তুগুলো নিজ নিজ অনুযায়ী ছায়া ছড়ায়, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যারা সূর্যঘড়ি সংক্রান্ত বিষয় ও আলোদানকারী বস্তুর সঙ্গে ছায়ার সম্পর্ক অধ্যয়ন করে, তারা বস্তুগুলো সম্পর্কে এটাই স্পষ্ট লক্ষ করে যে, কোন এক সময়ে সূচক-চিহ্নটা

ছায়াবিহীন ও অন্য সময়ে সূচক-চিহ্নটা, বলতে গেলে, সঙ্কুচিত ও অন্য সময়ে সূচক-চিহ্নটা বিস্তৃত। তাই, যেহেতু দাতার অভিপ্রায় হলো গ্রহীতার অনুযায়ী অনির্বচনীয় ও গুপ্ত সমানুপাত অনুসারে প্রধান প্রধান দান মঞ্জুর করা, সেজন্য এটা তত বিস্ময়কর হবে না যে, যখন প্রধান প্রধান দান দেওয়া হয় তখন সেগুলোর কয়েকটা গ্রহীতার জন্য ছায়াবিহীন, কিন্তু অন্য সময়ে ছায়াগুলো অল্প আবার অন্য সময়ে ছায়াগুলো তুলনায় সঙ্কুচিত, আবার অন্য দানগুলো বড় বড় ছায়াযুক্ত। তাই, যেমন সূর্যের রশ্মির অন্বেষী বস্তুগুলোর ছায়ার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির জন্য প্রীতও নয়, দুঃখিতও নয় যেহেতু তার যা দরকার তা তার আছে অর্থাৎ তার নিজের ছায়া বড় হোক বা ছোট হোক তবু আলো তার উপর উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে, তেমনি আমরা যখন আত্মিক বিষয়ের অধিকারী, ঈশ্বর দ্বারা আলোকিত ও যা কিছু সত্যিকারে মঙ্গলকর আমরা সেটারও অধিকারী, তখন ছায়ার মত সামান্যতম ব্যাপারে আমরাও সময় নষ্ট করব না। কেননা সেই জড় ও দেহবিশিষ্ট বস্তু যাই হোক না কেন, সেগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণ ছায়ামাত্র, ও নিখিল বিশ্বের ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মকীর্তি ও পবিত্র দানগুলোর সঙ্গে সেই সবকিছু একেবারে অতুলনীয়। কেননা সমস্ত বচনে ও সমস্ত জ্ঞানে যে ঐশ্বর্য রয়েছে [ক], সেটার সঙ্গে জড় ঐশ্বর্যের কী তুলনা আছে? এবং পাগল বাদে কেই বা মাংস ও হাড়ের সুস্থতার সঙ্গে সুস্থ আত্মা, বলিষ্ঠ প্রাণ ও সুবিন্যস্ত যুক্তির তুলনা করবে? যখন এসব কিছু ঈশ্বরের বাণী দ্বারা সঙ্গতভাবে স্থিরীকৃত, তখন এসব কিছু দৈহিক কষ্টকে অর্থহীন আঁচড় এমনকি আঁচড়ের চেয়েও হীনতম ব্যাপার করে।

[২] ঈশ্বরের বাণী সেই 'বর'[ক] যাকে ভালবাসে, যে কেউ সেই কনের সৌন্দর্যের অর্থ উপলব্ধি করেছে (আর আমি সেই প্রাণেরই কথা বলছি যা স্বর্গ ও মর্তের অতীত সৌন্দর্যে পুষ্পিত), তার পক্ষে কোন বধু বা ছেলে বা স্বামীর দৈহিক সৌন্দর্যকে সৌন্দর্য নামে সম্মানিত করায় লজ্জা করা উচিত। কেননা মাংস [অর্থাৎ 'মানুষ'] প্রকৃতপক্ষে সত্যকার সৌন্দর্যের অধিকারী হতে অক্ষম, এই কারণে যে, 'মাংস'টা ['মানুষ'] সমস্তই বিশ্রী; কেননা 'সমস্ত মাংস ['মানুষ'] ঘাসমাত্র' ও তার সৌন্দর্যও তা-ই। এই কথা স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদের তথাকথিত সৌন্দর্যে লক্ষণীয়, যেইভাবে তা সেই নবীয় উপমাতে একটা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয় যা অনুসারে, *প্রতিটি মাংস* ['মানুষ']

ঘাসের মত, আর তার সমস্ত গৌরব ঘাসের ফুলের মত; শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী (খ)। আরও, ঈশ্বরের সন্তানদের আভিজাত্য যে উপলব্ধি করেছে, সে কেমন করে মানুষদের মধ্যে যা সাধারণত আভিজাত্য বলে অভিহিত তা আভিজাত্য নামে চিহ্নিত করবে? আর যখন মন *খ্রিষ্টের অকম্পমান রাজ্যকে* (গ) দর্শন করেছে, তখন সেই মন পার্থিব কোনও রাজ্যকে রাজ্য নামের যোগ্য গণ্য করবে না। এবং মানব-মন যতক্ষণ দেহের সঙ্গে মিলিত ততক্ষণ ধরে যতখানি সক্ষম, সেই অনুসারে যে কেউ নিজের সাধ্যমত 'বিশাল দূতবাহিনীকে' ও তাঁদের মধ্যে 'প্রভুর পরাক্রমবৃন্দের প্রধান সেনাপতি' সেই মহাদূতদের, ও যত 'সিংহাসন', যত 'প্রভুত্ব, আধিপত্য ও স্বর্গীয় কর্তৃত্বকে'(ঘ) স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে, ও পিতা দ্বারা তাঁদের সঙ্গে সমতুল্য অধিকার পাবার ক্ষমতা উপলব্ধি করেছে, সে ছায়ার চেয়েও ক্ষীণ হয়েও কেমন করে তুলনা ক'রে সেই সবকিছু অবজ্ঞা করবে না যা বিষয়ে নির্বোধ মানুষেরা বিস্মিত হয়, ও কেমন করে সে সেই সবকিছু হীনতম ও অর্থশূন্য বলে গণ্য করবে না? আর সেইসব কিছু তাকে দেওয়া হলেও সে সেগুলোকে অবজ্ঞা করবে যাতে প্রকৃত আধিপত্য ও ঐশ্বরিক মহত্তর কর্তৃত্বসমূহ থেকে বঞ্চিত না হয়। অতএব, আমাদের এমন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা উচিত যা সত্যিই মহৎ ও স্বর্গীয়। এবং যে ছায়াগুলো তেমন প্রধান দানের সঙ্গে যুক্ত, সেই ছায়া-ব্যাপারটা ঈশ্বরের কাছে ফেলে রাখা উচিত, কেননা আমাদের নশ্বর দেহের জন্য যে কী প্রয়োজন, আমরা তা *যাচনা করার আগেও তিনি তা জানেন* (ঙ)।

প্রভুর প্রার্থনা - বিস্তারিত ব্যাখ্যা

১৮। [১] তাঁর খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে (আর আমি আশা রাখি: পবিত্র আত্মায়ও) *ঈশ্বর দ্বারা দেওয়া অনুগ্রহ অনুসারে* (ক) ও যতখানি আমি সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি, আমি যা কিছু বলে এসেছি তাতে প্রার্থনা প্রসঙ্গে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছি। তেমনটা সত্য কিনা তোমরা নিজেরা পুস্তিকাটা পড়তে পড়তে তা বিচার করবে। তাই আমি পরবর্তী বিষয়ে পদার্পণ করতে যাচ্ছি; আমার লক্ষ্য হলো প্রভু দ্বারা উপস্থাপিত

প্রার্থনাকে আদর্শ প্রার্থনা বলে অধ্যয়ন করা ও যে পরাক্রমে সেই প্রার্থনা পরিপূর্ণ তাও দর্শন করা।

প্রভুর প্রার্থনা (পাঠ্য)

[২] প্রথমত এমনটা লক্ষ করতে হবে যে, অনেকে মনে করে মথি ও লুক একই প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যে প্রার্থনা এমন নকশা যা দেখায় আমাদের কেমন প্রার্থনা করা উচিত। মথির পাঠ্য এরূপ, *হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও; এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি; আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না, কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর* (ক)। লুকের পাঠ্য এরূপ, *পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক। সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি প্রতিদিন আমাদের দাও; এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমরা নিজেরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি; আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না* (খ)।

[৩] যারা উপরোল্লিখিত অভিমত মানে, তাদের প্রথমত বলতে হবে যে, কথাগুলো যদিও এক একটার মধ্যে যথেষ্ট মিল রাখে, তবু নানা স্থানে পাঠ্য দু'টোতে যথেষ্ট পার্থক্যও লক্ষণীয় যেইভাবে পাঠ্য দু'টো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময়ে আমি দেখাব। দ্বিতীয়ত, এমনটা সম্ভব নয় যে, একই প্রার্থনা তখনই, সেই পর্বতে, উচ্চারিত হয়েছিল যখন যিশু *লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, এবং মুখ খুলে তাঁদের উপদেশ দিতে লাগলেন* (ক), কারণ প্রার্থনাটা সেই পাঠ্যাংশের মধ্যে রয়েছে যা সুখ-বাণী সংক্রান্ত ও সুখ-বাণীর পরবর্তী সেই আদেশগুলোও সংক্রান্ত যা মথিতে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং [পর্বতে ছাড়া] প্রার্থনাটা '*এক জায়গায়*' তখনই উচ্চারিত হয়েছিল যখন তিনি '*প্রার্থনা করছিলেন …আর যখন শেষ করলেন*', তখন '*তাঁর শিষ্যদের একজন*' তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখান *যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন* (খ)। বাস্তবিকই আমরা কেমন করে এমনটা মেনে

নিতে পারি যে, একই কথাগুলো পূর্ববর্তী কোনও অনুরোধ ছাড়া দীর্ঘতর একটা উপদেশের মধ্যে এবং সেইসাথে একজন শিষ্যের অনুরোধে প্রকাশ্যে উচ্চারিত হল? হয় তো কেউ না কেউ উত্তরে বলবে যে, প্রার্থনা দু'টো এমন সমান কিছুর অধিকারী যা এমন একক প্রার্থনা যা একবার দীর্ঘ উপদেশের মধ্যে ও আরেক বার এমন একজন শিষ্যের অনুরোধে উচ্চারিত হয়েছিল যে শিষ্য মথিতে প্রভুর উচ্চারিত প্রার্থনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন না অথবা যা বলা হচ্ছিল তিনি তা মনে রাখেননি। যাই হোক, [এই অভিমতের চেয়ে] প্রার্থনা দু'টো যে ভিন্ন তা-ই ধরে নেওয়া ভাল, যদিও প্রার্থনা দু'টোর মধ্যে সদৃশ কয়েকটা অংশ রয়েছে। আমি মার্কেও অনুসন্ধান করেছি, পাছে একই ধরনের অর্থবাহী এমন প্রার্থনা লিপিবদ্ধ রয়েছে যা আমি খেয়াল করিনি; কিন্তু সেই সুসমাচারে আমি তেমন প্রার্থনার কোনও লক্ষণ পাইনি।

মথির সুসমাচারে প্রভুর প্রার্থনা - সূচনা

১৯। [১] তবে, যেইভাবে উপরে বলেছিলাম (ক), যে প্রার্থনা করে যেহেতু তার পক্ষে প্রথমত উপযুক্ত ও উচিত মত মনোভাব দরকার আছে, সেজন্য এসো, মথিতে দেওয়া প্রার্থনার অব্যবহিত পূর্বেকার বিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা এক্ষেত্রে যা বলেন, তা লক্ষ করি। তাঁর বাণী এ, *আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মত হয়ো না; কারণ তারা সমাজগৃহে ও চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে পছন্দ করে, যেন লোকে তাদের চেহারা দেখতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর; তবে যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন। এবং প্রার্থনাকালে তোমরা বেশি কথা ব্যবহার করো না, যেমনটি বিজাতিরা করে থাকে, কেননা তারা মনে করে, বহু কথার জোরেই তাদের কথা শোনা হবে। তাই তোমরা তাদের মত হয়ো না, কেননা তোমাদের কী কী প্রয়োজন, যাচনা করার আগে তোমাদের পিতা তা জানেন। সুতরাং তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত …* (খ)।

[২] আমাদের ত্রাণকর্তা প্রায়ই নিজেকে দেখান এমন একজনের মত যিনি সেই অসার গৌরবের কামনার বিরুদ্ধে দাঁড়ান যা ধ্বংসের দিকে চালনা করে। তিনি এখানে

ঠিক তাই করেন যখন প্রার্থনা উপলক্ষে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেন। কেননা [ঈশ্বরের সঙ্গে] সহভাগিতার অন্বেষণ করার চেয়ে নিজের ভক্তি বা দানশীলতার জন্য মানুষের প্রশংসা বাসনা করা-ই ভণ্ডামি। আমাদের এই উক্তি স্মরণ করা উচিত, *তোমরা কেমন করেই বা বিশ্বাস করতে পার, যখন পরস্পরের গৌরব গ্রাহ্য ক'রে অনন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে যে গৌরব আসে, তার অন্বেষণ কর না?* (ক)।

আমাদের মানবীয় সমস্ত গৌরব অবজ্ঞা করা উচিত যদিও তেমন গৌরব সঙ্গতভাবে অর্জিত বলে গণ্য, এবং সেই প্রকৃত ও সত্যকার গৌরবের অন্বেষণ করা উচিত যা তাঁর কাছ থেকে আগত যিনি একাই গৌরবের যোগ্য মানুষকে গৌরব আরোপ করেন, যিনি নিজের উচিত মতেই ও যেকোন গ্রহীতার উপযোহিতার অতীতেই তেমন গৌরব প্রদান করেন। একটা কর্ম সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য বলে গণ্য হলেও তখনই দূষিত হয় যখন এমন লক্ষ্যে সম্পাদিত হয় যাতে আমরা *মানবীয় গৌরব* পেতে পারি বা যাতে *লোকে আমাদের দেখতে পায়* (খ), এবং এর ফলে ঈশ্বর থেকে কোন মজুরি আসবে না।

কেননা যিশুর প্রতিটি কথা সত্যময়, আর আমাদের উপর চাপ পড়লেও আমরা এটা মেনে নেব যে, তাঁর সেই কথা তখনই আরও বেশি সত্যময় হয় যখন তাঁর শপথের রীতিমত ব্যবহৃত উক্তিতে ব্যক্ত। আর যাদের বিষয়ে মনে হচ্ছে, তারা মানবীয় গৌরবের খাতিরেই প্রতিবেশীর জন্য শুভকর্ম সম্পাদন করছে, অথবা যারা *সমাজগৃহে ও চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে' প্রার্থনা করে যাতে লোকে তাদের চেহারা দেখে', তাদের কিষয়ে তিনি বলেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে* (গ)। কেননা যেমন লুকের সুসমাচারে *সেই ধনী লোক* নিজের মরজীবনে *ভাল ভাল জিনিস* পেয়েছিল বিধায় সেই ভাল ভাল জিনিস এ বর্তমান জীবনের পরে পেতে অক্ষম হয়েছিল, তেমনি *যে কেউ আত্মার খাতিরে নয় মাংসের খাতিরে বীজ বুনেছে বিধায় নিজের মজুরি পায়, সে ক্ষয়ের ফসল পাবে* ও নিজের অর্থাদনেও বা নিজের প্রার্থনায়ও *অনন্ত জীবনের ফসল পাবে না* (ঘ)। যখন একজন লোক 'সমাজগৃহে বা রাস্তায় রাস্তায়' লোকদের দ্বারা গৌরবান্বিত হবার লক্ষ্যে 'নিজের সামনে তুরি বাজিয়ে' অর্থদান করে, সে 'মাংসের খাতিরে বীজ বোনে'; দর্শকদের দ্বারা ভক্তপ্রাণ ও সাধু বলে গণ্য হওয়ার লক্ষ্যে

‘সমাজগৃহে বা চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে’ দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা-ও ‘মাংসের খাতিরে বীজ’ বোনার নামান্তর।

[৩] এমনকি, যে কেউ সেই চওড়া ও প্রশস্ত পথ ধরে চলে যা সর্বনাশে নিয়ে যায়, যা সোজা ও সরল নয় বরং সেটার সরলতা একদম অবরুদ্ধ হওয়ায় পথটা একেবারে আঁকাবাঁকা ও মোড়ে মোড়ে পূর্ণ, যারা চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রার্থনা করে, তাদের মত সেও সেই একই পথে দাঁড়ায়, আর শুধু তা নয়, লালসার ভালবাসার খাতিরে সে কেবল এক রাস্তায় নয়, নানা রাস্তায়ই দাঁড়ায়। সেই রাস্তাগুলোতে তারাই রয়েছে যারা *মানুষেরে মতই মরছে* (ক) কারণ নিজ নিজ ঐশ্বরিক অবস্থা থেকে সরে পড়ার ফলে তাদেরই গৌরবান্বিত করছে ও সুখী বলছে যারা তাদের মত রাস্তায় রাস্তায় অভক্তি চর্চা করে। এমন ধরনের লোক সবসময়ই রয়েছে যারা প্রার্থনাকালে ঈশ্বরপ্রিয় নয় বরং *বিলাসপ্রিয়* (খ) ও নিজ নিজ খানাপিনার মধ্যে ও নিজ নিজ পানপাত্রে নিজ নিজ প্রার্থনায় মাতাল। হ্যাঁ, এরা সত্যিকারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে। কেননা যে কেউ বিলাসিতা-জীবন যাপন করে সে সেই চওড়া রাস্তা ভালবাসে ও যিশুখ্রিষ্টের সেই সরু ও সঙ্কীর্ণ রাস্তা থেকে সরে পড়েছে যার কোনও মোড়ও নেই, কোনও বাঁকও নেই।

২০। [১] এবং মণ্ডলী ও সমাজগৃহের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে, আর আমি ‘মণ্ডলী’ শব্দটা সেই প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করছি যা অনুসারে মণ্ডলীর ‘*কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা*’ বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং এমন মণ্ডলী যা ‘*পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক*’(ক), যে মণ্ডলীতে এমন কারও প্রবেশাধিকার নেই যে জারজ, নপুংসক বা যার অণ্ডকোষ চূর্ণ হয়েছে (খ), জাতিতে যে মিশরীয় বা এদোমীয়, (যদিও তাদের তৃতীয় পুরুষের পরের বংশধরদের পক্ষে প্রবেশাধিকার কঠিন (গ)), মোয়াবীয় বা আম্মোনীয়ও নয়, তাদেরই কথা বাদে যারা *দশম পুরুষেরই পরের বংশধর* যখন সেই জাতীয়তা শেষ হয়েছে বলে গণ্য (ঘ) ; এবং সমাজগৃহ বলতে আমি সেটাই বোঝাই যেটা যিশুর আগমনের আগে সেই ‘শতপতি’ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল যখন তিনি নিজে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, সেই শতপতি এমন বিশ্বাসেরই অধিকারী যা তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে কোথাও দেখতে পাননি (ঙ)। তাই যে কেউ সমাজগৃহে প্রার্থনা পছন্দ করে, সে চৌরাস্তার মোড় থেকে তত দূরে নয়। কিন্তু যে পবিত্র, সে এধরনের মানুষ নয়, কেননা সে প্রার্থনা পছন্দ করে না

বরং প্রার্থনা ভালইবাসে ও সমাজগৃহে নয় বরং মণ্ডলীতেই, রাস্তার মোড়ে মোড়ে নয় বরং '*সরু ও সঙ্কীর্ণ পথের*' সরলাতায়ই (চ) প্রার্থনা করে, ও লোকে যেন তাদের চেহারা দেখতে পায় (ছ) সেই লক্ষ্যে নয় বরং ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতেই হাজির হবার লক্ষ্যে প্রার্থনা করে। কেননা তেমন ব্যক্তি হলো সেই পুরুষ যে *প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ* (জ) উপলব্ধি করে ও সেই আদেশ মেনে চলে যা অনুসারে *তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছরে তিনবার করে তোমার ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে হাজির হবে* (ঝ)।

[২] 'চেহারা দেখানো' বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্ম মনোযোগ দেওয়া উচিত, কেননা যা কিছু চেহারা মাত্র তা ভাল নয়, কেননা এমনিই এমনটা মনে হয় সেই চেহারার অস্তিত্ব আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন অস্তিত্ব নেই, তাতে চেহারাটা ইন্দ্রিয়-উপলব্ধিকে প্রতারিত করে ও প্রকৃত ও সূক্ষ্ম দৃশ্য উপস্থাপন করে না। কেননা, যেমন মঞ্চে নাটক অভিনয় করে যে অভিনেতারা নিজেদের সম্পর্কে যা বলে বা নাটকের চরিত্র অনুযায়ী যে চেহারা দেখায় তারা তা প্রকৃতপক্ষে নয়, তেমনি যারা চেহারায় সাধুতার ভাব দেখাবার ভান করে, তারা ধার্মিক নয় বরং সাধুতা অভিনয় করে ও নিজ নিজ মঞ্চে তথা *সমাজগৃহে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে* (ক) অভিনয় করে। কিন্তু যে কেউ অভিনেতা নয় বরং যা কিছু তার নিজস্ব নয় সেই সবকিছু বর্জন করে, ও উপরোল্লিখিত মঞ্চগুলোর চেয়ে অধিক মহত্তর মঞ্চে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, যেখানে তার ধন তথা তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ধন সঞ্চিত, সে নিজের সেই কক্ষে প্রবেশ করে ও দরজা বন্ধ করে (খ)। এবং বাইরের দিকে কখনও না ঝুঁকে বা বাইরের কোন কিছুর দিকেও হাঁ করে না তাকিয়ে সে ইন্দ্রিয়গুলোর সমস্ত দরজা বন্ধ করে যাতে সে ইন্দ্রিয়জগৎ দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় ও সেই ইন্দ্রিয়-অনুভূতিসমূহ তার অন্তরে অনুপ্রবেশ না করে, এবং সেইভাবে সেই পিতার কাছে প্রার্থনা করে যিনি তেমন গোপন স্থান ছেড়ে চলে না গিয়ে ও তেমন স্থান ফেলে না রেখে বরং তাঁর একমাত্র জনিতজন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকতেই নিজেই সেইখানে *বসবাস করেন* (গ)। কেননা '*সেই একমাত্র জনিতজন*' বলেন, *আমি ও পিতা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (ঘ)। তাই এমনটা স্পষ্ট হয়েছে যে আমরা এইভাবে প্রার্থনা করলে তবে ন্যায়বান যিনি, সেই ঈশ্বরকে শুধু নয়, বরং সেই পিতাকেও অনুরোধ করব যিনি আপন সন্তানদের একা

ফেলে রাখেন না, যিনি আমাদের ‘গোপন স্থানে’ উপস্থিত, যিনি সেটার উপর নজর রাখেন ও ‘আমরা দরজা বন্ধ’ করলে যিনি সেই ‘কক্ষে’ মহত্তর মঙ্গলদান আনেন।

২১। [১] আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন যেন *বেশি কথা ব্যবহার না করি* (ক), বরং ঐশ্বরিক বিষয়ে কথা বলি। আমরা তখনই ‘বেশি কথা ব্যবহার করি’ যখন নিজেদের বা প্রার্থনায় যে কথা নিবেদন করছি সেই কথাও কঠোরভাবে যাচাই না করে আমরা ক্ষয়শীল কর্ম বা কথা বা চিন্তার বিষয়ে এমন কথা বলি যা হীন ও নিন্দাজনক এবং প্রভুর অক্ষয়শীলতা ক্ষেত্রে বিদেশীই যেন। যে কেউ প্রার্থনাকালে ‘বেশি কথা ব্যবহার করে’, সমাজগৃহে যাদের বিষয়ে কথা বলেছিলাম তাদের চেয়েও সে খারাপ অবস্থায় রয়েছে, এবং যারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকে, তাদের চেয়েও সে আরও বিপজ্জনক পথে চলছে, কারণ যা মঙ্গলকর, সেটার বাহ্যিক একটা চিহ্নও আর থাকে না। কেননা সুসমাচারের উক্তি অনুসারে, কেবল ‘বিজাতীরাই বেশি কথা ব্যবহার করে’ ও নিজেদের যাচনায় তাদের মহৎ ও স্বর্গীয় বিষয়ে কোন চেতনা নেই, কিন্তু যেকোন প্রার্থনা ওরা নিবেদন করে, তা কেবল দৈহিক ও বাহ্যিক ব্যাপার সংক্রান্ত। তাই, স্বর্গস্থ যিনি, যিনি স্বর্গের ঊর্ধ্বেও বসবাস করেন, যে কেউ তাঁর কাছে নিম্নতর বিষয় যাচনা করে সে সেই বিজাতীদের মত যারা ‘বেশি কথা ব্যবহার করে’।

[২] তাই মনে হচ্ছে, যে কেউ বাচাল সে-ই ‘বেশি কথা ব্যবহার করে’, ও যে কেউ ‘বেশি কথা ব্যবহার করে’ সে বাচাল। কেননা যা কিছু জড় ও দৈহিক, তাতে কোন একত্ব নেই, কারণ যা একত্ব বলে ধরে নেওয়া হয়, তা নিজের একত্ব হারিয়েছে বিধায় বহু বহু কিছুতে বিভক্ত, দীর্ণ-বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন। কেননা যা ভাল, তা একক, কিন্তু যা জঘন্য তা বহুবিধ; সত্য এক, কিন্তু মিথ্যা বহুবিধ, প্রকৃত ধর্মময়তা এক, কিন্তু তা নকল করার মত বহু উপায় রয়েছে। ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও এক, কিন্তু *এই যুগের প্রজ্ঞা ও এই যুগের শাসনকর্তারা যদিও নস্যাৎ হয়ে পড়ছে* (ক), তবু সেগুলো বহু। ঈশ্বরের কথা এক, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যে কথা বিদেশীই যেন, সেগুলো বহু। সেজন্য *অধিক কথনে কেউই পাপ এড়াতে পারবে না* (খ), ও যারা মনে করে, তারা অধিক কথনের ফলে সাড়া পাবে, তারা কেউই সাড়া পবে না। সেই অনুসারে, আমাদের প্রার্থনা সেই ‘বেশি কথার’ সঙ্গে বা বিজাতীয়দের সেই অধিক কথনের সঙ্গে, বা *সাপের মত ওরা যাই করুক* (গ) সেই

সবকিছুর সঙ্গেও তুলনাযোগ্য না হোক, কারণ পিতা হওয়ায় পবিত্রজনদের ঈশ্বর নিজের *সন্তানদের প্রয়োজন জানেন* (ঘ) যেহেতু সেই সমস্ত বিষয় তাঁর পিতৃজ্ঞানের যোগ্য। যে কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ, সে ঈশ্বরের বিষয়াদির বিষয়েও অজ্ঞ, ও তার যা প্রয়োজন সেবিষয়েও অজ্ঞ, কেননা সে যা প্রয়োজন বলে মনে করে, সেইসব ভুল। কিন্তু যে কেউ সেই শ্রেয়তর ও মহত্তর ঐশ্বরিক বিষয়গুলোর দর্শন পেয়ে থাকে যা তার প্রয়োজনীয় ও যা ঈশ্বরের কাছে জ্ঞাত, সে নিজের দর্শনের ফলগুলো পাবে ও তাও পাবে যা বিষয়ে যাচনার করার আগে পিতার কাছে জ্ঞাত। তাই মথি অনুযায়ী প্রার্থনাটার আগে তিনি যা বলেছিলেন, সেবিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার করার পর, এখন এসো, প্রার্থনা দ্বারা যা প্রকাশিত, সেবিষয় দর্শন করি।

‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’

২২। [১] *‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’*(ক)। যা পুরাতন নিয়ম বলে অভিহিত, সেটার মধ্যে ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করে এমন কারও প্রার্থনা পাওয়া যায় কিনা এমন সূক্ষ্ম অনুসন্ধান অধিক উপযোগী। বাস্তবিকই, আমার সাধ্যমত তেমন অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও আমি একটাও পাইনি। এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করা হয় না; আবার এর অর্থ এই নয় যে, যারা বিশ্বাসী বলে গণ্য ছিল তারা কখনও ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হয়নি; বরং আমার কথার অর্থ হলো এই যে, ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করায় ত্রাণকর্তার যে সাহসিকতা প্রকাশিত, তা আমি কোন প্রার্থনায় পাইনি। ঈশ্বর বিষয়ে যে এমনটা বলা হয় তিনি পিতা, ও যারা ঈশ্বরের বাণীর নিকটবর্তী হয়েছে তারা যে সন্তান বলে অভিহিত, তা প্রায়ই লক্ষণীয়, যেমন দ্বিতীয় বিবরণে লেখা আছে, *তোমাকে জন্ম দিয়েছেন যিনি, সেই ঈশ্বরকে তুমি পরিত্যাগ করেছ, তোমাকে পুষ্ট করেছেন যিনি, সেই ঈশ্বরকে তুমি ভুলে গেছ* (খ); আরও, *ইনিই কি তোমার সেই পিতা নন, যিনি তোমাকে নিজস্ব অধিকার করলেন, যিনি তোমাকে গড়লেন, ও তোমাকে সৃষ্টি করলেন?* (গ); আরও, *ওরা এমন সন্তান যাদের অন্তরে কোন বিশ্বাস নেই* (ঘ); এবং ইশাইয়াতে, *আমি সন্তানদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি, কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে* (ঙ); এবং মালাখিতে, *ছেলে নিজ পিতাকে ও দাস নিজ*

প্রভুকে গৌরব আরোপ করবে; আচ্ছা, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়? (চ)।

[২] তবে যদিও ঈশ্বর পিতা বলে অভিহিত ও ঈশ্বরে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বাণী দ্বারা জনিত যারা, তারা সন্তান বলে অভিহিত, তবু সেকালের জনগণের মধ্যে নিশ্চিত ও অপরিবর্তনশীল পুত্রত্ব দেখা যায় না। এমনকি, যে বচনগুলো আমি উপরে উল্লেখ করেছি, যারা সন্তান বলে অভিহিত সেই বচনগুলো তাদের অধীনতা তুলে ধরে, কেননা প্রেরিতদূত অনুসারে, *উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর মালিক হলেও তবু দাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে অভিভাবক ও গৃহাধ্যক্ষদের অধীন থাকে* (ক)। এবং *সেই সময়ের পূর্ণতা* (খ) আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের আগমনে উপস্থিত যখন যারা দত্তকপুত্রত্বকে বাসনা করে তারা তা পায়, যেইভাবে পল এবাণী বলে শেখান, *বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি* (গ)। এবং যোহনের সুসমাচারে, *যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন* (ঘ); এবং যোহনের বিশ্বজনীন পত্রে আমরা, 'ঈশ্বর থেকে জনিত' যারা, তাদের বিষয়ে এ শিখি যে, *যে কেউ ঈশ্বর থেকে জনিত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে; পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জনিত* (ঙ)।

[৩] আর লুকে যা লেখা আছে তথা, *তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল: পিতা* (ক), আমরা যদি সেটার অর্থ উপলব্ধি করি, তবে যদি আমরা তাঁর প্রকৃত সন্তান না হয়ে থাকি, তাহলে তাঁর প্রতি তেমন সম্বোধন করায় আমাদের দ্বিধাবোধ করা উচিত পাছে আমাদের অন্যান্য পাপ বাদে আমরা অভক্তি দায়েও দোষী বলে প্রতিপন্ন হই। আমি যা বলতে চাই তা এ: করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে পল বলেন, *ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে বলতে যেমন কেউ বলে না "যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু", তেমনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না "যিশু প্রভু"*(খ)। তিনি এই বচনে পবিত্র আত্মাকে ও ঈশ্বরের আত্মাকে একই ব্যক্তিত্ব বলে উপস্থাপন করেন। "পবিত্র আত্মার প্রেরণায় 'যিশু প্রভু' বলা" এর অর্থটা যে কি তা আদৌ স্পষ্ট নয়, কেননা তেমন

কথা সহস্র ভণ্ড লোকদের দ্বারা ও আরও বেশি ভ্রান্তমতপন্থী দ্বারা (গ) ব্যবহৃত হয়, ও মাঝে মাঝে সেই অপদূতদের দ্বারাও ব্যবহৃত হয় যারা এই নামে নিহিত পরাক্রম দ্বারা পরাভূত। এমন কেউই নেই যে এমনটা বলতে দুঃসাহস করবে যে, এরা "পবিত্র আত্মার প্রেরণায় 'যিশু প্রভু'" বলে। এবং ওরা যে প্রকৃতপক্ষে বলে "যিশু প্রভু", তাও প্রমাণ করা যায় না, কেননা তারাই মাত্র অন্তর থেকে "যিশু প্রভু" বলে, যারা ঈশ্বরের বাণীর সেবা করে, ও যা কিছু করে সেইসব কিছুতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, যিশুকে ছাড়া তাদের জন্য 'প্রভু' বলতে অন্য কেউ নেই। কিন্তু যখন তেমন লোকেরাই "যিশু প্রভু" বলে, তখন এমনটা হতে পারে যে, যারা পাপ করে তারা অপরাধ করায় ঐশবাণীকে অভিশাপ দেয় ও নিজেদের অপকর্ম দ্বারা চিৎকার করে বলে, "যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু"। তাই, যেমন এক ধরনের মানুষ বলে 'যিশু প্রভু' ও বিপরীত মনোভাবের মানুষ বলে "যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু", তেমনি এমনটা হয় যে, *যে কেউ ঈশ্বর থেকে জনিত* বলে *পাপ করে না* (ঘ), সে ঈশ্বরের সেই বীজের অংশী হওয়ায় যা যেকোন পাপ থেকে তাকে দূরে রাখে, নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে বলে, 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'। এবং *[ঐশ] আত্মা নিজেও তাদের মানবাত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দেন যে, তারা ঈশ্বরের সন্তান, উত্তরাধিকারী ও খ্রিষ্টের সহ-উত্তরাধিকারী, কেননা তারা তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হয়েছে বিধায় তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হবারও* সুখময় প্রত্যাশা রাখে (ঙ)। আর যাতে তারা অর্ধেক মনোভাবেই মাত্র 'হে আমাদের পিতা' না বলে, সেই লক্ষ্যে তারা, যা তাদের শুভকর্মের উৎস ও আদিকারণ ও '*ধর্মময়তা লাভের জন্য বিশ্বাস করে*', নিজেদের সেই হৃদয়কেও তারা শুভকর্মে মিলিত করে ও সেইসাথে একসুরে তাদের মুখও '*পরিত্রাণ লাভের জন্য স্বীকার করে*'(চ)।

[৪] অতএব, তাদের সমস্ত কর্ম, কথা ও চিন্তা *সেই একমাত্র জনিত* বাণী দ্বারা তাঁর নিজেরই সমরূপ অনুসারে গঠিত হওয়ায় *অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করে* ও *সেই সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে* (ক) হয়ে ওঠে যিনি *মন্দ ও ভাল লোকদের উপরে সূর্য জাগান এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের উপরে বৃষ্টি নামিয়ে আনেন* (খ) যাতে করে নিজেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যিনি, সেই *স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তি* তাদের মধ্যে বিরাজ করে। সুতরাং, পবিত্রজনেরা হলো একটা *প্রতিমূর্তির* প্রতিমূর্তি (গ) তথা *পুত্রের প্রতিমূর্তি* (ঘ)।

তারা পুত্রত্বে চিহ্নিত, ও *খ্রিষ্টের আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ* হয়ে ওঠে (ঙ) শুধু নয়, কিন্তু সেই দেহে বিরাজমান যিনি তাঁরও সমরূপ হয়ে ওঠে। তারা তাঁরই সমরূপ হয়ে ওঠে যিনি গৌরবময় দেহে বিরাজমান, ও *তাদের মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেরা রূপান্তরিত হয়* (চ)। আর যখন এরাই হলো তারা যারা সবকিছুতে 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলে, তখন এটাও স্পষ্ট যে, নিজের বিশ্বজনীন পত্রে যোহন যেমনটা বলেন, পাপ করে যারা, তারা *দিয়াবল থেকে উদ্গত, কারণ আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে* (ছ)। আর *ঈশ্বর থেকে যে জনিত*, যেমন ঈশ্বরের বীজ তার মধ্যে থাকায়, যে কেউ একমাত্র জনিত বাণীর সমরূপ, সে নিজের মধ্যে পাপ করার অক্ষমতা রাখে, তেমনি যে কেউ পাপ করে তার মধ্যে দিয়াবলের বীজ বিরাজ করে; ও যত সময় সেই বীজ সেই লোকের আত্মার উপর প্রভুত্ব চালায়, তত সময় ধরে বীজটা বীজের অধিকারীকে শুভকর্ম সম্পাদনে বাধা দেয়। কিন্তু, যেহেতু *দিয়াবলের কর্ম বিনাশ করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন* (জ), সেজন্য এমনটা সম্ভব হয় যে, মানবাত্মায় ঈশ্বরের বাণীর আগমন দিয়াবলের কর্মকাণ্ড উল্টিয়ে দেয় ও আমাদের মধ্যে বিরাজমান দিয়াবলের সেই বীজ উপড়িয়ে ফেলে যাতে করে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি।

[৫] সুতরাং, আমাদের এমনটা মনে করা উচিত নয় যে 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' উক্তিটা প্রার্থনার জন্য স্থির করা সময়েই বলতে শেখানো হয়েছে। বরং, 'অবিরত প্রার্থনা' সম্পর্কে যা উপরে বলা হয়েছিল (ক) তা যদি বুঝে থাকি, তাহলে আমাদের গোটা জীবন অবিরত বলে উঠুক 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'। কেননা আমাদের '*নগরিকত্ব*' আদৌ পৃথিবীতে নয় কিন্তু সবদিক দিয়ে সেই '*স্বর্গ*' রয়েছে (খ) যা ঈশ্বরের '*সিংহাসন*'(গ), যেহেতু ঈশ্বরের রাজ্য সেই সকলের মধ্যে স্থাপিত যারা *সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করে* (ঘ) ও তেমনটা করায় নিজেরাই স্বর্গীয়জন হয়ে উঠেছে।

২৩। [১] যখন পবিত্রজনদের পিতা সম্পর্কে বলা হয়, তিনি 'স্বর্গস্থ', তখন এমনটা ধরে নিতে নেই যে তিনি শারীরীক গঠন দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ হওয়ায় "স্বর্গে" বসবাস করেন, কেননা যদি স্বর্গ তাঁকে ধারণ করে তাহলে এমনটা দাঁড়ায় যে, ঈশ্বর স্বর্গের চেয়ে ছোট; না, অপরপক্ষে তাঁর ঈশ্বরত্বের পরাক্রম আমাদের এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, সমস্ত বস্তু তাঁরই দ্বারা ধারণকৃত ও একতাবদ্ধতায় ধরে রাখা। যে বচনগুলো সরলমনাদের দ্বারা

সাধারণত অক্ষরে অক্ষরে ধরে নেওয়া হয় যার ফলে তারা মনে করে ঈশ্বর এক স্থানে বিরাজমান, সেই বচনগুলো ঈশ্বরের মহৎ ও আধ্যাত্মিক ধারণা অনুসারেই আরও উপযোগী ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যোহনের সুসমাচারের বচনগুলো প্রযোজ্য, যেমন, *পাস্কাপর্বের আগে, এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে জেনে, যিশু, তাঁর যে আপনজনেরা এই জগতে ছিলেন, তাঁদের অবিরতই ভালবেসে শেষ পর্যন্তই তাঁদের ভালবেসে গেলেন* (ক), এবং কয়েক পদ পরে, *একথা জেনে যে, পিতা তাঁরই হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন, এবং তিনি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন এও জেনে …* (খ), এবং বেশ কয়েক পদ পরে, *'তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত, কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান'* (গ)। আরও বেশ কয়েক পদ পরে, *'এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, অথচ তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'* (ঘ) কেননা এ বচনগুলো যদি 'স্থান' ধারণা অনুসারে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ধারণাটা এই বচনেরও জন্য প্রযোজ্য হবে তথা, *যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (ঙ)।

[২] যিশুর বাণীকে যে ভালবাসে, তারই স্থানের দিকে পিতা ও পুত্রের পক্ষে স্থানান্তর ধারণা অনুযায়ী কথা বলে যে ধরে নিতে নেই এটাই সুনিশ্চিত। একই প্রকারে অন্যান্য বচনগুলোও স্থান ধারণা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে নেই, বরং ব্যাখ্যা এরূপ হওয়া উচিত: ঈশ্বরের বাণী নিজের স্বীয় মর্যাদার দিক দিয়েই আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য নেমে আসেন। এবং মানুষদের মাঝে থাকায় যখন তিনি অবনমিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বিষয়ে বলা হয় যে, তিনি জগৎ থেকে পিতার কাছে চলে যান যাতে, *নিজেকে রিক্ত ক'রে* (ক) সেই রিক্ততা থেকে তাঁর আপন পরিপূর্ণতায় ফিরে যাওয়ার পর আমরা তাঁকে সেখানে [পিতার কাছে] সিদ্ধতামণ্ডিত অবস্থায় দর্শন করতে পারি। তাই আমাদের পথদিশারী হিসাবে তাঁর সঙ্গে থেকে আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করব ও সমস্ত রিক্ততা থেকে

নিস্তার পাব। সুতরাং ঈশ্বরের বাণী জগৎকে পিছনে রেখে ও পিতার দিকে চলে তাঁরই কাছে গমন করুন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। আমাদের দিক দিয়ে, যোহনের সুসমাচারের শেষে যে বচন, সেটা-ও আরও আধ্যাত্মিক অর্থে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, *আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি* (খ); অর্থাৎ পিতার কাছে পুত্রের আরোহণ বিষয়টা পবিত্রতর উপলব্ধি অনুসারে বোঝা উচিত; হ্যাঁ, সেটাকে দেহের তত নয়, বরং মনেরই আরোহণ বলে উপলব্ধি করা উচিত।

[৩] 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' এর সঙ্গে এসমস্ত বিষয়ে সংযুক্ত করা আমার মতে প্রয়োজনই ছিল যাতে ঈশ্বর সংক্রান্ত সেই হীন অভিমত সরিয়ে দেওয়া হয় যা তাদেরই দ্বারা ধরে নেওয়া যারা মনে করে, তিনি স্বর্গে এক স্থানেই যেন আছেন, ও যাতে কেউই না মনে করে যে, ঈশ্বর দৈহিক এক স্থানে আছেন। কেননা এ অভিমত থেকে এমনটা দাঁড়ায় যে, ঈশ্বরও দৈহিক, ও অভক্তিময় এধারণা থেকে এমনটা দাঁড়ায় যে, তিনি বিভাজ্য, বস্তুগত ও ক্ষয়শীল যেহেতু প্রতিটি দেহ বিভাজ্য, বস্তুগত ও ক্ষয়শীল। অন্যথা, বিবেচনাহীন অনুমানের ভিত্তিতে নয় বরং প্রমাণযোগ্য এমন স্পষ্ট বিবেচনার মধ্যে দিয়ে তারাই আমাদের বলুক কেমন করে দেহটার পক্ষে জড় পদার্থ ছাড়া অন্য ধরনের হওয়া সম্ভব হতে পারে।

তথাপি, যেহেতু খ্রিষ্টের দৈহিক আগমনের আগেও বহু বহু বচন রয়েছে যা অনুসারে মনে করা যেতে পারে, সেই বচনগুলো এমনটা সমর্থন করে যে ঈশ্বর দৈহিক স্থানে রয়েছেন, সেজন্য সেই বচনগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা সম্পর্কে আলোচনা করা আমার মতে অপ্রাসঙ্গিক নয়, যাতে করে তাদের মন থেকে সেই সমস্ত কিছু সরিয়ে দিতে পারি যা সত্য থেকে তাদের দূরে রাখে যারা, সবকিছুর ঊর্ধ্বে যিনি, সেই ঈশ্বরকে তাদের নিজেদের পরিকল্পিত একটা সঙ্কীর্ণ ও সীমিত স্থানে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখে। প্রথমত, আদিপুস্তকে লেখা আছে, *পরে আদম ও হবা প্রভু ঈশ্বরের চলাচলের সাড়া পেল, তিনি দিনের স্নিগ্ধ বাতাসে বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তখন আদম ও তার স্ত্রী হবা প্রভু ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকাল* (ক)। যারা এই বচনের ঐশ্বর্যে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক, যারা এই বচনের *দরজায় ঘা দিতেও* (খ) অসম্মত, তাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখব: *যে ঈশ্বরে স্বর্গ ও মর্ত পরিপূর্ণ* (গ), যিনি

স্বর্গকে নিজের সিংহাসন হিসাবে (আর তারা অবশ্যই দৈহিক অর্থেই উক্তিটা ধরে নিচ্ছে) ও পৃথিবীকে নিজের পাদপীঠ হিসাবে ব্যবহার করেন [ঘ], ওরা কি এমনটা মেনে দিতে পারে যে, সেই প্রভু ঈশ্বর স্বর্গমর্তের তুলানয় এতই সঙ্কীর্ণ এমন স্থানে গণ্ডিবদ্ধ রয়েছেন যে, ওরা যা দৈহিক বাগান বলে ধরে নিচ্ছে, সেই বাগান ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ নয় বরং পরিমাপে তাঁর চেয়ে এতই বড় যে তাঁকেও ধারণ করে যিনি '*বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন*', এমনকি যাঁর '*চলাচলের সাড়া পাওয়া*' যাচ্ছিল? তাছাড়া, আদম ও হবা যে নিজেদের অপরাধের জন্য ঈশ্বরকে ভয় করার ফলে '*প্রভু ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকাল*', এব্যাপারটাও ওদের মতে একেবারে অযৌক্তিক। কেননা তারা যে সেইভাবে নিজেদের লুকাতে ইচ্ছা করছিল, শাস্ত্র এমনটাও আদৌ বলে না, কিন্তু স্পষ্টই বলে যে, তারা বাস্তবেই '*নিজেদের লুকাল*'। অবশেষে, কেমন করে, ওদের মতে, ঈশ্বর আদমকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, '*তুমি কোথায়?*'[ঙ]

[৪] আদিপুস্তক বিষয়ক আমার ব্যাখ্যা-পুস্তকে আমি বিষয়টা আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি; তবুও তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বাতিল না করার চেয়ে এখানে সেটাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া যথেষ্ট হোক যা দ্বিতীয় বিবরণে ঈশ্বর বলেন, '*আমি তাদের মাঝে বসবাস করব ও তাদের মাঝে হেঁটে বেড়াব*'[ক]। কেননা পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর হেঁটে বেড়ানোটা বাগানের মধ্যে তাঁর হেঁটে বেড়ানোটার সামীল, কেননা যেকোন পাপীই ঈশ্বর থেকে নিজেকে লুকোয়, তাঁর শাসন থেকে পালায় ও তাঁর সাক্ষাতে কথা বলা এড়ায়। সেই অনুসারে কাইনও একইপ্রকারে *প্রভুর সাক্ষাৎ থেকে বিদায় নিয়ে এদেনের উল্ট দিকে অবস্থিত সেই নোদ দেশে গিয়ে বসতি করল* [খ]। আর তিনি যেমন পবিত্রজনদের মধ্যে বসবাস করেন ও যেকোন পবিত্রজনের অন্তরেও বসবাস করেন যে *সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তি* ধারণ করে [গ] বা সেই খ্রিষ্টেই বসবাস করেন যাঁর মধ্যে যা কিছু পরিত্রাণ পেয়েছে তা আকাশের জ্যোতিষ্করাজি ও তারানক্ষত্র স্বরূপ [ঘ], তেমনি তিনি স্বর্গেও বসবাস করেন। অথবা, স্বর্গে নিবাসী পবিত্রজনদের কারণে তিনি সেখানেও বসবাস করেন এই বচন অনুসারে, *আমি চোখ উত্তোলন করেছি তোমার দিকে, তুমি যে স্বর্গে বসবাস কর* [ঙ]। এবং *ঈশ্বরের সামনে কথা উচ্চারণ করতে তত ব্যস্ত হয়ো না,*

কেননা ঈশ্বর রয়েছেন তোমার উপরে, স্বর্গে, আর তুমি রয়েছ নিচে এই মর্তে (চ) উপদেশকের এই উক্তি সেই ব্যবধান দেখাতে অভিপ্রেত যা যারা এখনও *হীনাবস্থার দেহে* (ছ) রয়েছে তাদের সেই দূতগণ থেকে পৃথক করে যাঁরা বাণীর সাহায্যে উত্তোলিত, ও পবিত্রতার পরাক্রমগুলো থেকে ও স্বয়ং খ্রিষ্ট থেকে তাদের পৃথক করে। কেননা এমনটাও অযৌক্তিক নয় যে তিনি, বলতে গেলে, হলেন তাঁর আপন পিতার সিংহাসন, কেননা আধ্যাত্মিক অর্থে তিনি 'স্বর্গ' বলে অভিহিত, ও তাঁর মণ্ডলী 'মর্ত' ও 'তাঁর পাদপীঠ'(জ) বলে নির্দেশিত।

[৫] আমি পুরাতন নিয়ম থেকে কয়েকটা বচন উল্লেখ করেছি যেগুলো ঈশ্বরকে এক স্থানে উপস্থাপন করে বলে বিবেচিত; এমনটা করেছি যাতে আমার সাধ্যমত আমি পাঠককে সর্বতভাবে ঐশশাস্ত্রের কথা উচ্চতর ও অধিক আধ্যাত্মিক অর্থে শুনতে প্রভাবান্বিত করতে পারি, বিশেষভাবে তখনই যখন এমনটা মনে হয় যে সেই বচনগুলো শেখাচ্ছে, ঈশ্বর এক স্থানে রয়েছেন। বিষয়টাকে 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' উক্তির সঙ্গে যুক্ত করা উপযুক্তই ছিল, কেননা তেমন আলোচনা দেখায় যে, ঈশ্বরের সত্তা সকল জনিত বস্তু থেকে পৃথক। আর যা কিছু তাঁর সত্তার অংশী নয়, তবু সেই সমস্ত বস্তু ঈশ্বরের এক প্রকার গৌরবের ও তাঁর পরাক্রমের অধিকারী, এবং বলতে গেলে, ঈশ্বরত্বের নির্গত প্রবাহেরও অধিকারী (ক)।

'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক'

২৪। [১] '*তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক*'(ক)। যে প্রার্থনা করে, সে হয় এমনটা ঘোষণা করছে যা এখনও ঘটেনি, না হয় এমনটা ঘোষণা করছে যা তার মতে ঘটে গেছে কিন্তু থেকে যাবে না বা রক্ষা করা যাবে না (খ)। একথা স্পষ্ট, কারণ মথিতে ও লুকে যখন 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক' বলতে আমাদের আদেশ করা হয়, বাক্যটা আসলে বলতে চায়, পিতার নাম এখনও পবিত্র বলে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু কেউ না কেউ বলতে পারবে, কেমন করে এক ব্যক্তি যাচনা করতে পারে যেন ঈশ্বরের নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হয় কেমন যেন সেই নাম ইতিমধ্যে পবিত্র বলে প্রকাশিত হয়নি? তাই পিতার 'নাম' এর অর্থ যে কী, ও সেই নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হওয়ার অর্থ যে কী, তা-ই হোক আমার বর্তমান অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

[২] আচ্ছা, একটা 'নাম' হলো সংক্ষিপ্ত এমন সারকথা যা নামটার অধিকারীর স্বীয় বিশেষত্ব নির্দেশ করে। তাই প্রেরিতদূত পল তাঁর নিজস্ব বিশেষত্বের অধিকারী, যেমন তাঁর আত্মার বিশেষত্ব যা সেই আত্মাকে এক ধরেনের আত্মা বলে চিহ্নিত করে, তার মনের বিশেষত্ব যা বিশেষ বিশেষ বিষয় ভাবে, ও তাঁর দেহের বিশেষত্ব যা সেই দেহকে এক ধরনের দেহ বলে চিহ্নিত করে। তবে, এসমস্ত বিশেষত্ব যা বিশিষ্ট ও অন্য কেউ যার ভাগী হতে পারে না, সেটাই "পল' নাম দ্বারা নির্দেশিত, কেননা পলের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমান কোন ব্যক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তির বিশিষ্ট বিশেষত্ব সেই ব্যক্তির নামকে, বলতে গেলে, পরিবর্তিত করে, এক্ষেত্রে শাস্ত্র অনুসারে সেই নাম সঙ্গতভাবেই পরিবর্তিত হয়। তাই যখন আব্রামের বিশেষত্ব পরিবর্তিত হল তখন তাঁকে 'আব্রাহাম' নাম দেওয়া হল [ক], শিমোনের বেলায় তাঁকে 'পিতর' নাম দেওয়া হল [খ], ও যিশুর নির্যাতনকারী শৌলের বেলায় তাঁকে 'পল' নাম দেওয়া হল [গ]। কিন্তু ঈশ্বরের বেলায় যেহেতু তিনি নিজে অপরিবর্তনীয় ও অনন্তকাল ধরে অপরিবর্তনশীল, সেজন্য তিনি যে নাম, বলতে গেলে, বহন করেন, সেই নাম এক, তথা সেই নাম যা যাত্রাপুস্তকে উল্লিখিত, '*আমি আছি*'[ঘ]। অতএব, যেহেতু আমরা সবাই ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু না কিছু ধরে নিই ও তাঁর সম্পর্কে কোন না কোন ধারণা ধারণ করে থাকি, কিন্তু তিনি যে কী আমরা সবাই যে তা বুঝি এমন নয়, কেননা অল্পজন মাত্র, এমনকি আমার বলা উচিত, অতি অল্পজন মাত্রই তারা যারা সর্বতভাবে তাঁর পবিত্রতা বোঝে, সেজন্য সঙ্গতভাবেই আমাদের শেখানো হয়, আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের যে ধারণা তা পবিত্র, যাতে করে আমরা তাঁরই পবিত্রতা দেখতে পাই যিনি সৃষ্টি করেন, নিজের দূরদৃষ্টি[ঙ] অনুশীলন করেন, বিচার করেন, বেছে নেন, পরিত্যাগ করেন, সাদরে গ্রহণ করেন, প্রত্যাখ্যান করেন, যোগ্য মানুষকে পুরস্কৃত করেন ও এক একজনকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে দণ্ডিত করেন।

[৩] কেননা আমার মতে যা, বলতে গেলে, হলো 'ঈশ্বরের নাম', ঈশ্বরের সেই বিশিষ্ট বিশেষত্ব শাস্ত্রে সেইসব কিছুতে ও সদৃশ সবকিছুতে ব্যক্ত। যেমন যাত্রাপুস্তকে, '*তোমার ঈশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না*'[ক]; দ্বিতীয় বিবরণে, '*আমার শিক্ষা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ুক বৃষ্টির মত, আমার কথন ফোঁটায় ফোঁটায় অবতীর্ণ হোক*

শিশিরের মত, ধারাপতনের মত নবীন ঘাসের উপর, চারাগাছের উপর তুষারের মত; কারণ আমি প্রভুর নাম করেছি’[খ]; এবং সামসঙ্গীত-মালায়, ‘*তারা চিরস্মরণীয় করবে তোমার নাম’*[গ]। যে কেউ ঈশ্বর সম্পর্কে অনুপযুক্ত ধারণা ধারণ করে, সে ঈশ্বরের নাম “অযথা নেয়”, কিন্তু যে কেউ সেই শিশিরের মত কথন উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের সহযোগিতা করে যারা এমনভাবে শোনে যাতে তাদের আত্মা ফলশালী হয়; আর যে কেউ শিশিরের মত উপদেশমূলক কথন উচ্চারণ করে, যে কেউ নিজের গঠনশীল কথনধারায় শ্রোতাদের উপর উপকারী জলধারা বা অধিক কার্যকর তুষার আনে, সে সেই “নামের” কারণেই এসব কিছু করতে সক্ষম। সুতরাং, যখন এক ব্যক্তি এটা বোঝে যে, এসমস্ত কিছু সিদ্ধতামণ্ডিত করার জন্য তার ঈশ্বরের দরকার আছে, তখন সে নিজে থেকেই নিজের পাশে তাঁকে ডাকে যিনি উপরোল্লিখিত সমস্ত আশীর্বাদের প্রকৃত দাতা। যে কেউ ঈশ্বর সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ও স্পষ্টই দেখতে পায়, সে সেগুলোকে শেখার চেয়ে সেগুলোকে স্মরণই করে, যদিও সে মনে করে, সে সেই সমস্ত কিছু অন্য কারও কাছ থেকে শুনছে বা এমনটা মনে করে, সে ঈশ্বরত্বের রহস্যগুলো নিজেই আবিষ্কার করছে।

[৪] যে প্রার্থনা করে, তার পক্ষে যেমন এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তা বোঝা আবশ্যক ও ঈশ্বরের নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক সেবিষয়েও তার পক্ষে যাচনা করা আবশ্যক, তেমনি সামসঙ্গীত-মালায়ও লেখা আছে, *এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম উত্তোলন করি* [ক]; সেই বচনে নবী আমাদের আদেশ করেন যেন আমরা সমস্ত একাত্মতা-সহ এক-মনে ও এক-জ্ঞানে ঈশ্বরের বিশিষ্ট বিশেষত্ব সংক্রান্ত প্রকৃত ও উন্নত উপলব্ধির নাগাল পাই। কেননা এটাই হলো ‘একসঙ্গে ঈশ্বরের নাম উত্তোলন’ করার অর্থ। যে ঈশ্বর দ্বারা উত্তোলিত হয়েছে ও নিজের শত্রুদের উপর এমন ভাবে জয়ী হয়েছে যে ওরা তার পতনে জয়োল্লাস করতে অক্ষম, সেই একজন যখন ঈশ্বরত্বের নির্গত প্রবাহের অংশী হয়, তখনই সে ঈশ্বরের সেই পরাক্রম ‘উত্তোলন’ করে, যে পরাক্রমের সে অংশী হয়েছে। একথা ৩০ নং সামসঙ্গীতের এই বচনে ব্যক্ত, *তোমাকে উত্তোলন করব, প্রভু: তুমি যে তুলে করেছ আমায়, আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে* [খ]। একজন তখনই ঈশ্বরকে উত্তোলন করে যখন নিজের অন্তরে তাঁর জন্য

একটা গৃহ উৎসর্গ করেছে, যেহেতু সামসঙ্গীতের শিরনাম বলে, ‘*দাউদের গৃহ-উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে গান*’[গ]।

[৫] তাছাড়া, ‘*তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক*’ ও পরবর্তী যত যাচনা যে অনুজ্ঞাসূচক ভাবে ব্যক্ত, সেসম্পর্কে বলতে হয় যে [সত্তরী পাঠ্যের] অনুবাদকেরা বাসনাসূচক ভাবের বদলে প্রায়ই অনুজ্ঞাসূচক ভাব প্রয়োগ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, সামসঙ্গীত ক্ষেত্রে ‘সেই ঠোঁট যেন নির্বাক্ হয়’ এর বদলে ‘*নির্বাক্ হোক মিথ্যাপটু সেই ঠোঁট যা অহঙ্কার ও বিদ্রূপ দেখিয়ে ধার্মিকের বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে কথা বলে*’[ক] ব্যবহৃত, এবং ১০৯ নং সামসঙ্গীতে যুদা সম্পর্কে ‘*ওর সবকিছু পড়ুক পাওনাদারের ফাঁদে, … ওর জন্য কোন রক্ষাকর্তা না থাকুক*’[খ]; বাস্তবিকই পুরা সামটা এমন একটা যাচনা যাতে সেইসব কিছু তার বেলায় ঘটে। কিন্তু তাতিয়ানুস [গ] এমনটা অনুভব না ক’রে যে ‘না থাকুক’ সময় সময় বাসনাসূচক ভাব নির্দেশ করে না কিন্তু অনুজ্ঞাসূচক ভাবই নির্দেশ করে, ‘*আলো হোক*’[ঘ] ঈশ্বরের এই উক্তি ক্ষেত্রে অধিক ঈশ্বর-নিন্দাজনক পাঠ উপস্থাপন করল এমনটা ধরে নিয়ে যে, ঈশ্বর আজ্ঞা না দিয়ে বরং প্রার্থনা করলেন যেন আলো হয়, ‘যেহেতু’, তার অভক্তিময় ধারণায় সে বলে, ‘ঈশ্বর অন্ধকারে ছিলেন।’ তাকে উত্তর দিতে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করব, তবে ‘*ভূমি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক*’, ‘*আকাশের নিচের জলরাশি একস্থানেই মিলিত হোক*’, ‘*জলরাশি অসংখ্য প্রাণীতে ভরে উঠুক*’ ও ‘*ভূমি প্রাণী উৎপন্ন করুক*’[ঙ] এ সমস্ত উক্তি কোন্ অর্থে বুঝতে হবে? তবে এমনটা কি হয় যে, নিজে স্থলভূমিতে দাঁড়াবার খাতিরেই ঈশ্বর প্রার্থনা করছেন যাতে আকাশের জলরাশি একস্থানেই মিলিত হয়? নাকি, ভূমি যা যা উৎপন্ন করে তা উপভোগ করার খাতিরেই কি তিনি প্রার্থনা করছেন যাতে ভূমি সবুজ ঘাস উৎপাদন করে? এবং [তাতিয়ানুসের মতে] যেমন তাঁর পক্ষে আলো দরকার আছে, তেমনি সমুদ্রের যত প্রাণী বা পাখি বা স্থলভূমির যত পশুর বিষয়ে তাঁর এমন কী দরকার আছে যে তিনি সেগুলো বিষয়ে প্রার্থনা করবেন? আর তাতিয়ানুস এমনটা মেনে নিলে যে ঈশ্বর ক্ষেত্রে তেমন কিছু বিষয়ে প্রার্থনা করা ঈশ্বরের পক্ষে অযৌক্তিক ও সেই বচনগুলো অবশ্যই অনুজ্ঞাসূচক ভাব অনুসারে ব্যবহৃত, তবু সে কেমন করে ‘আলো হোক’ বচনের বিষয়ে একই কথা প্রযোজ্য বলে বলতে এড়াতে পারবে, অর্থাৎ সে কেমন করে এমনটা মেনে নেবে না যে বচনটা বাসনাসূচক

ভাব অনুযায়ী প্রার্থনা নয় বরং অনুজ্ঞাসূচক ভাব অনুযায়ী আজ্ঞা বলে উচ্চারিত? যেহেতু [প্রভুর] প্রার্থনা অনুজ্ঞাসূচক ভাব অনুযায়ী ব্যক্ত, সেজন্য তাতিয়ানুসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছুটা বলা প্রয়োজন মনে করেছি, তাদেরই খাতিরে যারা তার ঈশ্বর-নিন্দাজনক শিক্ষা মেনে নেওয়ায় পথভ্রান্ত হয়েছে। একসময় তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

‘তোমার রাজ্য আসুক’

২৫। [১] *‘তোমার রাজ্য আসুক’*(ক)। যখন আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে *‘ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে না যে চোখে পড়বে; আর এমন কেউই থাকবে না যে বলবে, দেখ, এখানে, কিংবা, দেখ, ওখানে;’* কিন্তু *‘ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের অন্তরে উপস্থিত’*(খ) (*কেননা বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে* (গ)), তখন এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের বিষয়ে প্রার্থনা করে, সে ধর্মসম্মত ভাবে এমনটা প্রার্থনা করছে যেন ঈশ্বরের রাজ্য তার নিজের অন্তরে উৎসারিত হয়, ফলশালী হয় ও সিদ্ধিলাভ করে। তাছাড়া প্রতিটি পবিত্রজন ঈশ্বর দ্বারা শাসিত ও সেই ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক বিধানের প্রতি বাধ্য যিনি সুশাসিত নগরীতেই যেন তার অন্তরে বসবাস করেন। সুতরাং পিতা তার কাছে বিদ্যমান, ও পিতার সঙ্গে খ্রিষ্ট সেই আত্মায় রাজত্ব করেন যে আত্মা সিদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়েছে সেই বচন অনুসারে যা আমি একটু আগে (ঘ) উল্লেখ করেছিলাম তথা, *আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (ঙ)। আমার মতে ‘ঈশ্বরের রাজ্য’ এর অর্থ হলো আমাদের মনের সুখময় অবস্থা ও প্রজ্ঞাময় চিন্তা-ভাবনার সুসঙ্গত পরিস্থিতি, এবং ‘খ্রিষ্টের রাজ্য’ হলো সেই প্রবাহমান বাণী যা যারা তা শোনে তাদের পরিত্রাণ এনে দেয়, এবং [‘খ্রিষ্টের রাজ্য’ হলো] ধর্মময়তা ও অন্যান্য গুণাবলি সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদন, কেননা ঈশ্বরের পুত্র একাধারে বাণী ও ধর্মময়তা (চ)।

অপরদিকে প্রতিটি পাপী *এ যুগের শাসনকর্তার* (ছ) অত্যাচারের অধীন, কেননা গালাতীয়দের কাছে পত্রে যেইভাবে লেখা আছে, সেই অনুসারে যিনি ‘এ বর্তমান ধূর্ত যুগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে’ পাপী আমাদের জন্য ‘নিজেকে দান করলেন’ ও ‘আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে’ আমাদের মুক্ত করলেন, পাপী

মানুষ তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দেয় না। যে কেউ ইচ্ছাকৃত পাপের কারণে এ যুগের শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত, সে একইপ্রকারে পাপ দ্বারাও শাসিত। সুতরাং আমরা পল দ্বারা এতে আজ্ঞাবদ্ধ যেন, যে পাপ আমাদের উপর রাজত্ব করতে বাসনা করে, আমরা যেন সেই পাপের অধীন না হই। আমরা তাঁর এবাণী দ্বারাই আজ্ঞাবদ্ধ, *পাপ আমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে আমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়ব* (জ)।

[২] কিন্তু কেউ না কেউ সেই বচন দু'টো বিষয়ে তথা 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক' ও 'তোমার রাজ্য আসুক' বিষয়ে আপত্তি তুলবে একথা বলে যে, যে কেউ প্রার্থনা করে, তাকে যেন শোনা হয় সে সেই প্রত্যাশায় প্রার্থনা করে, ও বাস্তবিকই সময় সময় তাকে শোনা হয়, তবে, আগে যা বলা হয়েছে সেই অনুসারে এটা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের নাম এমন কার কার জন্য একসময় পবিত্র বলে প্রকাশিত হবে যার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তেমন ব্যক্তির জন্য তেমনটা হলে তবে সে কেমন করে 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক' ও 'তোমার রাজ্য আসুক' ব'লে সঙ্গতভাবে এমন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে যা ইতিমধ্যে উপস্থিত তা যেন অনুপস্থিত? তেমনটা হলে তবে 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক' ও 'তোমার রাজ্য আসুক' না বলা-ই আরও ন্যায়সঙ্গত।

এক্ষেত্রে যা বলা উচিত তা এ: যে কেউ 'জ্ঞানের ভাষা ও প্রজ্ঞার ভাষা'(ক) পাবার জন্য প্রার্থনা করে, সে সেবিষয়ে সবসময় সঙ্গতভাবে প্রার্থনা করে, কেননা, যেহেতু তার প্রার্থনা অবিরত শোনা হয়, সেজন্য সে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের পূর্ণতর ধারণা পাবে। কিন্তু সেবিষয়ে সে যতখানি আপাতত বুঝতে পারে, ততখানি শুধু 'অসম্পূর্ণ' রূপেই জানতে পারবে, কিন্তু যে সম্পূর্ণতা যা অসম্পূর্ণ তা দূর করে দেয়, সেই সম্পূর্ণতা তখনই প্রকাশিত হবে যখন ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ যত অভিজ্ঞতা ছাড়া মন মুখোমুখি হয়ে বিষয়টা দেখতে পাবে। তাই, একইভাবে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের নামের পবিত্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও তাঁর রাজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় যদি না সেইসঙ্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সম্ভবত বাকি যত গুণাবলি সংক্রান্ত *যা পূর্ণ তা না আসে* (খ)। আমরা যদি সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে *পিছনে যা কিছু আছে সেই সবই ভুলে যাই* (গ), তবেই আমরা

সম্পূর্ণতার দিকে যাত্রা করছি। আর আমরা অবিরতই এগোতে এগোতে তখনই আমাদের অন্তরে যা বিদ্যমান, ঈশ্বরের সেই রাজ্য শীর্ষস্থানের নাগাল পাবে যখন প্রেরিতদূতের সেই বাণী সিদ্ধিলাভ করবে, যখন *খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত শত্রু বশীভূত করার পর ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে* (ঘ)। অতএব, [ঐশ]বাণী দ্বারা ঈশ্বরীকৃত মনোভাবে *অবিরত প্রার্থনা ক'রে* (ঙ) এসো, আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে বলি, 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক'।

[৩] উপরন্তু, "ঈশ্বরের রাজ্য" সম্পর্কে আমাদের এমনটাও উপলব্ধি করা উচিত যে, যেমন '*ধর্মে অধর্মে পরস্পর সহযোগিতা নেই*' ও '*অন্ধকারের সঙ্গে আলোরও সহভাগিতা নেই*' ও '*বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রিষ্টেরও মিল নেই*'(ক), তেমনি পাপ-রাজ্য ও ঈশ্বরের রাজ্য একসাথে থাকতে পারে না। তাই যদি আমরা ইচ্ছা করি ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রাজত্ব করবেন, তাহলে *আমাদের মরদেহে পাপ যেন আদৌ রাজত্ব করতে না পারে* (খ), এবং '*মাংসের কর্ম*'(গ) সম্পাদন ক্ষেত্রে তার আজ্ঞার কাছে বা ঈশ্বর-বিরোধী কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রে আত্মার প্রতি তার প্ররোচনার কাছে আমাদের বাধ্য হওয়া উচিত নয়। বরং *সেই সবকিছু নিপাত ক'রে যা আমাদের মধ্যে পার্থিব* (ঘ), এসো, [পবিত্র] *আত্মার ফলগুলোতে ফলশালী হই* (ঙ) যাতে আমরা যা পাবার জন্য প্রার্থনা করছিলাম, সেই আধ্যাত্মিক পরাক্রমের ডান পাশে আসীন তাঁর আপন খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের উপরে একাই রাজত্ব ক'রে প্রভুই আমাদের অন্তরে 'আধ্যাত্মিক একটা বাগানেই'(চ) যেন '*গমনাগমন*'(ছ) করতে পারেন, আর 'সেই খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে আসীন থাকবেন যতক্ষণ তাঁর সকল শত্রুকে তাঁর পাদপীঠ করা না হয়' ও আমাদের অন্তরে বিরাজমান যত *আধিপত্য, প্রভুত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত না হয়* (জ)। এমনকি এমনটাও সম্ভব যে, এসমস্ত কিছু আমাদের এক একজনের বেলায় ঘটবে, ও '*সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে*' যাতে আমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট বলতে পারেন, '*ওহে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার বিজয়?*'(ঝ)। তবে এখন আমাদের যা ক্ষয়শীল তা সমস্ত পুণ্যতা ও সুচিতায় পবিত্রতা ও অক্ষয়শীলতা পরিধান করুক, এবং মৃত্যু একবার বিলুপ্ত হলে তবে এই যে মরণশীল তা আমাদের সেই আদি অমরতায় নিজেকে ভূষিত করুক যাতে ঈশ্বর যাদের উপর রাজত্ব

করেন সেই আমরা যেন ইতিমধ্যেই নবসৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মঙ্গলদান ভোগ করতে পারি (ঞ)।

‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।’

২৬। [১] *‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক’*(ক)। লুক ‘তোমার রাজ্য আসুক’ এর পরে এই বাক্য উল্লেখ না করে *‘আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি প্রতিদিন আমাদের দাও’*(খ) বাক্যটা রাখেন। সুতরাং এসো, কেবল মথি যা উল্লেখ করেন, আমরা আগেকার বাণীর আলোতে সেই বাণী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে স্বর্গে সকল স্বর্গবাসীদের দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে, আমরা যারা সেবিষয়ে সচেতন হয়ে মর্তে থাকতেই প্রার্থনা করি, সেই আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা উচিত যাতে একই প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা সবকিছুতে আমাদের দ্বারা মর্তে পূর্ণ হয় যেভাবে স্বর্গে তাঁদের দ্বারা পূর্ণ হয়। তেমনটা তখনই হবে যখন আমরা তাঁর ইচ্ছার বিপরীত কিছুই করি না। আর যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ‘যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও’ এই আমাদের দ্বারা সিদ্ধ করা হয়, তখন আমরা *স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী* (গ) হব, কারণ আমাদের সেই তাদেরই মত করা হবে যাঁরা স্বর্গে রয়েছেন যেহেতু তাঁদের মত আমরাও সেই *স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তি* (ঘ) ধারণ করেছি। আর যারা আমাদের পরে ‘মর্তে’ আসবে, তারা প্রার্থনা করবে যাতে তাদেরও আমাদের মত করা হয় যারা ইতিমধ্যে ‘স্বর্গে’ স্থান পেয়েছি।

[২] এমনটাও সম্ভব হতে পারে যে, ‘যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও’ এই যে বচন কেবল মথিতে উল্লিখিত, সেই বচন বাকি প্রতিটি যাচনার বেলায়ও আরোপ করা যেতে পারে, যাতে ‘প্রভুর’ প্রার্থনায় আমাদের যা বলতে নির্দেশ করা হয়, তা এরকম হয়, ‘যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক; যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও তোমার রাজ্য আসুক; যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’। কেননা যাঁরা স্বর্গে রয়েছেন, ঈশ্বরের নাম তাঁদের মধ্যে পবিত্র বলে প্রকাশিত, সেই রাজ্য তাঁদের বেলায় এসে গেছে, ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা যারা মর্তে রয়েছি, সেই আমরা এই সমস্ত কিছুর অভাবী হলেও তবু আমরাও সেই সমস্ত কিছু অর্জন করতে পারি যদি নিজেদের এমনভাবে যোগ্য করে তুলি যাতে ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছু বিষয়ে আমাদের শোনেন।

[৩] তবে 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক' বাক্যটা সম্পর্কে কেউ না কেউ বলতে পারে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা কেমন করে সেই স্বর্গে পূর্ণ হয়েছে যেখানে এমন 'দুষ্টতার আত্মাগুলো' বিরাজিত যার জন্য স্বর্গেও ঈশ্বরের খড়্গ [রক্ত] পান করে মত্ত হবে"[ক]? যখন আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হয়, তখন এমনটা কি হতে পারে যে আমরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে এমনটা প্রার্থনা করছি যাতে যে বিরোধী আত্মাগুলো স্বর্গ থেকে এ মর্তে এসেছিল সেগুলো মর্তে থেকে যায়? কেননা মর্তে তত সংখ্যক মন্দ জিনিস রয়েছে '*দুষ্টতার*' সেই বিজয়ী '*আত্মাগুলোর*' কারণে যারা '*স্বর্গীয় স্থানে*'[খ] রয়েছে। কিন্তু আমরা এমনটা ধরে নিই, কেউ না কেউ স্বর্গকে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যাখ্যা করে বলবে, স্বর্গ হলো স্বয়ং খ্রিষ্ট ও মর্ত হলো মণ্ডলী। বাস্তবিকই এমন কেইবা আছে যে পিতার '*সিংহাসন*' হতে যোগ্য যেভাবে খ্রিষ্ট তা হতে যোগ্য? আর এমন কীবা আছে যা '*তাঁর পাদপীঠ*' এর মত যেভাবে মণ্ডলী তাঁর পাদপীঠ [গ]? তেমন ব্যক্তি এই বিষয় সহজে সমাধান করবে এমনটা বলে যে, মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্যকে প্রার্থনা করতে হবে যেন তারা পিতার ইচ্ছা সেইভাবে গ্রহণ করে নেয় যেভাবে খ্রিষ্ট তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, কেননা তিনি *নিজের পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই নেমে এসেছিলেন* ও সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ করেছিলেন [ঘ]। বাস্তবিকই তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে তাঁর সঙ্গে একাত্মা হওয়া সম্ভব, এবং এর ফলে ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করাও সম্ভব হবে যাতে সেই ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণতা লাভ করে, তেমনি মর্তেও তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কেননা পল অনুসারে *প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়* [ঙ]। আর আমি মনে করি, যে কেউ এবিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা করে, সে এই ব্যাখ্যা তত সহজে অবজ্ঞা করবে না।

[৪] কিন্তু এমন কেউ থাকতে পারে যে এবিষয়ে আপত্তি তুলে মথির শেষাংশের সেই বচন উল্লেখ করবে যেখানে পুনরুত্থানের পরে যিশু সেই এগারো প্রেরিতদূতকে বলেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে* [ক]। স্বর্গে যা কিছু আছে তার উপরে তাঁর অধিকার আছে বিধায় তিনি ঘোষণা করেন যে, সেই অধিকারের সঙ্গে মর্তে অধিকারও যোগ করা হয়েছে যেহেতু স্বর্গে যা কিছু রয়েছে, তা বাণী দ্বারা আগেও আলোকিত ছিল, কিন্তু মর্তে যা রয়েছে, তা '*যুগান্তে*'[খ] স্বর্গ বলে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই

সমস্ত বিষয়ের অনুকরণ গুণে যা ঈশ্বরের পুত্রকে দেওয়া অধিকারের মধ্য দিয়ে ত্রাণকর্তা আগে থেকে পেয়ে গেছিলেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁর দ্বারা যাদের শিষ্য করা হয়েছে, তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পিতার সাক্ষাতে তাদের সকলকে আপন সহকর্মী হিসাবে নিতে ইচ্ছা করেন যাতে করে, স্বর্গে যে সমস্ত কিছু রয়েছে তা যেমন সত্য ও বাণীর অধীনে বশীভূত করা হয়েছিল, তেমনিভাবে তিনি 'স্বর্গে ও মর্তেও' যে অধিকার পেয়েছিলেন, সেই অধিকারের মধ্য দিয়ে মর্তের সবকিছুও সেই সুখময় পূর্ণতায় আনতে পারেন যা সেই সবকিছুর অপক্ষোয় রয়েছে যা তাঁর অধিকারের অধীনে রাখা হয়েছে। কিন্তু যে কেউ এমনটা মেনে নেয় যে, যেহেতু স্বর্গ হলো *নিখিল সৃষ্টির সেই প্রথমজাত* [গ] যাঁর উপরে পিতা একটা সিংহাসনেই যেন বিশ্রাম করেন, সেহেতু স্বর্গ হলো ত্রাণকর্তা ও মর্ত হলো মণ্ডলী, সে এমনটা দেখতে পাবে যে, তিনি যে মানুষকে ধারণ করেছিলেন, সেই যে মানুষ *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত* [ঘ] করার মধ্য দিয়ে সেই অধিকারের যোগ্য গণ্য হয়েছিলেন, সেই মানুষই পুনরুত্থানের পরে বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে* [ঙ]। কেননা ত্রাণকর্তা হিসাবে "সেই মানুষই" স্বর্গে যা কিছু রয়েছে সেই সমস্ত কিছুর উপরে অধিকার গ্রহণ করেছেন, এমন কিছু যা সেই একমাত্র জনিতজনেরই সম্পদ, যাতে করে, তাঁর [অর্থাৎ, সেই একমাত্র জনিতজনের] ঈশ্বরত্বের সঙ্গে মিশ্রিত ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ায়, তিনি তাঁর সঙ্গে সেই সমস্ত কিছুর সহভাগিতা করতে পারেন।

[৫] তবু দ্বিতীয় সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি, তথা, '*মর্তবাসীদের সঙ্গে সংগ্রামরত*' যারা, যখন '*দুষ্টতার সেই আত্মাগুলো স্বর্গীয় স্থানে*'[ক] রয়েছে, তখন কেমন করে ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। যে কেউ এখনও মর্তে রয়েছে, সে যেমন অবস্থান দ্বারা নয়, বাসনায়ই *স্বর্গে নাগরিকত্বের অধিকারী* [খ], *স্বর্গে নিজের ধন জমায়* [গ], তার নিজের হৃদয় স্বর্গে রয়েছে, ও সে নিজে *সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তি* ধারণ করছে [ঘ], যার ফলে সে আর মর্তেরও নয় বা নিম্নজগতেরও নয় বরং স্বর্গের ও এই জগতের চেয়ে শ্রেয় সেই স্বর্গীয় জগতেরই, তেমনি '*দুষ্টতার সেই আত্মাগুলো*' এখনও '*স্বর্গীয় স্থানে*' বাস করলেও [ঙ] তবু মর্তে নিজেদের নাগরিকত্ব বজায় রাখছে, মানবজাতির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে

নিজেদের ধন মর্তে জমাচ্ছে ও *মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি* ধারণ করছে [চ], ঠিক সেই প্রাণীর মত *যা দূতদের আমোদপ্রমোদের বস্তু হবার জন্য প্রভুর প্রথম গড়া* [ছ] প্রাণী, যার ফলে সেই আত্মাগুলো প্রকৃতপক্ষে স্বর্গস্থানীয়ও নয়, তাদের খারাপ মনোভাবের দরুন স্বর্গেও বসবাস করে না। অতএব, যখন শাস্ত্রে বলে, 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক', তখন আমাদের এমনটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, ওরা স্বর্গে রয়েছে, কেননা নিজেদের মনের অভিপ্রায়ে ওরা সেই একজনের সঙ্গে পড়ল যে *বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়েছিল* [জ]।

[৬] এমনকি, যখন আমাদের ত্রাণকর্তা বলছেন আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হয়, তখন হয় তো তিনি এমন দাবি আদৌ রাখছেন না যে, যা কিছু স্থান হিসাবে মর্তে রয়েছে সেটারই জন্য প্রার্থনা করা উচিত যাতে সেই সবকিছু সেইমত হয় যা স্থান হিসাবে স্বর্গে রয়েছে, বরং প্রার্থনা সংক্রান্ত তাঁর নির্দেশ হলো তাঁর বাসনার ফল যাতে যা কিছু মর্তে রয়েছে অর্থাৎ যা কিছু নিম্ন ধরনের ও মর্তের সমরূপ তা যেন যা শ্রেয় তা সেটারই মত হয়, 'স্বর্গে নাগরিকত্ব' লাভ করে [ক] ও 'স্বর্গ' হয়ে ওঠে। কেননা যে কেউ পাপ করে, সে যেইখানে থাকুক না কেন, সে তো 'মর্ত', ও মনপরিবর্তন না করলে সে যেকোন ভাবেই নিজের স্বজাতীয় মর্তের সঙ্গে ফিরে যাবে [খ]। অপরদিকে, যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে ও পরিত্রাণের আধ্যাত্মিক নিয়মের প্রতি অবাধ্য হয় না, সে তো 'স্বর্গ'। তাই আমরা পাপের কারণে এখনও 'মর্ত' হলে, তবে এসো, প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের সংশোধনের লক্ষ্যে আমাদের উপর বিস্তৃত হয়, সেইভাবে যেভাবে সেই তাদেরই নাগাল পেয়েছিল যারা আমাদের আগে 'স্বর্গ' হতে চলেছে বা হয়ে গেছে। আর যদি ঈশ্বর দ্বারা আমরা 'মর্ত' বলে নয়, কিন্তু 'স্বর্গ' বলে পরিগণিত হয়ে থাকি, তাহলে এসো, যাচনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তে অর্থাৎ নিম্ন ধরনের বিষয়ের মধ্যেও পূর্ণ হয়, যাতে করে, বলতে গেলে, মর্তকে স্বর্গ করার ফলে আর কোন মর্ত না থাকে বরং সবকিছু 'স্বর্গ' হয়ে ওঠে। কেননা, যদি ঈশ্বরের 'ঈচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তে' সেইভাবে পূর্ণ হয় যেভাবে আমি ব্যাখ্যা করেছি, তাহলে মর্ত আর মর্ত হয়ে থাকবে না।

আমরা বিষয়টা আরও একটা উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করব। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন আত্মসংযমীদের মধ্যে পূর্ণ হয় তেমনি উচ্ছৃঙ্খলদের মধ্যেও পূর্ণ হত, তাহলে উচ্ছৃঙ্খল যারা তারা আত্মসংযমী হয়ে উঠবে; অথবা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন ধার্মিকদের মধ্যে পূর্ণ হয় তেমনি অধার্মিকদেরও মধ্যে পূর্ণ হত, তাহলে অধার্মিকেরা ধামির্ক হয়ে উঠবে। ফলে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা 'যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও' পূর্ণ হয়, তাহলে আমরা সবাই স্বর্গ হয়ে উঠব। কেননা *যা কোন কাজের নয়* (গ) যদিও সেই মাংস ও যা সেটার একজাতীয় সেই রক্তও *ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম নয়* (ঘ), তথাপি সেই দু'টোর বিষয়ে এমনটা বলা যেতে পারত যে, দু'টোই উত্তরাধিকারী হয়ে উঠবে যদি দু'টোই মাংস, মর্ত, মলিনতা ও রক্ত থেকে স্বর্গীয় বিষয়ে পরিণত হত।

'আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও'

২৭। [১] '*আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও*', অথবা লুকের পাঠ্য অনুসারে, '*আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি প্রতিদিন আমাদের দাও*'(ক)। যেহেতু কেউ না কেউ ধরে নেয় যে, দৈহিক রুটির জন্যই আমাদের প্রার্থনা করতে হয়, সেজন্য তাদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার লক্ষ্যে সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি সংক্রান্ত সত্য উপস্থাপন করা উচিত। তাদের কাছে আমাদের একথা বলতে হবে, যখন মাংসটা স্বর্গীয় বিষয়ও নয়, মহৎ বিষয়ও নয়, তখন যিনি বলেন আমাদের পক্ষে স্বর্গীয় ও মহৎ বিষয় সম্পর্কে যাচনা করা উচিত, তিনি কেমন করে এখন এমন দাবি রাখেন যেন আমরা মাংসের বিষয় সম্পর্কে যচনা নিবেদন করি, কেমন যেন তিনি যাচনা সম্পর্কে যা আমাদের শিখিয়েছিলেন তা ভুলে গিয়ে থাকেন? বাস্তবিকই যে রুটি আমাদের মাংসে অঙ্গীভূত হয় তা তো স্বর্গীয় নয়, সেটার বিষয় সম্পর্কে যাচনা নিবেদন করাও মহৎ বিষয় নয়।

[২] আমি এখন রুটি সংক্রান্ত গুরুর নিজের শিক্ষায় তাঁকেই অনুসরণ করে বিস্তারিত প্রমাণে এই কথা ব্যাখ্যা করব। যোহন অনুসারে, যারা কাফার্নাউমে তাঁকে খুঁজতে এসেছিল, তাদের তিনি বলেছিলেন, '*আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা চিহ্নগুলো দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ*'(ক)। কেননা যে কেউ যিশুর আশীর্বাদিত রুটিখানা খায় ও

তাতে পরিতৃপ্ত হয়, সে-ই বরং ঈশ্বরের পুত্রকে সূক্ষ্মতর ভাবে বুঝবার জন্য সচেষ্ট থাকে ও তাঁর প্রতি ধাবিত হয়। তাই তিনি সঙ্গতভাবেই তাদের এ নির্দেশ দেন, ‘*নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়, যা মানবপুত্রই তোমাদের দান করবেন*’[খ]। আর যখন তাঁর শ্রোতারা সেবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল, ‘আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের কী করতে হবে?’ তখন যিশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ‘*তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ*’[গ]। এদিকে, সামসঙ্গীত-মালা অনুসারে, ঈশ্বর *আপন বাণী পাঠিয়ে তাদের নিরাময় করলেন* [ঘ], অর্থাৎ পীড়িত ছিল যারা তাদেরই তিনি নিরাময় করলেন। যারা তাঁর সেই বাণীতে বিশ্বাস রাখে, তারাই ‘ঈশ্বরের সেই কাজ করে’ যা হলো ‘সেই খাদ্য যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়’। তিনি আরও বলেন, ‘*আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন; কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি*’[ঙ]। সত্যকার রুটি তিনিই হলেন যিনি সেই সত্যকার মানুষকে পুষ্ট করেন যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, তাই যে কেউ সেইভাবে পুষ্ট হয় সে স্রষ্টার সাদৃশ্যে বেড়ে ওঠে। আত্মার পক্ষে যুক্তির চেয়ে পুষ্টিকর কীবা আছে? যে কেউ তা গ্রহণ করে নেয়, সেই মানুষের মনের পক্ষে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার চেয়ে বেশি মূল্যবান কীবা আছে? এবং যুক্তি-বিশিষ্ট প্রকৃতির পক্ষে সত্যের চেয়ে বেশি সমীচীন কীবা আছে?

[৩] এমন কেউ থাকলে যে এবিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বলে, তিনি যদি অন্য কিছু বিষয় মনে করতেন, তাহলে তিনি সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি যাচনা করতে আমাদের শেখাতেন না, তবে সে শুনুক যে, যোহনের সুসমাচারেও তিনি সময় সময় এবিষয়ে এমনভাবে কথা বলেন কেমন যেন বিষয়টা এমন যা নিজে থেকে ভিন্ন, এবং সময় সময় এবিষয়ে এমনভাবে কথা বলেন কেমন যেন তিনি নিজেই সেই ‘রুটি’। সেই অনুসারে, তিনি তখনই [নিজে থেকে ভিন্ন] অন্য বিষয়ে কথা বলেন যখন বলেন, ‘*মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন*’[ক]। আর যারা তাঁকে বলেছিল, ‘তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন’, নিজেরই বিষয়ে যেন তিনি তাদের বলেছিলেন, ‘*আমিই*

সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না’[খ]; এবং কয়েক পদ পরে, *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য* [গ]।

[৪] যেহেতু শাস্ত্র সবরকম খাদ্যের বেলায় ‘রুটি’ শব্দ ব্যবহার করে যেইভাবে মোশি সম্পর্কে যা লেখা আছে তা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, কেননা *তিনি চল্লিশ দিন ধরে রুটিও খেলেন না, জলও পান করলেন না* [ক], এবং যেহেতু সেই পুষ্টিকর বাণী বহুবিধ ও বহুরূপী কেননা সবাই যে ঐশতত্ত্বের কাঠিন্য ও শক্তি থেকে পুষ্টিসাধন গ্রহণ করে নিতে সক্ষম এমন নয়, সেজন্য যারা সিদ্ধতা-প্রাপ্তির অধিকতর নিকটবর্তী, তাদের প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী পুষ্টি দেবার ইচ্ছায় তিনি তাদের উদ্দেশ করে বলেন, ‘*আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য*’[খ], এবং কয়েক পদ পরে তিনি বলে চলেন, ‘*তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে*’[গ]। এটাই সেই প্রকৃত খাদ্য, খ্রিষ্টের সেই মাংস যা বাণী হওয়ায় মাংস হলেন এই বচন অনুসারে, *এবং বাণী হলেন মাংস* [ঘ]। তিনি তখনই ‘আমাদের অন্তরে বসবাস করেন’ যখন আমরা তাঁকে খাই ও পান করি। এবং যখন তাঁকে ‘বিতরণ’ করা হয় [ঙ], তখন *আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম* [চ] বচনটা সিদ্ধিলাভ করে। ‘*এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে*’[ছ]।

[৫] এবং যারা ‘শিশু’ ও ‘মায়সময় মানুষমাত্র’ বলে আচরণ করছিল, সেই করিন্থীয়দের সেই ভাবে সম্বোধন করে পল বলেন, ‘*আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত*

খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি। এমনকি, এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ'[ক]; এবং হিব্রুদের কাছে পত্রে তিনি বলেন, *'তোমাদের দুধই প্রয়োজন, গুরুপাক খাদ্য নয়। সত্যি, শুধু দুধ যার খাদ্য, এখনও শিশু হওয়ায় ধর্মময়তার তত্ত্বকথা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গুরুপাক খাদ্য সিদ্ধতা-প্রাপ্ত সেই মানুষদের জন্য, সাধনার ফলে যাদের মন মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে অভ্যস্ত'*[খ]। আর আমার মতে *একজন বিশ্বাস করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়* [গ] বচনটা প্রধানত দৈহিক খাদ্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে না, বরং ঈশ্বরের বাণীরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যা আত্মাকে পুষ্টি দান করে। কেননা যে বিশ্বাসে পূর্ণ ও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ বচনে যাকে 'একজন বিশ্বাস করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে' ইঙ্গিত করা হয়, সে সবকিছু গ্রহণ করে নিতে সক্ষম, কিন্তু যে কেউ দুর্বল ও কম সিদ্ধতাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ বচনে তিনি 'যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়' বলায় যাকে ইঙ্গিত করতে ইচ্ছা করেন, সে যথেষ্ট সরল এমন ধর্মশিক্ষায় তুষ্ট যা তত শক্তি যোগাতে পারে না।

[৬] প্রবচনমালায় শলোমনের একটা উক্তি রয়েছে যা আমার মতে এ শিক্ষা দেয় যে, যে মানুষ অধিক শক্তিশালী ও মহত্তর শিক্ষা পেতে অক্ষম, তার মনে যতদূর ভুলভ্রান্তি থাকে না, সে তারই তুলনায় শ্রেয় যে বেশি প্রস্তুত ও বেশি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় ভারী বিষয় আঁকড়িয়ে ধরে কিন্তু বিশ্বের শান্তি ও মিলের গভীরতর অর্থ স্পষ্ট ভাবে দেখে না। তাঁর উক্তি এরূপ, *ঘৃণার পরিবেশে মোটা-সোটা বলদের মাংসের চেয়ে ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশে শাকের রান্নাই শ্রেয়* [ক]। বাস্তবিকই, উন্নত খাবার উপস্থাপন করতে অক্ষম যারা, আমরা অথিতি হিসাবে তাদের সদ্বিবেকে আয়োজিত কোন না কোন সাধারণ ও স্বাভাবিক ভোজে প্রায়েই অংশ নিয়েছি, এবং এমন প্রসন্নতার সঙ্গেই তাই করেছি যা এমন ভাষণের চেয়ে মহত্তর, যে ভাষণ ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে উচ্চতর কথা উত্তোলন করতে করতে অধিক স্পর্ধার সঙ্গে এমন শিক্ষা ঘোষণা করে যা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পিতার দেওয়া বিধান ও নবীদের শীক্ষার বিরোধী [খ]। অতএব, পুষ্টির অভাবের কারণে আত্মায় পীড়িত না হওয়ার জন্য, প্রভুর বাণী ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের কারণে [গ] ঈশ্বরের দৃষ্টিতে না মরার জন্য, এসো, শিক্ষাগুরু হিসাবে আমাদের

ত্রাণকর্তার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে আরও যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করে ও জীবনযাপন করে পিতার কাছে সেই জীবনময় রুটিকে যাচনা করি যা 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটির' সামীল।

'এপিউসিয়োন' শব্দটা সম্পর্কে

[৭] এখন আমাকে 'এপিউসিয়োন' [ἐπιούσιον] শব্দটার অর্থ বিচার-বিবেচনা করতে হবে (ক)। সর্বপ্রথমে এ জানতে হয় যে, 'এপিউসিয়োন' শব্দটা গ্রীক লেখকদের দ্বারা বা দার্শনিকদের দ্বারা ব্যবহৃত নয়, লোকদের মধ্যেও সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত নয়, বরং এমনটা মনে হচ্ছে শব্দটা সুসমাচার-লেখকদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল; কমপক্ষে মথি ও লুক শব্দটা একই ভাবে ব্যবহার করায় দু'জনেই একমত। যাঁরা হিব্রু শাস্ত্র [গ্রীক ভাষায়] অনুবাদ করেছিলেন তেমন কিছু অন্য ক্ষেত্রেও করেছিলেন; কোন্ গ্রীক লেখক 'কান দাও' বা 'শোনো' এর বদলে 'এনোতিজু' [ἐνωτίζου] (খ) বা 'আকুতিএইস' [ἀκουτιεῖς] (গ) শব্দগুলো ব্যবহার করলেন? 'এপিউসিয়োন' [ἐπιούσιον] শব্দটার যথেষ্ট সদৃশ একটা কথা মোশির লেখায় রয়েছে; কথাটা ঈশ্বর দ্বারা উচ্চারিত, 'তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার [περιούσιος, পেরিউসিয়োস] কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার'(ঘ)। আমার মতে শব্দ দুটো একই ধাতু থেকে উৎপন্ন তথা 'উসিয়া' [οὐσία]; প্রথম শব্দটা সেই রুটির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যা ঐশসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত, দ্বিতীয় শব্দটা এটা নির্দেশ করে যে, জনগণ ঐশসত্তার নিকটবর্তী ও সেটার সহভাগী।

[৮] আচ্ছা, যারা এমনটা সমর্থন করে যে, যেকোন কিছুর ভিত্তিমূলক বাস্তবতা [ὑπόστασις, হিপোস্তাসিস) প্রধানত অশরীরী বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তারা সাধারণত 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] শব্দটা কেবল অশরীরী বিষয়ের জন্য ব্যবহার করে (ক), যেহেতু তেমন বিষয়গুলো স্থৈর্যের অধিকারী ও যোগ বা বিয়োগের অধীন নয়। আর আসলে এটা, তথা যোগ বা বিয়োগ হলো যেকোন দেহের বৈশিষ্ট যেগুলো অস্থায়ী অবস্থানের অধীন হওয়ায় বৃদ্ধিও পেতে পারে, ক্ষয়ও হতে পারে, ফলত সেগুলোর জন্য বাহ্যিক কর্তা দ্বারা অবলম্বন বা পুষ্টি দরকার আছে। আর যখন যা ভিতরে আসে তা যেটা বের হয় সেটার চেয়ে বেশি, তখন বৃদ্ধি হয়; কিন্তু যা ভিতরে আসে তা কম হলে

তবে হ্রাস ঘটে। আর হয় তো যদি এমনটা হত যে, এমন দেহ রয়েছে যেটার জন্য বাহ্যিক নির্ভর দারকার হয় না, তাহলে এমনটা বলা যেতে পারে যে, সেই দেহগুলো এমন হ্রাসের দিকে চলছে যা বন্ধ করা যায় না।

অন্যদিকে তারাও রয়েছে যারা এমনটা বিবেচনা করে যে, অশরীরী বস্তুর 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] দেহের 'সত্তা' ক্ষেত্রে গৌণ [খ]। তারা 'সত্তা' এভাবে ব্যাখ্যা করে: 'সত্তা' হলো সেই মুখ্য পদার্থ যা থেকে অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বিষয়গুলো অস্তিত্ব পায়, বা সেটা নাম-বিশিষ্ট বস্তুগুলোতে অস্তিত্ব-বিশিষ্ট, এবং যা কিছু একটা নামের অধিকারী, তা 'সত্তা'র অধিকারী; অথবা সেটা যা গুণবিহীন প্রধান অধঃস্তর; বা সেটা নিজেতে অপরিবর্তনশীল এমন কিছু যা সবধরনের পরিবর্তন বা বিকৃতি মেনে নেয়; বা সেটা হলো সেইসব কিছুর নিম্নস্থিত ভিত্তি যেগুলো বিকৃতি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই সকলের মতে 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] নিজেতেই বিশিষ্টতা-বিহীন ও নিরাকার, সেটার স্থিরীকৃত কোন আয়তনও নেই, তবু সেটা পূর্বস্থিরীকৃত কিছুর মত সমস্ত বিশিষ্টতায় বিদ্যমান। 'বিশিষ্টতা' বলতে তারা সেই সমস্ত কিছু বোঝায় যা সাধারণত এমন কর্মশক্তি ও কর্মকান্ড বলে অভিহিত যা দ্বারা গতি ও সম্পর্ক ঘটে থাকে। তারা নাকি বলে, নিজে থেকে 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া এর সেই সমস্ত 'বিশিষ্টতায়' কোন সহভাগিতা নেই, অথচ সেটার গ্রহণশীলতা গুণে 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] এক একটা বস্তু থেকে অবিচ্ছেদ্য নয়, কেননা যেকোন কর্তা সেটাতে বিশিষ্টতা বা বিকৃতি আনে, সেটা সেই কর্তার যেকোন গতির সম্পূর্ণরূপে গ্রহণশীলতা-প্রাপ্ত। কেননা সেটার সঙ্গে উপস্থিত এমন শক্তি রয়েছে যা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ও বিশ্বের প্রতিটি বিশিষ্টতা ও কর্মকাণ্ডের জন্য কারণ হিসাবে সক্রিয়। তারা বলে, সেই 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনশীল ও সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য, এবং প্রতিটি 'সত্তা' অন্য 'সত্তার' সঙ্গে মিশে যেতে পারলেও তবু সেই 'সত্তা' একক হয়ে থাকে।

[৯] 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] শব্দ সম্পর্কে যা আমি অনুসন্ধান করে এসেছি, ও যা 'এপিউসিয়োন [ἐπιούσιον] রুটি' ও 'নিজস্ব [περιούσιος, পেরিউসিয়োস] অধিকার' শব্দদ্বয় দ্বারা উত্তোলন করা হয়েছিল, তা 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] শব্দের অর্থ বুঝবার জন্যই অভিপ্রেত ছিল। এবং আগেকার আলোচনায় আমি এমনটা

উপস্থাপন করেছিলাম যে, যে রুটির জন্য আমাদের যাচনা করা উচিত, তা সর্বোপরি হলো সেই রুটি যা মনেরই জন্য প্রয়োজন, তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, সেই রুটি উল্লিখিত 'সত্তা' [οὐσία, উসিয়া] এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে, যে ব্যক্তির পুষ্টিসাধন হচ্ছে, সেই দৈহিক রুটি যেমন সেই ব্যক্তির কাছে বিতরণ করা হলে তার 'সত্তায়' গৃহীত হয়, তেমনি যে কেউ সেই জীবনময় রুটি থেকে পুষ্টিলাভ করতে সম্মত, স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই জীবনময় রুটিও সেই ব্যক্তির মন ও আত্মায় গৃহীত হয় ও নিজের নিজস্ব শক্তি তাকে প্রদান করে। আর এভাবে সেই রুটি সেই 'এপিউসিয়োন' [ἐπιούσιον] তথা 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়' রুটি হয়ে ওঠে যার জন্য যাচনা করি। আরও, পুষ্টিলাভ করছে যে ব্যক্তি, সে যেমন খাদ্যের বিশিষ্টতা অনুযায়ী, যেমন অতরল খাদ্য বা ক্রীড়াবিদদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, অথবা দুধ বা শাক জাতীয় খাদ্য বিশিষ্টতা অনুযায়ী নানা ভাবে শক্তিলাভ করে, তেমনি এটাও দাঁড়ায় যে, ঈশ্বরের বাণী হয় শিশুদের জন্য উপযুক্ত দুধ হিসাবে বা পীড়িতদের জন্য উপযুক্ত শাক হিসাবে, অথবা লড়াইতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপযুক্ত মাংস হিসাবে দান করা হয়। এবং এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে যে কেউ পুষ্টিলাভ করে, সে সেই বাণীর কাছে যতখানি নিজেকে সঁপে দিয়েছে, সে ততখানি যেকোন কর্ম সম্পাদন করতে বা অন্য ধরনের মানুষ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। অবশ্যই, খাদ্য বলে এমন কিছু আছে যা প্রকৃতপক্ষে বিষাক্ত, অন্য কিছু আছে যা অসুখ ঘটায়, ও অন্য কিছু আছে যা হজম করা যায় না; সদৃশ তুলনা অনুসারে এই সমস্ত বিষয়, এক একটাই, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে আরোপণীয় যা পুষ্টিকর বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি' সেটাই হলো যা যুক্তি-বিশিষ্ট মানব-প্রকৃতির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ও তার 'সত্তার' সঙ্গে সমজাতীয়। তেমন রুটি একইসাথে আত্মায় স্বাস্থ্য, তেজ ও শক্তি যুগিয়ে দেয়, এবং যেহেতু ঈশ্বরের বাণী অমর, সেজন্য যে কেউ তা খায়, সেই বাণী তাকে নিজের অমরতার সহভাগী করে তোলে।

১০। তেমন 'এপিউসিয়োন' [ἐπιούσιον, 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়'] রুটি আমার মতে শাস্ত্রে অন্য নামে উল্লিখিত তথা 'জীবনবৃক্ষ'; যে কেউ হাত বাড়িয়ে তা থেকে কিছু তুলে নেয় *সে চিরজীবী হবে* (ক)। শলোমন দ্বারা বৃক্ষটা তৃতীয় একটা নাম বলে অভিহিত তথা 'ঈশ্বরের প্রজ্ঞা'; তাঁর উক্তি এরূপ, *যে কেউ তাকে* [অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে]

আঁকড়ে ধরে, তা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ; যে কেউ তার উপরে প্রভুর উপরেই যেন নির্ভর করে, তার পক্ষে সে স্থিতমূল (খ)। আর যেহেতু দূতগণও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা পুষ্টিলাভ করেন ও নিজ নিজ বিশেষ কর্ম সম্পন্ন করার জন্য প্রজ্ঞার সঙ্গে সত্য সন্দর্শন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, সেজন্য সামসঙ্গীত-মালায় লেখা আছে যে, দূতগন তাতে পুষ্টিলাভ করেন ও ঈশ্বরের যে জনগণ হিব্রু বলে অভিহিত, তারা দূতদের সহভাগী হয় ও তাঁদের সঙ্গে কেমন যেন সহভোজী হয়। এটা হলো *মানুষ খেল দূতদের রুটি* (গ) বচনের অর্থ। আমাদের মন এত নিঃস্ব না হোক যে এমনটা ভাববে, দূতগণ সর্বদাই এমন এক প্রকার দৈহিক রুটিতে পুষ্ট হন যেমন সেই খাদ্য ছিল যা, যেইভাবে লেখা আছে, তাদের উপরে আকাশ থেকে নেমে আসছিল যারা মিশর থেকে বের হয়েছিল; [আমাদের মন] এমনটাও না ভাবুক যে, এটাই ছিল সেই রুটি হিব্রুরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী সেই দূতদের সঙ্গে যার সহভাগী হয়েছিল।

[১১] ‘এপিউসিয়োন’ (ἐπιούσιον, ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’) রুটি, ‘জীবনবৃক্ষ’, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা’ ও পবিত্র দূতগণ ও মানুষদের একইসাথে ভোগ করা খাদ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এমনটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয় যদি আমরা সেই তিনজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করি যাঁদের বিষয়ে আদিপুস্তকে লেখা আছে তাঁদের আব্রাহাম দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়েছিল ও তাঁরা তিন ধামা সেরা ময়দায় মাখা আগুনে ছাঁকা পিঠায় অংশগ্রহণ করেছিলেন (ক)। এমনটা হতে পারে যে, ঘটনা রূপক আকারে লেখা হয়েছিল, কেননা পবিত্রজনেরা সময় সময় মানুষদের সঙ্গে শুধু নয় বিন্তু অধিক ঐশ্বরিক পরাক্রমগুলোর সঙ্গেও আধ্যাত্মিক ও যুক্তি-বিশিষ্ট খাদ্যের অংশী হতে পারেন, হয় এই কারণে যে, তাঁরা যেন মানুষকে সহায়তা করতে পারেন, না হয় এমনটা দেখাবার জন্য তাঁরা নিজেদের জন্য কেমন মহৎ ধরনের খাদ্য বানাবার ক্ষমতার অধিকারী। আর তেমন প্রদর্শনীতে পুষ্ট হওয়ায় দূতগণ উল্লসিত, এবং যিনি উল্লসিত করেন ও বলতে গেলে আগে থেকে প্রস্তুত করা পুষ্টিকর শিক্ষা দিয়ে মানুষকে পুষ্ট করেন, দূতগণ তাঁর বিষয়ে আরও বেশি ও মহত্তর কিছু উপলব্ধি করার ব্যাপারে সেই মানুষকে সবদিক দিয়ে সহায়তা করতে ও অনুপ্রাণিত করতে আরও আগ্রহী হন। একটা মানুষ যে দূতগণকে পুষ্ট করে, এতে তত বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যখন খ্রিষ্টও এ স্বীকার করেন যে, তিনি নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে

ঘা দেন যাতে, যে কেউ তাঁর জন্য দরজা খুলে দেয় তিনি তার ঘরে প্রবেশ ক'রে লোকটার যা কিছু আছে তা নিয়ে তার সঙ্গে ভোজে বসতে পারেন [খ] যাতে করে যে লোকটা নিজের সাধ্যমত ঈশ্বরের পুত্রকে আগে আপ্যায়ন করেছিল, তিনি পরবর্তীকালে নিজেরই যা, তা তাকে মঞ্জুর করতে পারেন।

[১২] সুতরাং, যে কেউ 'এপিউসিয়োন' (ἐπιούσιον, 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়') রুটিতে অংশ নেয়, সে '*অন্তরে বলবান*' হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে [ক]; অপরদিকে যে কেউ 'নাগদানবের' অংশী হয় সে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে 'সেই ইথিওপীয়' ছাড়া আর কিছু নয়; হ্যাঁ, সে নাগদানবের ফাঁদে [খ] নিজে একটা সাপে পরিণত হয়, যার ফলে যদিও সে বলে, সে বাপ্তিস্ম পেতে বাসনা করছে, তবু এই ভর্ৎসনা শোনে যা স্বয়ং বাণী দ্বারা উচ্চারিত, '*সাপ! কালসাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?*'[গ] এবং নাগদানবের যে দেহটাকে ইথিওপীয়রা গ্রাস করেছিল, সেই বিষয়ে দাউদ বলেন, '*তুমি জলরাশির উপর নাগদানবদের মাথাগুলো চূর্ণ করলে, তুমি নাগদানবের মাথা টুকরো টুকরো করে ফেললে ও তার দেহটাকে ইতিওপীয়দের খাদ্য রূপে দিলে*'[ঘ]। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের পুত্র সত্তায় বিদ্যমান, ও সেইমত সেই বিরোধীও সত্তায় বিদ্যমান, সেজন্য এমনটা অযৌক্তিক নয় যে, উভয় এক একজন একের বা অন্যের খাদ্য হবে। তাই আমরা কেনই বা এবিষয় মেনে নিতে দ্বিধা করব যে, উত্তম বা মন্দ পরাক্রমগুলোর বেলায় হোক ও মানবের বেলায় হোক আমরা এক একজন সেগুলো থেকে পুষ্টিলাভ করতে পারি? বাস্তবিকই পিতর যখন শতপতি সেই কর্নেলিউসের সঙ্গে ও যারা তাঁর সঙ্গে কায়েসারিয়ায় সম্মিলিত ছিল তাদেরও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও পরে বিজাতীয়দের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী বিষয়ে সহভাগিতা করতে উদ্যত ছিলেন, তখন তিনি আকাশ থেকে 'তার চার কোণ ধরে নামিয়ে দেওয়া একটা চাদর নামতে' দেখেছিলেন যার মধ্যে *পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী ও সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি* [ঙ] ছিল। পরে তাঁকে উঠতে, সেগুলো জবাই করতে ও খেতে আজ্ঞা দেওয়া হয়। আর যখন তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন, '*[আপনি তো জানেন যে] অপবিত্র বা অশুচি কোন কিছু কখনও আমার মুখের ভিতরে যায়নি*'[চ], তখন তাঁকে কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি না বলতে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল কেননা ঈশ্বর দ্বারা যা শুচি করা হয় তা পিতর দ্বারা

অপবিত্র বলে গণ্য হতে নেই [ছ]। বচনটা এরূপ, *ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না* [জ]। ফলে, যখন শুচি বা অশুচি যে খাদ্য মোশির বিধান অনুসারে বহু বহু পশুর নাম দ্বারা পৃথক বলে চিহ্নিত ও যুক্তি-বিশিষ্ট প্রাণীদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের সঙ্গে তুলনামূলক সম্পর্কে যুক্ত, তখন সেই খাদ্য বিষয়ে বিধান এটা শেখায় যে, কোন কোন খাদ্য আমাদের পক্ষে উপযোগী কিন্তু অন্য অন্য খাদ্য বিপরীত গুণের অধিকারী, যতক্ষণ না ঈশ্বর নিজে সবগুলোকে, এমনকি '*সব ধরনের*'[ঝ] যাবতীয় খাদ্যও শুচি করেন ও পুষ্টিকর করে তোলেন।

'আজ'

১৩। তাই ব্যাপারটা যখন তেমনটা হয় ও যখন নানা ধরনের খাদ্য থাকে, তখন উপরোল্লিখিত যত খাদ্যের উপরে একটাই রয়েছে তথা সেই 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি' যা বিষয়ে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা সেটার যোগ্য হয়ে উঠি ও সেই বাণী দ্বারা পুষ্টিলাভ করি যিনি *আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন* [ক] ও ফলত আমরা নিজেরা ঐশ্বরিক হয়ে উঠি।

কেউ না কেউ বলতে পারবে যে, সেই 'এপিউসিয়োন' [ἐπιούσιον] শব্দটা 'এপিএনাই' [ἐπιεναι, অর্থাৎ 'আসন্ন'] শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার জন্য আমাদের আসন্ন যুগের জন্য উপযোগী রুটি যাচনা করতে আজ্ঞা দেওয়া হয় যাতে ঈশ্বর অগ্রিম হিসাবেই যেন এখনই তেমন রুটি আমাদের মঞ্জুর করেন; ফলে, যে রুটি আগামীকাল দেওয়ার কথা, তা, বলতে গেলে, 'আজ' আমাদের দেওয়া হয়, কেননা 'আজ' মানে বর্তমানকাল, ও আগামীকাল মানে আসন্ন কাল। যদিও আমার মতে আগেকার ব্যাখ্যা এটার চেয়ে ভাল, তবু এসো, সেই 'আজ' যা এই পদে মথিতে উল্লিখিত কিন্তু লুকে 'প্রতিদিন' বলে উল্লিখিত, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এগিয়ে যাই। শাস্ত্রে এটাই সাধারণ যে, গোটা এক যুগ প্রায়ই 'আজ' বলে চিহ্নিত; যেমন '*মোয়াব আজও মোয়াবীয়দের আদিপিতা*'[খ] ও '*সে আজও আমোনীয়দের আদিপিতা*'[গ] ও '*আজ পর্যন্ত এটিই হল ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত গল্প*'[ঘ] ও সামসঙ্গীত-মালায়, '*তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তাহলে হৃদয় কঠিন করো না*'[ঙ]। বিষয়টা যোশুয়া পুস্তকে খুবই স্পষ্ট, যেখানে লেখা আছে, '*আজ প্রভুর প্রতি বিদ্রোহ করো না*'[চ]। তাই যখন 'আজ' হলো এই গোটা যুগ, তখন

‘গতকাল’ কি অতীত যুগ হয় না? আমি বুঝেছি, সামসঙ্গীত-মালায় ও হিব্রুদের কাছে পলের পত্রে এটাই ‘গতকালের’ অর্থ। সামসঙ্গীত-মালায় উক্তি এরূপ, *তোমার চোখে সহস্র বছর সেই গতকালেরই মত যা বয়ে গেল* (ছ)। সম্ভবত এটা হলো সেই বিখ্যাত সহস্রবর্ষকাল (জ) ‘গতকালের’ সঙ্গে যার তুলনা করা হয় ও যা ‘আজ’ থেকে ভিন্ন। প্রেরিতদূতের পত্রে লেখা আছে, *যিশুখ্রিষ্ট এক-ই আছেন—গতকাল, আজ ও যুগ যুগ ধরে* (ঝ)। গোটা এক যুগ যে ঈশ্বরের কাছে এই আমাদের দিনগুলোর একদিন-কাল মাত্র বলে গণ্য, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, এমনকি, আমার মতে তা সেটার চেয়েও কম বলে গণ্য।

[১৪] আমাদের এবিষয়েও অনসন্ধান করতে হবে, তথা, দিন বা মাস বা কাল বা বছর অনুযায়ী উদ্‌যাপিত পর্বোৎসব বা সম্মেলনসমূহ ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত, সেই শব্দগুলো যুগের বেলায় প্রযোজ্য কিনা। কেননা যখন *বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী* (ক), তখন বিধানের বহুসংখ্যক সাব্বাৎগুলো অবশ্যই বহুসংখ্যক দিনগুলোর ‘ছায়া’ মাত্র, এবং অমাবস্যাসমূহ নানা কাল অনুযায়ী স্থিরীকৃত ও কোন একটা সূর্যের সঙ্গে কোন না কোন চন্দ্রের গ্রহণের ফলাফল। আর যখন আদি মাস, তার দশম দিন থেকে তার চতুর্দশ দিন পর্যন্ত (খ) এবং খামিরবিহীন রুটি পর্ব, সেই মাসের চতুর্দশ দিন থেকে একবিংশ দিন পর্যন্ত (গ), ‘*কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী*’ হয়, তখন কেইবা এমন ‘*প্রজ্ঞাবান*’ বা এমন ‘*ঈশ্বরবন্ধু*’(ঘ) যে বুঝতে পারবে কতিপয় মাসের মধ্যে কোন্‌টা আদি মাস ও কোন্‌টাই সেটার দশম দিন, ইত্যাদি বিষয়? এবং সেই সপ্ত সপ্তাহ পর্ব ও সপ্তম সপ্তাহ পর্ব (ঙ), সেই অমাবস্যা যার দিন তুরিধ্বনির দিন ও যার দশম দিন হলো প্রায়শ্চিত্ত-দিবস (চ), সেসম্পর্কে আমি কী বলব? এসমস্ত কিছু কেবল সেই ঈশ্বরেরই জ্ঞাত বিষয় যিনি সেগুলো বিষয়ে নিয়মবিধি স্থির করলেন। কেইবা খ্রিষ্টের মন এমনভাবে উপলব্ধি করেছে যার জন্য সে প্রতিটি সপ্তম বছরে হিব্রু গৃহ-দাসদের মুক্তিদান ও ঋণক্ষমা ও ভূমি-বিশ্রাম (ছ) উপযুক্তভাবে বুঝতে সক্ষম? এমনকি সপ্ত-বর্ষ পর্বের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ সেই পঞ্চাশত্তমী পর্বও রয়েছে (জ)। এসমস্ত কিছুতে যে কতখানি মহৎ ও সত্য নিয়মবিধি পূর্ণ হয়, তা স্পষ্টভাবে কল্পনা করার মত এমন কেউ নেই, সেই ব্যক্তি বাদে যে পিতার *দুর্জ্ঞেয় বিচার ও সন্ধানের*

অতীত *কর্মপথ* [ঝ] অনুসারে সমস্ত যুগের অনুক্রমবিধি ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাকে নিজের মনশ্চক্ষুতে দর্শন করেছে।

[১৫] আমি প্রেরিতদূতের দু'টো পদ তুলনা করার চেষ্টায় বারে বারে বিহ্বল হয়েছি, অর্থাৎ, যখন এযুগের পরে অন্য অন্য যুগ চলতে থাকবে, তখন কেমন করে যুগগুলোর একটা সিদ্ধিকাল থাকতে পারে যে কালে যিশু পাপ বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন? পদ দু'টো এ: হিব্রুদের কাছে পত্রে, *তিনি একবার মাত্র, এখন, সকল যুগের এই সিদ্ধিকালেই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাপ বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন* [ক]; এবং এফেসীয়দের কাছে পত্রে, '[তিনি তেমনটি করলেন] *যেন আসন্ন যুগগুলোতে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন*'[খ]। তত মহৎ বিষয় সম্পর্কে, আন্দাজেই আমার ধারণা হলো যে, যেমন বছরের সিদ্ধিকাল হলো বছরের সেই শেষ মাস, যে মাসের পরে নতুন এক মাসের আরম্ভ হয়, তেমনি, হয় তো, বহু যুগ এমন যুগ-বর্ষ সম্পন্ন করে যেটার সিদ্ধি হলো এই চলতি যুগ যেটার পরে আসন্ন যুগগুলো উৎপন্ন হবে যেগুলোর আরম্ভ হলো আসন্ন যুগ, এবং সেই আসন্ন যুগগুলোতে ঈশ্বর নিজের মঙ্গলময়তার মাধ্যমে নিজের অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাবেন। সবচেয়ে খারাপ সেই যে পাপী *পবিত্র আত্মার নিন্দা করেছে* [গ] ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা বর্তমানকাল ধরে নিজের পাপে আবদ্ধ রয়েছে, এসবকিছুর পরে সে কেমন বিচারে বিচারিত হবে, তা আমি জানি না।

[১৬] তাই যখন কেউ না কেউ এসমস্ত বিষয় ভাবে, এক প্রকার পবিত্র সাব্বাতের [ক] দর্শন পাবার লক্ষ্যে যুগ-সপ্তাহ উপলব্ধি করে, ঈশ্বরের পবিত্র অমাবস্যা উপলব্ধি করার লক্ষ্যে মাস-সপ্তাহে, ও বর্ষের সেই পর্বগুলো বুঝবার লক্ষ্যে যুগ-বর্ষে নিজের মন স্থিতমূল করে, সেই যে পর্বগুলোতে *প্রতিটি পুরুষ ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে হাজির হতে বাধ্য* [খ], এবং সেই পবিত্র সপ্তম বর্ষ ও যুগ-সাতবার-সপ্তবর্ষ বুঝবার লক্ষ্যে একইভাবে ততসংখ্যক যুগ-বর্ষগুলোতে নিজের মন স্থিতমূল করে, তখন সেই ব্যক্তি এরূপ অধ্যয়নের মাধ্যমে তেমন মহান বিধানকর্তার উদ্দেশে স্তুতিগান নিবেদন করে। তবে কেমন করে এক ব্যক্তি তেমন যোগ্য যুগের দিনের একটামাত্র ঘণ্টার ক্ষুদ্রতম ক্ষণও অমূল্যায়ন করতে পারে? সে কেমন করে তার সাধ্যমত সবকিছুই করতে সচেষ্ট হবে না

যাতে এখানে, এই প্রস্তুতির পরে, সে, যে দিন 'আজ' ও 'প্রতিদিন'ও বলে অভিহিত সেই দিনে সেই 'এপিউসিয়োন' (তথা সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়) রুটি পাবার যোগ্য হতে পারে? যা কিছু ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, তা থেকে 'প্রতিদিন' শব্দ যে কী অর্থ বহন করে, তা তো স্পষ্ট। কেননা, অনন্তত্ব থেকে অনন্তত্ব পর্যন্ত বিরাজমান যিনি, যে কেউ সেই ঈশ্বরের কাছে কেবল 'আজ' এর জন্য নয় কিন্তু কোন ভাবে যা 'প্রতিদিন' প্রয়োজন সেটারও জন্য প্রার্থনা করে, *যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু* [গ] মঞ্জুর করতে সক্ষম, সে তাঁর কাছ থেকে তাও পেতে পারবে যা, অত্যুক্তি ব্যবহার করতে গেলে, '*কোন চোখ যা যা দেখেনি*' সেটারও অতীত, ও '*কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি*'[ঘ] সেটারও অতীত।

[১৭] এসমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করা আমার মতে অধিক প্রয়োজন ছিল যাতে আমরা যখন প্রার্থনা করি যেন প্রভুর পিতা দ্বারা আমাদের সেই "এপিউসিয়োস" [তথা সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়] রুটি দেওয়া হয়, তখন যেন সেই 'আজ' ও 'প্রতিদিন' শব্দ দু'টো বুঝতে পারতাম। আর যখন শেষ পুস্তক [অর্থাৎ এক্ষেত্রে, লুকের সুসমাচার] অনুসারে আমরা 'আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি দান কর' নয়, কিন্তু 'আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি প্রতিদিন আমাদের দাও' বলে থাকি, তখন আমরা যদি আমাদের অনুসন্ধান আরও গভীরে চালিয়ে "আমাদের" [শব্দটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, তাহলে, এই রুটি যে কেমন করে "আমাদের", এটাও অনুসন্ধানের বিষয় হয়। তথাপি প্রেরিতদূত আমাদের এ শিক্ষা দেন যে, *জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমানকালীন বা আসন্ন যাই কিছু হোক* [ক] সবই পবিত্রজনদেরই। কিন্তু আপাতত এবিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই।

'আমাদের ঋণ ক্ষমা কর'

২৮। [১] '*এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি*', অথবা, লুকের পাঠ্য অনুসারে, '*এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমরা নিজেরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করেছি*'[ক]। ঋণ সম্পর্কে প্রেরিতদূতও বলেন, '*যার যা প্রাপ্য, তাকে সেই ঋণ শোধ কর: যাঁকে কর দিতে হয়, তাঁকে কর দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, তাঁকে ভয় কর; যাঁকে শুল্ক দিতে*

হয়, তাঁকে শুল্ক দাও; যাঁকে সম্মান করতে হয়, তাঁকে সম্মান কর। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না'[খ]। সুতরাং আমরা ঋণী, আর দেনা ক্ষেত্রেই শুধু নয়, কথনে শালীনতা ও নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনেও আমাদের নানা পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্যদের প্রতি বিশেষ এক প্রকার মনোভাব রাখা ক্ষেত্রেও আমরা ঋণী। তেমন ঋণগুলো বিষয়ে ঋণী হওয়ায়, হয় আমরা ঐশবিধানে যা আদিষ্ট তা পূরণ করায় সেই সমস্ত ঋণ শোধ করি, না হয় কল্যাণকর ঐশবাণীকে অবজ্ঞা করায় শোধ করি না, ও সেইভাবে ঋণী হয়ে থাকি।

[২] ঋণ ক্ষেত্রে একই ধরনের মনোভাবের অধিকারী হতে হবে আমাদের ভাইদের প্রতি, তারাই হোক যারা প্রকৃত ধর্মের বাণী অনুসারে আমাদের সঙ্গে খ্রিষ্টে নবজন্ম লাভ করেছে, অথবা তারাই হোক যারা আমাদের সঙ্গে একই পিতার বা মাতার অংশী। সহনাগরিকদেরও প্রতি ও সকল মানুষেরও প্রতি সাধারণ ঋণ রয়েছে; বিদেশীদের প্রতিও বিশেষ এক ঋণ রয়েছে ও তাঁদেরও প্রতি বিশেষ অন্য ঋণ রয়েছে যাঁরা বয়সের ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের পিতা হতে পারেন, এবং তাঁদেরও প্রতি বিশেষ অন্য ঋণ রয়েছে, সন্তান ও ভাই রূপে যাঁদের সম্মান করা সমীচীন। সুতরাং ভাইবোনদের প্রতি দেয় ঋণ শোধ করার জন্য যা করা দরকার যে তা করে না, তেমন অবহেলার ভিত্তিতে সে ঋণী হয়ে থাকে। একই প্রকারে, অন্যান্যদের প্রতি প্রজ্ঞার মানব-মনোভাব ক্ষেত্রে যা দেওয়া কর্তব্য, তাতে আমরা অবহেলা-দোষে দোষী বলে গণ্য হলে তবে আমাদের ঋণ আরও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, নিজেদের কথা ধরতে গেলে, আমরা আমাদের দেহ ব্যবহার ক্ষেত্রে তখনই একপ্রকারে ঋণী যখন আমোদপ্রমোদ ভোগ করার লক্ষ্যে আমাদের দেহের মাংস শক্তিহীন করি; আমাদের আত্মার প্রতিও যথেষ্ট যত্নবান হওয়া ক্ষেত্রে, মনের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে পূর্বদর্শিতা রাখা ক্ষেত্রে, আমাদের কথন যেন রুষ্ট না হয় বরং উপযোগী হয় ও কখনও '*ভিত্তিহীন*'[ক] না হয়, এসমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকা ক্ষেত্রেও আমরা ঋণী। বাস্তবিকই, যতখানি আমরা আমাদের ঋণ, এমনকি আমাদের নিজেদেরও কাছে দেয় ঋণ শোধ করায় অবহেলা করি, আমাদের ঋণ ততখানি ভারী হয়ে ওঠে।

[৩] এসমস্ত ঋণ বাদে, যেহেতু আমরা '*ঈশ্বরের শিল্পকর্ম*' ও তাঁর এমন উৎকৃষ্ট '*গড়া পাত্র*'[ক] যা বাকি সমস্ত কিছু অতিক্রম করে, সেজন্য আমরা তাঁরই প্রতি বিশেষ

মনোভাব ও এমন ভালবাসা বজায় রাখতে বাধ্য যা *আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ও আমাদের সমস্ত মন দিয়ে* [খ] চিহ্নিত। তেমনটা সমুচিতভাবে করায় ব্যর্থ হলে তবে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করায় আমরা ঈশ্বরের প্রতি ঋণী থেকে যাই। আর তেমন অবস্থায় কে আমাদের জন্য প্রার্থনা করবে? বাস্তবিকই শামুয়েলের প্রথম পুস্তকে যেভাবে এলি বলেন, সেই অনুসারে *মানুষ পাপ করায় অন্য মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে তারা তার জন্য প্রার্থনা করবে; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?* [গ]। উপরন্তু, যিনি নিজ রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, আমরা সেই খ্রিষ্টের প্রতিও ঋণী ঠিক যেন প্রতিটি গৃহদাস তার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়েছে, সেই মূল্যে তার ক্রেতার প্রতি ঋণী। মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে আমরা যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত, সেই পবিত্র আত্মার প্রতিও আমরা ঋণী, তা এমন ঋণ যা *তাঁকে দুঃখ না দেওয়ায়* [ঘ] আমরা শোধ করি; আমরা তখনই তাঁকে দুঃখ দিই না যখন আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ফল বহন করি, যেহেতু তিনি আমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করেন [ঙ]। আর যদিও আমরা সঠিকভাবে জানি না কোন্ দূত আমাদের এক একজনের জন্য নিযুক্ত আছেন—তিনি *অনুক্ষণ স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখের দর্শনে রত* [চ]—তবু বিচার-বিবেচনা করলে একথা স্পষ্ট যে, কোন না কোন বিষয়ে আমরা তাঁর প্রতি ঋণী। আর যখন আমরা ‘*দূত ও মানুষের মঞ্চ*’ স্বরূপ এজগতে [ছ] রয়েছি , সেজন্য আমাদের এমনটা জানা উচিত যে, মঞ্চে যেমন প্রতিটি ব্যক্তি দর্শকদের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কিছু না কিছু বলতে বা করতে বাধ্য, ও তেমনটা করায় ব্যর্থ হলে সে সকল দর্শকদের অপমান করেছে বিধায় শাস্তি পায়, তেমনি আমরা ইচ্ছুক হলে প্রজ্ঞা থেকে যা কিছু শিখব, সেই ক্ষেত্রেও আমরা গোটা জগতের কাছে, সকল দূতদের কাছে ও মানবজাতির কাছেও ঋণী।

[৪] এসমস্ত সাধারণ দায়িত্ব বাদে, মণ্ডলী যে বিধবার দায়িত্ব-ভার নিয়ে থাকে, সেই বিধবার একটা ঋণ আছে, পরিসেবকের অন্য ঋণ, প্রবীণের অন্য ঋণ ও বিশপের অন্য ঋণ রয়েছে যা সব ঋণের চেয়ে অধিক ভারী [ক], কেননা গোটা মণ্ডলীর স্বয়ং ত্রাণকর্তা তেমন ঋণের ব্যাপারে শোধ দাবি রাখেন, এবং বিশপ তা শোধ না করলে উপযুক্ত শাস্তির অধীন হবেন। প্রেরিতদূত উপরে ইতিমধ্যে উল্লিখিত সেই ঋণের কথা বলেন যা

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঋণ; তিনি বলেন, ‘*স্বামী নিজের স্ত্রীর ঋণ শোধ করুক; তেমনি স্ত্রীও স্বামীর ঋণ শোধ করুক*’[খ] এবং পরপর বলে চলেন, ‘*তোমরা একে অন্যকে পরিহার করো না*’[গ]। কিন্তু আমাদের সেই ঋণগুলোর পরিমাণ সম্পর্কে কথা বলা আমার কী দরকার আছে, যখন যা কিছু বলা হয়েছে এ পুস্তিকার পাঠক-পাঠিকা সেই ভিত্তিতে নিজ নিজ ঋণ সম্পর্কে নিজেরাই একটা তালিকা সঙ্কলন করতে পারে? কেননা হয় ঋণ শোধ না করলে আমাদের কারাগারে রাখা হবে, না হয় শোধ করলে আমাদের খালাস দেওয়া হবে। যাই হোক, এজীবনে রাত বা দিনের একটামাত্র ঘণ্টাও নেই যখন ঋণমুক্ত হওয়া সম্ভব।

[৫] তবে, যখন এক ব্যক্তি ঋণী, তখন সে হয় তা শোধ করে, না হয় তা শোধ করতে অস্বীকার করে। আর যেমন জীবনকালে তা শোধ করা সম্ভব, তেমনি শোধ করতে অস্বীকার করাও সম্ভব। এমন কেউ আছে যে কারও প্রতি ঋণী নয় [ক], অন্য কেউ আছে যে অধিকাংশ ঋণ শোধ করেছে বিধায় কম ঋণী, ও অন্য কেউ আছে যে অল্প কিছু শোধ করেছে বিধায় অধিকাংশেই ঋণী। আর হয় তো এমন কেউও থাকতে পারে যে কিছু শোধ না করার ফলে পুরাপুরি ঋণী। অবশ্যই, নিজেকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টায় যে সবকিছু শোধ করেছে, সে কোন এক সময়ে তাতে সফল হয়, ও তার আগেকার ঋণ ধোশ করার ব্যাপারে মাপ পাবার মত একটা সময়কাল তার দরকার আছে; ঋণ শোধ করার নির্দিষ্ট কালে শোধন না করা ঋণ থেকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে কেউ উপরোল্লিখিত লোকের মত যত সময় দরকার আছে তত সময় ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে, এক্ষেত্রে এমন আসা রাখা যেতে পারে, সে মাপ পাবার সময়কাল পাবে। কিন্তু যে সমস্ত অবৈধ কর্মকাণ্ড আমাদের নিয়ন্ত্রণকারী মনের মধ্যে চাপা রয়েছে, সেগুলোই আপনা আপনি হয়ে ওঠে *সেই লিখিত ঋণপত্র যা আমাদের প্রতিকূল* [খ] যা অনুসারে আমরা বিচারিত হব ও যা, বলতে গেলে, সকলের হাতে সাক্ষ্যরিত পুস্তকের মত তখনই উপস্থাপন করা হবে যখন আমরা সকলে *খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়* [গ]। তেমন ঋণ সম্পর্কেই প্রবচনমালায় লেখা আছে, *তুমি নিজেকে সম্মান*

করলে তবে নিজেকে পরের পক্ষে জামিন হয়ো না। কারণ তার যদি পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকে, তবে তারা গায়ের নিচ থেকে তোমার শয্যা তুলে নিয়ে যাবে (ঘ)।

[৬] আমরা যখন ততসংখ্যক মানুষের প্রতি ঋণী, তখন অন্যরাও যে আমাদের প্রতি ঋণী, তা তো অনিবার্য। আমরা মানুষ বলে সেই হিসাবে কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা নাগরিক বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা পিতা বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা সন্তান বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী; তা বাদে, আমরা স্বামী হলে তবে বধূরা আমাদের প্রতি ঋণী, এবং আমরা বন্ধু হলে তবে বন্ধুরা আমাদের প্রতি ঋণী। সুতরাং, আমাদের প্রতি সেই বহুসংখ্যক ঋণীর মধ্যে কেউ না কেউ যখন আমাদের প্রতি নিজেদের দেনা শোধ করতে তত তৎপরতা দেখায় না, তখন, আমরা আমাদের নিজেদের ঋণ, ও নিজেরা যে বহুবার অন্য মানুষদের কাছে শুধু নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও শোধ করতে তৎপরতা দেখাইনি একথা স্মরণ করে আমাদের পক্ষে তাদের প্রতি কোন ক্ষোভ না রেখে বরং আরও বেশি মানবতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যে সমস্ত ঋণ আমরা শোধ করিনি, এমনকি যখন আমাদের প্রতিবেশীর জন্য কোন না কোন কিছু করার সময় এসেছিল তখন আমরা যে ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করেছি, তা যদি স্মরণ করি, তাহলে যারা আমাদের কাছে ঋণী হয়ে সেই ঋণ শোধ করেনি, আমরা তাদের প্রতি আরও কোমল ভাবে ব্যবহার করব। একথা বিশেষ ভাবে উপযুক্ত আমরা যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের যে অপরাধ, ও সত্য না জেনেই হোক কি আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে হোক আমরা 'উঁচুস্থান থেকেই' যেন যে *অধর্মের কথা উচ্চারণ করেছি* (ক) তা ভুলে না যাই।

[৭] কিন্তু আমাদের প্রতি ঋণী যারা তাদের প্রতি আমরা যদি কোমলতা দেখাতে অস্বীকার করি, তাহলে আমাদের তা-ই ভোগ করতে হবে যা সেই লোক ভোগ করেছিল যে নিজের সহদাসের একশ' টাকা ঋণ ক্ষমা করে দিতে অস্বীকার করেছিল।

যদিও সুসমাচারের উপমা অনুসারে তাকে আগে ক্ষমা করা হয়েছিল তবুও আগে যা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তা আবার দাবি করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, '*হে ধূর্ত ও অলস দাস, আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি তোমারও কি দয়া দেখানো উচিত ছিল না? তাকে*

কারাগারে ফেলে দাও যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না করে’[ক]। এবং প্রভু বলে চলেছিলেন, ‘*আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর*’[খ]। আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে যারা, তারা যখন বলে তারা মনপরিবর্তন করে, এমনকি আমাদের প্রতি ঋণী যারা, তারা সেইভাবে বহুবার ব্যবহার করলেও, তখন অবশ্যই তাদের ক্ষমা করা উচিত। কেননা তিনি বলেন, ‘*তোমার ভাই যদি দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি মনপরিবর্তন করছি, তুমি তাকে ক্ষমা করবে*’[গ]। যারা মনপরিবর্তন করে না, তাদের প্রতি যেন কঠোর না হই, কেননা তারাই নিজেদেরই ক্ষতি করে, কারণ *শাসন যে অবহেলা করে, সে নিজেকে ঘৃণা করে* [ঘ]। বরং যারা এতই বিকৃতমনা যে নিজেদের পতন দেখতে অক্ষম ও অনিষ্টের অন্ধকার জনিত এমন মাতলামিতেই মাতাল যা আঙুররসের চেয়েও মারাত্মক, তেমন লোকদের নিরাময় করার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

[৮] যখন লুক বলেন, ‘আমাদের পাপ ক্ষমা কর’ (কেননা পাপ আমাদের শোধ না করা ঋণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত), তখন মথি যা বলেন, তিনি একই কথা বলেন; কিন্তু যে কেউ ঋণীদের তখনই মাত্র ক্ষমা করতে ইচ্ছা করে যখন তারা মনপরিবর্তন করে, এমনটা মনে হয় যে লুক তেমন লোকদের জন্য স্থান দেন না, কেননা তিনি বলেন, ত্রাণকর্তা এমন নির্দেশ করেন যেন আমরা আমাদের প্রার্থনায় এটাও যোগ করি, তথা, *কারণ আমরা নিজেরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি* [ক]। আমাদের বিরুদ্ধে কৃত পাপ ক্ষমা করার অধিকার আমাদের সকলেরই রয়েছে, যেভাবে এ বাণীতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি* [খ] ও ‘কারণ আমরা নিজেরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি’। কিন্তু যিশু দ্বারা যে সেইভাবে অনুপ্রাণিত যেভাবে প্রেরিতদূতেরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ও নিজের ফল দ্বারা [গ] যার বিষয়ে জানা যেতে পারে সে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছে ও বাণী যা যা নির্দেশ করেন সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদনে ‘*ঈশ্বরের পুত্র রূপে [পবিত্র] আত্মা দ্বারা চালিত*’ বিধায় ‘*আত্মিক*’ হয়ে উঠেছে [ঘ], ঈশ্বর যা কিছু ক্ষমা করেন, সে তা ক্ষমা করে, ও যে পাপ নিরাময় করা যায় না, সে তা ধরে রাখে [ঙ]; এবং

সেই অনুসারে, নবীরা যেমন নিজেদের বাণী নয় কিন্তু ঐশ ইচ্ছারই বাণী উচ্চারণ করায় ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন, তেমনি সেও সেই ঈশ্বরের সেবা করে যিনি একাই ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।

[৯] এবং যোহন অনুসারে সুসমাচারে, প্রেরিতদূতদের দেওয়া ক্ষমা সংক্রান্ত বাণী এরূপ, *পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে* (ক)। যে কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এই বাক্য ধরত, সে প্রেরিতদূতদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারত যে, যারা ক্ষমা পেতে পারত প্রেরিতদূতেরা তাদের সকলকে ক্ষমা করেননি, কিন্তু তাঁরা কারও কারও পাপ এজন্যই ধরে রেখেছিলেন যাতে সেই পাপগুলো প্রেরিতদূতদের কারণেই ঈশ্বর দ্বারা ধরে রাখা হয়। মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দ্বারা মানব-পাপের ক্ষমা বুঝবার জন্য বিধান থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া উপযোগী হতে পারে। তাদের অন্যায় যেন ক্ষমা করা হয় হত যাদের জন্য যজ্ঞ উৎসর্গ করা হত, বিধান অনুসারে, কোন না কোন পাপ ক্ষেত্রে যজ্ঞ উৎসর্গ করা যাজকদের পক্ষে নিষেধ ছিল; আর যদিও অনিচ্ছাকৃত কোন না কোন পাপ বা অন্যায় ক্ষেত্রে যাজক যজ্ঞ উৎসর্গ করার অধিকার রাখত, তবু সেই যাজক ব্যভিচার বা ইচ্ছাকৃত নরহত্যা বা গুরুতর অন্যায় ক্ষেত্রে *আহুতি-বলি ও পাপার্থে বলিদান* (খ) উৎসর্গ করত না। একই প্রকারে প্রেরিতদূতেরা ও প্রেরিতদূতদের সদৃশ যাঁরা, তাঁরা মহাযাজকত্বের রীতি অনুসারে যাজক হওয়ায় ঈশ্বরের নিরাময়-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলেন ও যেহেতু তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন, সেজন্য তাঁরা জানেন কোন্ পাপের ক্ষেত্রে, কবে ও কীভাবে তাঁদের যজ্ঞ উৎসর্গ করা উচিত; এবং কোন্ পাপের ক্ষেত্রে তাঁদের তেমনটা করা উচিত নয়, তাও তাঁরা জানেন। তাই নিজের ছেলেরা সেই হফ্নি ও ফিনেয়াস যে পাপিষ্ঠ মানুষ, একথা জেনে, ও তাদের পাপের ক্ষমার লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করতে নিজের অক্ষমতা অনুভব ক'রে যাজক এলি তেমন ব্যাপারে নিজের নিরাশা স্বীকার করে বলেছিলেন, '*মানুষ পাপ করায় অন্য মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে তারা তার জন্য প্রার্থনা করবে; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?*'(গ)।

[১০] আমি বুঝতে পারি না কেমন করে এমন কেউ আছে যারা এমন অধিকার নিজেদের উপর আরোপ করেছে যা যাজকীয় মর্যাদার অতীত; হয় তো তারা যাজকত্ব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী নয়। যাই হোক, ওরা প্রতিমাপূজা মাপ করার এবং ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন সংগম ক্ষমা করার নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে বড়াই করে, কেমন যেন যারা তেমন কর্ম করার দুঃসাহস করেছে, তাদের হয়ে নিজেদের প্রার্থনা দ্বারা তেমন মৃত্যুজনক পাপ ক্ষমা করা যেতে পারত [ক]। কারণ ওরা এই পাঠ্য পড়ে না যে, *মৃত্যুজনক একটা পাপ আছে, সেটার বিষয়ে তো আমি অনুরোধ রাখতে বলছি না* [খ]। সেই অধিক সৎসাহসী যোব সম্পর্কেও আমাদের নীরব থাকা উচিত নয়, যিনি নিজের ছেলেদের খাতিরে এই বলে যজ্ঞ উৎসর্গ করেছিলেন, ‘*কী জানি, আমার ছেলেরা মনে মনে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ মন্দ কিছু চিন্তা করেছে*’[গ]। পাপ সাধিত হয়েছে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও ও সেই পাপ তাদের ওষ্ঠেরও নাগাল না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি যজ্ঞ উৎসর্গ করতেন।

‘আমাদের পরীক্ষায় এনো না’

২৯। [১] ‘*আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না, কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর।*’ ‘কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর’ বাক্যটা লুকে বর্জিত [ক]। যদি ত্রাণকর্তা অসম্ভব কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আজ্ঞা করেন, তাহলে যখন গোটা মানব জীবন হলো পরীক্ষা-কাল স্বরূপ, তখন আমি এমনটা জিজ্ঞাসা করা উপযোগী বলে মনে করি কেনই বা পরীক্ষায় না পড়তে প্রার্থনা করার জন্য তিনি আমাদের নির্দেশ দেন। আমরা ঠিক এই কারণেই পরীক্ষায় রয়েছি যেহেতু পৃথিবীতে থাকতে আমরা “*[পবিত্র] আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত*” এমন “*মাংস*” দ্বারা “*পরিবেষ্টিত*”, যার “*মন ঈশ্বরের বিধানের অধীনস্থ হতে আদৌ অক্ষম*” বিধায় “*ঈশ্বরের বিরোধী*”[খ]।

[২] পৃথিবীতে গোটা মানব-জীবন যে একটা পরীক্ষা-কাল স্বরূপ, তা আমরা যোবের কাছ থেকে শিখি; তিনি বলেন, ‘*পৃথিবীতে মানুষের জীবন কি একটা পরীক্ষা-কাল স্বরূপ নয়?*’[ক]। ১৭ নং সামসঙ্গীত একই কথা বলে, *তোমাতেই আমি পরীক্ষা থেকে নিস্তার পাব* [খ]। একই প্রকারে, করিন্থীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে পল এমনটা বলেন না যে তারা পরীক্ষিত হবে না, কিন্তু এ বলেন যে, ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন যেন তারা

শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষিত না হয়; তাঁর কথা এরূপ, *এতক্ষণে তোমাদের প্রতি এমন পরীক্ষা ঘটেনি, যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন* (গ)। কেননা আমরা যে '*সংগ্রামে*' সংগ্রামরত, সেই '*সংগ্রাম*' হোক সেই মাংসের সঙ্গে যা কামনা-বাসনা করে ও *[পবিত্র] আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে* (ঘ) বা সেই '*সংগ্রাম*' হোক সেই *সমস্ত মাংসের আত্মার সঙ্গে* (ঙ) যা সেই নিয়ন্ত্রণকারী মনের সমার্থক শব্দ যা দেহে স্থিত ও 'হৃদয়' বলে অভিহিত, সেই 'সংগ্রাম' যেই ধরনের হোক না কেন, সংগ্রাম'টা মানব-পরীক্ষায় পরীক্ষিত লোকদের জন্য নিরূপিত; অথবা আমরা যে লড়াইতে লড়াই করছি, সেই লড়াই হোক '*সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে ও স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে*'(চ), আর আমরা এমন প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত যোদ্ধার মত লড়াই করি না কেন যারা '*রক্তমাংসের সঙ্গে আর লড়াই করে না*'(ছ) ও মানব-পরীক্ষার প্রতি যাদের আর কোন আগ্রহ নেই যেহেতু সেই সমস্ত কিছু পায়ে মাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (জ), এসমস্ত কিছুর শেষ কথা হলো যে, আমরা পরীক্ষা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নই।

[৩] তবে যখন ঈশ্বর কোন না কোন ভাবে প্রত্যেককে পরীক্ষা করেন, তখন এ কেমন হতে পারে যে ত্রাণকর্তা নির্দেশ করেন আমরা যেন পরীক্ষায় না পড়তে প্রার্থনা করি? কেননা যুদিথ কেবল সেকালের প্রবীণবর্গের উদ্দেশ ক'রে নয়, কিন্তু যারা তাঁর পুস্তক পড়ে তাদের সকলেরও উদ্দেশ করে বলেন '*আব্রাহামের প্রতি তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন, ইসহাককে কেমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, মামা লাবানের মেষপাল চরাবার সময়ে সিরিয়ার মেসোপতামিয়ায় যাকোবের প্রতি যে কীনা ঘটেছে—এই সমস্ত কথা স্মরণ করুন। কেননা তিনি যেমন তাঁদের হৃদয় যাচাই করার জন্যই তাঁদের বেলায় তেমন হাপর নিরূপণ করেছিলেন, তেমনি এখন এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন না; এই সমস্ত কিছুর লক্ষ্য হল সংশোধন, কেননা তাঁর কাছের মানুষ যারা, প্রভু তাদের আঘাত করেন*'(ক)। এবং দাউদ সাধারণ অর্থে দেখান যে, এসমস্ত কিছু সকল ধার্মিকের বেলায় সত্য; তিনি বলেন, '*ধার্মিকের অনেক ক্লেশ*

আছে’[খ]; এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে প্রেরিতদূত বলেন, ‘*ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে*’[গ]।

[৪] আর আমরা সেটা যদি না বুঝি যা অনেকে পরীক্ষায় না পড়া সংক্রান্ত প্রার্থনা ক্ষেত্রে লক্ষ করে না, তাহলে আমাদের এমনটা বলতে হত যে, প্রেরিতদূতেরা যখন প্রার্থনা করতেন তখন তাঁদের কথা শোনা হত না। কেননা তাঁরা জীবনকাল ধরেই বহু ক্লেশ ভোগ করেছিলেন, *পরিশ্রমে অনেক বেশি, কারাবন্ধনে অনেক বেশি, প্রহারে অনেক বেশি, প্রাণ-সঙ্কটে অনেকবার* [ক]। কেবল সেই পলের কথা ধরলে তিনি ইহুদীদের হাতে ‘*পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড*’ ভোগ করেছিলেন, তিনবার বেত্রাঘাতে আঘাতগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁকে একবার পাথর ছুড়ে মারা হয়েছিল, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছিলেন, অতল গহ্বরের উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছিলেন [খ]। তিনি এমন মানুষ যাঁকে ‘*পদে পদে*’ ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল, যিনি দিশেহারা বোধ করেছিলেন, নির্যাতিত হয়েছিলেন ও যাঁকে আঘাত করা হয়েছিল [গ], কিন্তু তবুও তিনি স্বীকার করলেন, ‘*এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি*’[ঘ]। প্রেরিতদূতেরা যা বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন যখন তাতে সাড়া পাননি, তখন তাঁদের তুলনায় নিম্নতর যেকোন ব্যক্তি যখন প্রার্থনা করে, ঈশ্বর যে তার কথা শুনবেন তাতে কী আশা আছে?

[৫] যারা ত্রাণকর্তার আজ্ঞার অভিপ্রায় সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে না, তারা *আমাকে পরীক্ষা কর, প্রভু, আমাকে যাচাই কর, আগুনে শোধন কর আমার অন্তর, আমার হৃদয়* [ক] ২৬ নং সামসঙ্গীতের এই বচন ভিত্তি ক’রে তারা সহজে এমনটা ধরে নিতে পারবে যে, প্রার্থনা বিষয়ে আমাদের প্রভু যা শিখিয়েছেন, তার চেয়ে বচনটা একেবারে বিপরীত কথা উপস্থাপন করে। কিন্তু নিজের জানামতে পরীক্ষার মোট সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে, একথা জানা সত্ত্বেও কেইবা কখনও এমনটা ভাবল যে, সে নিজের পরীক্ষার পরিসীমা অতিক্রম করেছে? এবং কোন্ অবস্থা-পরিস্থিতেই বা একজন এবিষয়ে আস্থাবান হবে যে, পাপ না করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার তার আর কোন দরকার হয় না?

সে কি গরিব? তার পক্ষে চুরি না করা ও ঈশ্বরের নামের দিব্যি দিয়ে শপথ না করা বিষয়ে [খ] সতর্ক থাকা উচিত। সে কি ধনী? সে অবজ্ঞা না করুক, কেননা সে *মিথ্যায় ভরা হয়ে* ও গর্বস্ফীত হয়ে বলতে পারে *কে আমাকে দেখতে পায়?* [গ]। যিনি *বচনে জ্ঞানে সব দিক দিয়েই ধনবান* [ঘ] ছিলেন, সেই পলও এবিষয়ে দর্প করায় পাপ করার বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত দর্প করা থেকে তাঁকে দূরে রাখার জন্য তাঁর পক্ষে দরকার হয়েছিল, শয়তানের কাঁটা তাঁকে ঘুষি মারবে [ঙ]। আর যদিও এক ব্যক্তি সদ্বিবেকের অধিকারী হত ও অনিষ্ট থেকে উড়ে যেত, তবু বংশাবলিতে হেজেকিয়া সম্পর্কে যা লেখা আছে, সেই কথা তার পড়া উচিত হত। কেননা লেখা আছে, *তাঁর হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছিল* বিধায়ই তাঁর পতন হয়েছিল [চ]।

[৬] আর যেহেতু দীনদরিদ্র মানুষের সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলিনি, সেজন্য যদি কেউ এমনটা ভাবে যে, দীনদরিদ্রের জন্য আদৌ কোন পরীক্ষা নেই, তাহলে তার এ জানা উচিত যে, সেই চক্রান্তকারী *দীনহীন* ও *নিঃস্বকে ভূলুণ্ঠিত* [ক] করার জন্য চক্রান্ত করছে, বিশেষভাবে একারণে যে, শলোমন অনুসারে *দরিদ্র হুমকির সামনে দাঁড়াতে অক্ষম* [খ]। এবং পার্থিব ঐশ্বর্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না করার ফলে যে বহু মানুষ সুসমাচারের সেই ধনী লোকের [গ] পাশাপাশি হয়ে শাস্তির স্থান পেয়েছে, একথা বলা কী দরকার আছে? এবং পবিত্রজনদের পক্ষে যা সমুচিত আচরণ [ঘ], তার চেয়ে নীচতর ও অযোগ্যতর ভাবে ব্যবহার ক'রে নিজেদের দরিদ্রতা হীনতর ভাবে বহন করায় কত মানুষ তাদের *স্বর্গের প্রত্যাশা* [ঙ] থেকে সরে পড়েছে? যারা ঐশ্বর্য ও দরিদ্রতার এই চূড়ান্ত সীমার মধ্যস্থানে রয়েছে, তারাও তাদের মাঝারি সম্পদের ভিত্তিতে পাপ এড়ায় না।

[৭] কিন্তু দেহে স্বাস্থ্যবান ও বলবান ব্যক্তিও সময় সময় এমনটা ধরে নিতে পারে, কেবল নিজের সুস্থতা ও বলের জোরেই সে যেকোন পরীক্ষা থেকে মুক্ত। অথচ স্বাস্থ্যবান ও বলবান যারা, তাদের চেয়ে আর কেই বা আছে যে *ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করার* [ক] পাপে বেশি প্রবণ? কেননা পদের অর্থ সকলের কাছে এতই স্পষ্ট যে, সেবিষয়ে কেউই কিছু বলতে সাহস পায় না। আর পীড়িত অবস্থায় শুয়ে কেইবা ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করার প্ররোচনা এড়িয়েছে যখন সেসময় সে তত অলস অবস্থায় থাকায় অশুচিতা বিষয়ে

কুচিন্তা করার জন্য অধিক প্রবণ? আরও, সে যদি *নিজের হৃদয়ের উপর সযত্নে দৃষ্টি না রাখে* [খ], তাহলে সে সেই কুচিন্তা বাদে যে আরও কতই না ভিন্ন ধরনের কষ্ট ভুগতে পারে, সেসম্পর্কেও কথা বলা কি দরকার আছে? কেননা এমনটা দেখা যায় যে, যারা কষ্টে পরাভূত হয় ও অসুস্থতাকে সাহসের সঙ্গে বহন করতে জানে না, তারা অনেকেই দেহের চেয়ে আত্মায়ই পীড়িত। এমনকি, অপমান এড়াবার লক্ষ্যে খ্রিষ্টের নাম মর্যাদার সঙ্গে বহন করতে লজ্জাবোধ ক'রে অনেকে অনন্ত লজ্জায় পতিত হয়েছে।

[৮] কেউ না কেউ এমনটা ভাবতে পারবে যে, সে যখন লোকদের দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, তখন অপরীক্ষিত অবস্থায় বিশ্রাম করতে পারে। অথচ, বহুজনের গৌরবারোপণ ক্ষেত্রে যারা গর্বোদ্ধত হয়, *তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে* [ক] বচনটা কি তাদের কাছে কঠোর নয়? এবং *আপনারা কেমন করেই বা বিশ্বাস করতে পারেন, যখন পরস্পরের গৌরব গ্রাহ্য ক'রে অনন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে যে গৌরব আসে, তার অন্বেষণ করেন না?* [খ]। বচনটাও কি ভর্ৎসনার মত শোনায় না? এবং তথাকথিত অভিজাতদের কৃত গর্বজনিত অপরাধের একটা তালিকা দেওয়া, ও তথাকথিত নিম্নজাতদেরও তোষণজনিত সেই অধীনতার একটা তালিকা দেওয়া যারা অজ্ঞতাবশত তাদেরই প্রতি অধীনতা দেখায় যাদের তারা নিজেদের চেয়ে উচ্চ মনে করে, তেমন তালিকা দেওয়াও আমার কি দরকার আছে? বস্তুত তেমন অধীনতা ঈশ্বর থেকে তাদের পৃথক করে যারা সেই প্রকৃত বন্ধুত্বের ভান করে যা বিষয়ে তারা অভাবী ও যা মানব সম্পদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদ।

[৯] অতএব, আগে যেমন বলেছি, *পৃথিবীতে মানুষের জীবন পরীক্ষা স্বরূপ* [ক]। তাই এসো, প্রার্থনা করি আমরা যেন পরীক্ষা থেকে রেহাই পেতে পারি; আমরা যেন পরীক্ষিত না হই এজন্য নয় (কেননা যারা পৃথিবীতে রয়েছে বিশেষভাবে তাদেরই পক্ষে অপরীক্ষিত থাকা সম্ভব নয়), বরং যেন আমরা পরীক্ষার সময়ে পরাভূত না হই। আমি এমনটা ধরে নিচ্ছি যে, পরীক্ষিত হলে যে কেউ পরাভূত হয়, সে নিজেই পরীক্ষায় প্রবেশ করে যেহেতু সেই পরীক্ষার জালে জড়িত হয়ে যায়। তেমন জালে ত্রাণকর্তা তাদেরই খাতিরে প্রবেশ করেছিলেন যারা আগে সেই জালে ধরা পড়েছিল। পরম গীতের কথা অনুসারে সে '*জালের বুনানির ফাঁকের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে*' তাদের সাড়া দিচ্ছে যারা

আগে সেই জালে ধরা পড়েছিল ও পরীক্ষায় প্রবেশ করেছিল; ও যারা তার কনে হয়েছে সে তাদের বলে, ‘*ওঠ, কাছে চলে এসো, আমার সখী, আমার সুন্দরী, আমার কপোতী*’(খ)। মানবজাতির জন্য কোন পরিস্থিতি যে পরীক্ষামুক্ত নয়, অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে আমি এও যোগ করব যে, যে কেউ ঈশ্বরের *বিধান জপ করে নিশিদিন* (গ) ও *ধার্মিকের মুখ জপ করবে প্রজ্ঞার বাণী* (ঘ) বচনটা সার্থক করার জন্য সাধনা করে, সেও পরীক্ষামুক্ত নয়।

[১০] আমি কেনই বা সেই বহুজনেরও কথা উল্লেখ করব যারা পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকতে থাকতে বিধানে ও নবী-পুস্তকগুলোতে যা লেখা রয়েছে তার অর্থ ভুল বুঝেছে যার ফলে যা কিছু অসার ও হাস্যকর তেমন ঈশ্বরনিন্দাজনক ও ভক্তিহীন তত্ত্বে নিবিষ্ট হয়েছে? এভাবে যাদের পতন হয়েছে, তারা অনেক, যদিও এমনটা মনে হয় না যে, শাস্ত্র অবহেলার দায়ে ওদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা যায়। প্রৈরিতিক লেখাগুলো ও সুসমাচারগুলোর বহু পাঠক-পাঠিকাও একই দশার ভাগী হয়েছে, কেননা বিচার-বিবেচনার অভাবে ওরা অপর এমন পুত্র বা পিতাকে বানিয়েছে যারা সেই একমাত্রজন থেকে ভিন্ন যিনি সত্য অনুসারে গৃহীত ও পবিত্রজনদের তত্ত্বে বর্ণিত। কেননা যে কেউ ঈশ্বর বা তাঁর খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সত্য মানে না, সে ‘*সত্যকার ঈশ্বর*’ ও তাঁর ‘*একমাত্র জনিতজন*’(ক) থেকে সরে পড়েছে। যাকে সে নির্বুদ্ধিতা সহকারে বানিয়েছে ও পিতা বা পুত্র বলে মান্য করে, সে প্রকৃতপক্ষে উপাসনা করে না, ও তেমনটা এজন্য ঘটেছে যে, সে সেই পরীক্ষা চিনতে পারেনি যা পবিত্র শাস্ত্র পাঠে ওত পেতে রয়েছে, ফলে সে যে লড়াইতে নিজেকে তালিকাভুক্ত করেছে, সে সেই লড়াইয়ের জন্য অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়ায়নি।

[১১] অতএব, যেন পরীক্ষিত না হই এজন্য আমরা প্রার্থনা করব এমন নয়, কেননা তেমনটা সম্ভব নয়, কিন্তু এজন্যই প্রার্থনা করব যেন পরীক্ষার জালে ধরা না পড়ি, কারণ যারা তাতে জড়িত তাতেও পরাভূত। তাই, এই প্রার্থনার বাইরেও লেখা রয়েছে ‘*তোমরা প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়*’(ক), ও এ বচনের অর্থ সম্ভবত আগেকার আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। এবং [প্রভুর শেখানো] প্রার্থনায় আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের বলা উচিত, ‘আমাদের পরীক্ষায় এনো না’। এজন্য, যে প্রার্থনা করেনি বা যার

প্রার্থনা শোনা হয়নি, ঈশ্বর যে তাকে পরীক্ষায় আনেন সেসম্পর্কে আমাদের কী ভাবা উচিত তা দেখা উপযোগী হবে। কেননা যখন একজন পরীক্ষায় পড়ে পরাভূত হয়, তখন ঈশ্বর নিজেই যে কাউকে পরীক্ষায় আনেন কেমন যেন তাকে পরাজয়ের হাতে তুলে দেন, তা ভাবা যুক্তিহীন। একই অযুক্তি তাকেও অপেক্ষা করে যে 'তোমরা প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়' বচনটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। কেননা যখন পরীক্ষায় পড়া এমন পাপ যা না করার জন্য আমরা প্রার্থনা করি, তখন এমনটা ধরে নেওয়া কি অযৌক্তিক নয় যে, যিনি অনিষ্টকর ফল ফলাতে পারেন না[খ], সেই মঙ্গলময় ঈশ্বর কোন একজনকে অনিষ্টে জড়িয়ে দেবেন?

[১২] রোমীয়দের কাছে পল যা বলেন, এক্ষেত্রে তা যোগ করা উপযোগী। তিনি বলেন, '*নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। এজন্য ঈশ্বর তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়*'[ক]; এবং দু' এক পদ পরে তিনি বলে চলেন, '*তাই ঈশ্বর জঘন্য রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন: তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অন্যের কামনায় জ্বলে পুড়েছে*' ইত্যাদি; এবং পর পরে বলে চলেন, '*আর যেহেতু তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে*'[খ]। এ বচনগুলো দ্বারাই আমাদের তাদের প্রতিরোধ করতে হবে যারা ঈশ্বরত্বকে দু'ভাগ করে ছিন্ন করে ও এমনটা ধরে নেয় যে আমাদের প্রভুর মঙ্গলময় পিতা বিধানের ঈশ্বরের চেয়ে আলাদা একজন[গ]। যে কেউ প্রার্থনায় ব্যর্থ হয়, মঙ্গলময় ঈশ্বর কি তাকে পরীক্ষার মধ্যে চালান? যারা কোন না কোন ভাবে পাপ করেছে, মঙ্গলময় ঈশ্বর কি *তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে দেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়?*[ঘ]। আর যেহেতু ওরা নাকি বলে যে, যেহেতু তিনি বিচার ও শাস্তি দেওয়া থেকে মুক্ত, সেজন্য তিনিই কি তাদের '*জঘন্য রিপুর হাতে*' ও '*ভ্রষ্ট মনের হাতে ও অনুচিত*'[ঙ] আচরণের

হাতে তাদের ছেড়ে দেন? এসমস্ত কিছু ধরে নিলে, তবে যদিও ঈশ্বর দ্বারা তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়ে না থাকত, তবে তারা কি 'তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষে' রয়ে থাকত না? এবং যদিও ঈশ্বর তাদের 'জঘন্য রিপুর হাতে' ছেড়ে না দিতেন, তবে তারা কি তাতে নিজেরাই পতিত হত না? আর যারা তেমন দণ্ডে দণ্ডিত, যদিও ঈশ্বর তাদের ছেড়ে না দিতেন, তবে তারা কি 'ভ্রষ্ট মনের হাতে' নিজেরাই পড়ত না?

[১৩] আমি তো ভালই জানি যে এসমস্ত সমস্যা ওদের কাছে কষ্টকর, ও ঠিক এই কারণেই ওরা অপর এমন ঈশ্বরকে বানিয়েছে যিনি স্বর্গ-মর্তের নির্মাতার চেয়ে ভিন্ন, কেননা ওরা বিধানে ও নবী-পুস্তকাদিতে সদৃশ বহু বচন পেয়েছে ও এমনটা স্থির করেছে যে, তেমন বাণী যিনি উচ্চারণ করেন তিনি মঙ্গলময় হতে পারেন না। 'আমাদের পরীক্ষায় এনো না' বচন ক্ষেত্রে নিজেই যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বিধায় ও সেইজন্য প্রৈরিতিক নানা বচন উপস্থাপন করেছি বিধায় এবার আমাকে দেখতে হবে, সেই সমস্ত অযৌক্তিক বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সমাধান পাওয়া যেতে পারে কিনা। আমি মনে করি, ঈশ্বর প্রতিটি যুক্তি-বিশিষ্ট আত্মার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে সেই আত্মাকে অনন্ত জীবনে চালনা করতে পারেন, যদিও সেই আত্মা অনুক্ষণ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী ও তার নিজের দায়িত্বে হয় শ্রেয়তর কাজকর্মের মাধ্যমে মঙ্গলময়তার চূড়ায় আরোহণ করে, না হয় মন্দতার পরমসীমা বিষয়ে উদাসীনতার ফলে কোন না কোন ধাপে অবরোহণ করে। সেই অনুসারে, যেহেতু দ্রুত ও অতি শীঘ্র নিরাময় এমনটা ঘটাতে পারে যে, কোন না কোন মানুষ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সেটার ব্যাপারে অবজ্ঞা বোধ করতে পারে যার ফলে সেই মানুষ সুস্থতা লাভের পরে দ্বিতীয় বারের মত সেই রোগে আক্রান্ত হয়, তেমনি তিনি তেমন অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে এমনটা হতে দিতে পারেন যেন রোগটা বৃদ্ধি পায়, এমনকি রোগটা যেন সেই লোকের মধ্যে এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যার ফলে রোগটা নিরাময়ের অতীত হয়, এবং এর ফলে, বহুদিন ধরে অনিষ্টে লিপ্ত থেকে ও যে পাপ আকাঙ্ক্ষা করছিল তাতে পূর্ণ হয়ে সেই লোকেরা তাতে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে সেই অনিষ্ট সম্পর্কে সচেতন হয় যা তারা নিজেরা নিজেদের জন্য ঘটিয়েছে ও সেইভাবে তারা তা-ই ঘৃণা করতে শেখে যা আগে সাগ্রহে গ্রহণ করত, যাতে করে যখন তারা নিরাময় হয় তখন যেন স্থিতমূল হয়ে সেই সুস্থতা উপভোগ করতে পারে

যা তাদের দৈহিক নিরাময়ের মাধ্যমে তাদের আত্মারই উপকারে এসেছে। ঠিক তাই ঘটেছিল সেই ‘*নানা জাতের*’ লোকদের বেলায় যারা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে ছিল। তাদের কামনা বড়ই ছিল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা বসল ও হাহাকার করল; বলল, ‘*কে আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায় হায়, আমাদের মনে পড়ছে সেই মাছের কথা, যা মিশর দেশে আমরা বিনামূল্যে খেতাম; সেই সশা, তরমুজ, নীলশাক, পিঁয়াজ ও রসুনের কথাই মনে পড়ছে! এখন আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে; এখানে আর কিছু নেই; আমাদের চোখের সামনে এই মান্না ছাড়া আর কিছুই নেই*’(ক) ; ও অল্প কয়েকটা বচন পরে লেখা আছে, *মোশি লোকদের হাহাকার শুনতে পেলেন, প্রতিটি পরিবারের লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল* (খ)। আরও, কয়েকটা পদ পরে, প্রভু মোশিকে বলেন, ‘*তুমি লোকদের বল: আগামীকালের জন্য নিজেদের শুচীকৃত কর, আর মাংস খেতে পারবে, কেননা তোমরা প্রভুর কানে হাহাকার করেছ, বলেছ, কেইবা আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায় হায়, মিশরে আমাদের কতই না মঙ্গল ছিল! আচ্ছা, প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন, আর তোমরা মাংস খাবে: একদিন বা দু’ দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন বা কুড়ি দিন তা খাবে এমন নয়; পুরা এক মাস ধরেই খাবে; যতদিন না তা তোমাদের নাক থেকে বের হয় ও তোমাদের কাছে ঘৃণ্য হয়, ততদিন খাবে, কারণ তোমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত, সেই প্রভুকে তোমরা অগ্রাহ্য করেছ, এবং তাঁর সামনে হাহাকার করে একথা বলেছ: আমরা কেনই বা মিশর থেকে বের হয়ে এসেছি?*’(গ)

[১৪] অতএব, এসো, আমরা দেখি, যে বর্ণনা আমি উপস্থাপন করেছি, সেই বর্ণনা ‘আমাদের পরীক্ষায় এনো না’ বচন ও প্রৈরিতিক উক্তির অযৌক্তিকতা সমাধানে উপযোগী হয়।

ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে উপস্থিত সেই নানা জাতের মানুষেরা ও তাদের সঙ্গে ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজেরাও বড় কামনা ভোগ করে হাহাকার করেছিল। এটাই স্পষ্ট যে, যতদিন না তারা যা কামনা করছিল তা পেত, ততদিন তারা তুষ্ট হত না, ও তাদের ভাবাবেগ শেষ হত না। কিন্তু সেই দয়াবান ও মঙ্গলময় ঈশ্বর তাদের কামনা মঞ্জুর করায় তা এমন ভাবে মঞ্জুর করতে ইচ্ছা করেননি যাতে সেই কামনা তাদের অন্তরে থেকে যেত। সেইজন্য তিনি বলেন, তারা এক দিন মাত্রই মাংস খাবে না, কারণ যদি তারা অল্প সময়ের জন্যও মাত্র মাংস খেত তাহলে তাদের ভাবাবেগ থেকে যেত ও তাতে

তাদের আত্মায় আগুন লেগে যেত ও জ্বলন্ত হয়ে উঠত। তারা যা দু’ দিনের জন্য কামনা করছিল, তাও তিনি তাদের মঞ্জুর করেননি। যেহেতু তিনি ইচ্ছা করছিলেন তারা সেই মাংসে পরিতৃপ্ত হবে, সেজন্য তিনি এমন কথা উচ্চারণ করেন যা যে কেউ বুদ্ধির অধিকারী তার কাছে একটা হুমকির মত শোনায়, যদিও তাদের কাছে তা সন্তোষজনক ছিল: “তোমরা মাংস খেতে খেতে শুধু পাঁচ দিন কাটাবে না, সেই দিনগুলোর দ্বিগুণ সময়ও নয়, ও সেই সময়ের তিনগুণ সময়ও নয়; না, তোমরা পুরা এক মাস ধরেই মাংস খেতে খেতে কাটাবে যতদিন যা তোমরা উত্তম মনে করছিলে তা তোমাদের নাক থেকে তোমাদের কাছে ঘৃণ্য ভাবাবেগের সঙ্গে ও তোমাদের নিন্দাজনক ও হীন কামনার সঙ্গেও বের হয়। এইভাবে আমি তোমাদের কামনা থেকে তোমাদের আজীবন মুক্ত করব, যাতে যখন তোমরা বের হও, তখন সমস্ত কামনা থেকে শুচীকৃত হতে পার ও তা থেকে মুক্ত হবার জন্য তোমরা যা সহ্য করে এসেছিলে সেই কষ্ট স্মরণে রাখ। তাতে তোমরা সেই অবস্থায় পুনরায় পড়তেও সক্ষম হবে না, অথবা, দীর্ঘ সময়কালের পরে তোমাদের কামনাজনিত কষ্টভোগ বিস্মরণের কারণে তেমনটা ঘটলে, যে বাণী সমস্ত ভাবাবেগ থেকে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে তা নিজেদের অন্তরে একীভূত করায় ব্যর্থ হলে, পরবর্তীকালে অনিষ্টে পড়লে ও পুনরায় পার্থিব বস্তু কামনা করলে ও বর্তমানকালে যা কামনা করছ তা দ্বিতীয়বারের মত তেমন বস্তু পাবার জন্য যাচনা করলে, তবে যা কামনা কর তা ঘৃণা করবে ও এর ফলে সেই মঙ্গলকর বস্তুর দিকে ও সেই স্বর্গীয় খাদ্যের দিকে দ্রুতই চলবে যা তাদেরই দ্বারা অবজ্ঞাত যারা অনিষ্টের কামনা করে।”

[১৫] তেমনটা তাদের বেলায়ও ঘটবে যারা *অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময়* (ক) করেছে, যাদের এই কারণে *নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে ছেড়ে* (খ) দেওয়া হয়েছে ও পরিত্যাগ করা হয়েছে, যারা বুদ্ধিহীন ও অনুভূতিহীন একটা দেহে সেই একজনেরই নাম আরোপ করেছে যিনি চেতনা-বিশিষ্ট ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীদের উপর চেতনা শুধু নয়, যুক্তিক্ষমতাও মঞ্জুর করেছেন, ও অন্যান্যদের উপর সম্পূর্ণরূপে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ধারণা ও চিন্তা করার ক্ষমতারও অনুগ্রহ মঞ্জুর করেছেন। এটাও যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করায় ও ঈশ্বর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত

হওয়ায় তেমন মানুষদের তাঁর দ্বারা ‘*জঘন্য রিপুর হাতে*’ ছেড়ে দেওয়া হবে ও তারা সেই ‘*ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল*’(গ) পাবে যা দ্বারা তারা সেই চুলকানিজনক অভিলাষ ভালবাসল। কেননা তাদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল তারা তখনই পাবে যখন প্রজ্ঞাময় দহন দ্বারা (ঘ) শোধনকৃত হওয়ার চেয়ে বা কারাগারে তাদের প্রতিটা ঋণ শেষ কড়িটা পর্যন্ত শোধ করার চেয়ে (ঙ) তাদের বরং “জঘন্য রিপুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়”। কেননা যখন “জঘন্য রিপুর হাতে”, আর প্রকৃতিগত শুধু নয়, কিন্তু বহু “প্রকৃতি-বিরুদ্ধও রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া” হয়, তখন, কেমন যেন আত্মা ও মনের অধিকারী আর নয় বরং সম্পূর্ণরূপে মাংস হয়ে গিয়ে তারা সেই মাংস দ্বারা দূষিত ও কলুষিত হয়; অন্য দিকে আগুনে ও কারাগারে তারা তাদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল না পেয়ে বরং নিজেদের ভ্রান্তিতে অভিলাষ ভালবাসার পাশাপাশি যে সমস্ত অনিষ্ট দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছিল, সেই সমস্ত অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণদায়ী কষ্টভোগের সঙ্গে উপকারী পরিশুদ্ধি গ্রহণ করে। আর এইভাবেই তারা সেই সমস্ত মলিনতা ও রক্ত থেকে মুক্তিলাভ করে যার মধ্যে এতই দূষিত ও কাদাগ্রস্ত ছিল যে, নিজেদের ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পাবে বলে তারা কল্পনাও করতে পারত না। তাই ঈশ্বর ‘*বিচারের আত্মা ও দহনের আত্মা দ্বারা*’ সিয়োন পুত্র ও কন্যাদের ‘*মলিনতা ধৌত করবেন*’ ও তাদের মধ্য থেকে ‘*যত রক্তচিহ্ন মুছে*’ দেবেন (চ)। কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত ও রজকের সাবানের মত এসে (ছ) যারা ঈশ্বরকে উপযুক্ত ভাবে জানতে অনিচ্ছুক ছিল বিধায় তেমন নিরাময়-ক্রিয়ার প্রয়োজনে ছিল, তিনি তাদের নিখাদ করবেন ও শোধন করবেন। আর যখন তাদের তেমন প্রতিক্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাদের সেই ‘*ভ্রষ্ট মন*’(জ) ঘৃণা করবে, কেননা ঈশ্বর এমনটা ইচ্ছা করেন যেন মানুষ বাধ্য হয়ে নয় কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবেই মঙ্গল অর্জন করে। বাস্তবিকই এমনটা হতে পারে যে, অনিষ্টের সঙ্গে দীর্ঘ মিলনের পরে কেউ না কেউ অনিষ্টের জঘন্যতা সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য কিছুটা কষ্টভোগ করবে, কিন্তু তবু তা থেকে যেন মিথ্যায় সুন্দর বলে গণ্য এমন বস্তু থেকে দূরে সরে যাবে।

[১৬] তাছাড়া, এবিষয়ও বিবেচনা কর যদি এইজন্যই *ঈশ্বর ফারাওর হৃদয় কঠিন করেছিলেন* (ক), অর্থাৎ যাতে করে তাঁর হৃদয় কঠিন ছিল বিধায়ই ফারাও এমনটা বলতে

না পারতেন যা পরে প্রকৃতপক্ষে বলেছিলেন, তথা, *প্রভু ধর্মময়, আমি ও আমার জনগণই ভক্তিহীন* [খ]। তাসত্ত্বেও দরকার ছিল, তাঁকে আরও বেশি কঠিন করা হবে ও তিনি আরও বেশি কষ্টভোগ করবেন, পাছে তত শীঘ্রই সেই কাঠিন্য থেকে রেহাই পেয়ে তিনি সেই কাঠিন্য এমনি একটা অনিষ্ট বলে গণ্য করে আরও বহুগুণে বেশি কাঠিন্যের যোগ্য হতেন। প্রবচনমালার কথামত যদি *পাখিদের জন্য জাল পাতা অন্যায্য নয়* [গ], তাহলে ঈশ্বর একেবারে ন্যায্যতার সঙ্গেই আমাদের 'ফাঁদে' চালিত করেন (সেই বচন অনুসারে, তথা *তুমি আমাদের এনেছ ফাঁদের মধ্যে* [ঘ])। কিন্তু নূনতম পাখি সেই চড়ুই পাখিও ঈশ্বর ইচ্ছা না করলে ফাঁদে পড়ে না [ঙ], কেননা ফাঁদে সেই পাখির পড়াটা তার পাখার প্রভাবের সঠিক ব্যবহার না করার ফলেই হয়েছে, কারণ পাখিটাকে পাখা দেওয়া হয়েছিল সে যেন ঊর্ধ্বে উড়তে পারে। তাই এসো, প্রার্থনা করি, যেন আমরা এমন কিছু না করি যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দ্বারা আমাদের পরীক্ষায় আনীত হবার যোগ্য করবে। কেননা যে কেউ সেইভাবে পরীক্ষায় আনীত হয়, তাকে ঈশ্বর দ্বারাও '*নিজের হৃদয়ের নানা অভিলাষ অনুসারে অশুচিতার হাতে ছেড়ে*'[চ] দেওয়া হয়, তাকে '*জঘন্য রিপুর হাতে ছেড়ে*'[ছ] দেওয়া হয়, ও যেহেতু সে '*ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি*', সেজন্য তাকে '*ভ্রষ্ট মনের হাতে*'[জ] ও অনুচিত আচরণের হাতেও ছেড়ে দেওয়া হয়।

[১৭] পরীক্ষার উপযোগিতা মোটামুটি এরূপ। আমাদের আত্মা যা গ্রহণ করেছে, তা ঈশ্বরের কাছে বাদে সকলের কাছে, এমনকি আমাদের নিজেদেরও কাছে অজানা। কিন্তু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়, যার ফলে, আমরা যে কেমন মানুষ, তেমন জানাটা আর এড়াতে পারি না। এবং নিজেদের জানার ফলে আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের নিজেদের অনিষ্ট সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠি, ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকর যা কিছু আমাদের প্রকাশ করা হয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এবং পরীক্ষা-সকল যে আমাদের কাছে আসে যাতে আমাদের প্রকৃত স্বভাব আমাদের নিজেদের কাছে প্রকাশিত হয় ও আমরা যেন তা-ই দেখতে পাই যা আমাদের হৃদয়ে গুপ্ত, তা ঈশ্বর দ্বারা যোব পুস্তকে স্থাপিত। বচনটা এরূপ, 'আমি তোমাকে ধার্মিক বলে প্রকাশ করব, তুমি কি মনে কর আমি শুধু এই কারণেই তোমাকে সাড়া দিয়েছি? [ক]। এবং দ্বিতীয় বিবরণে, *তিনি তোমাকে নমিত করলেন, তোমাকে ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করালেন, তোমাকে মান্নায়*

পরিপুষ্ট করলেন ও তোমাকে সেই মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে চালনা করলেন যেখানে ছিল জ্বালাদায়ী সাপ ও বিছে ও পিপাসা যাতে তোমার হৃদয়ে যে কি কি ছিল তা তুমি যেন জানতে পারতে (খ)।

[১৮] আমরা বাইবেলের সেই বর্ণনা স্মরণ করতে ইচ্ছুক হলে তবে আমরা জানতে পারব যে, হবাকে তত সহজ প্রবঞ্চনা ও তাঁর বিকৃত যুক্তি যে তখনই ঘটেছিল যখন তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হয়েছিলেন ও সাপের কথা শুনেছিলেন, তা নয়, সেই সমস্ত কিছু বরং হবা পরীক্ষিত হবার আগেও ছিল। এজন্যই সাপ তাঁর কাছে গিয়েছিল, কেননা সাপটা নিজের চতুরতার মাধ্যমে হবার দুর্বলতা অনুভব করেছিল (ক)। তাছাড়া, কাইন যখন নিজের ভাইকে খুন করেছিল, তখনই যে অনিষ্টের উদ্ভব হল তাও নয়, কেননা আমাদের হৃদয় জানেন যিনি, সেই ঈশ্বর কাইন বা তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাননি (খ), বরং তার ধূর্ততা তখনই প্রকাশ্য হল যখন সে আবেলকে খুন করেছিল। এবং নোয়া যে আঙুররস চাষ করেছিলেন তা পান করে যদি '*মাতাল না হতেন*' ও নিজেকে '*বস্ত্রহীন অবস্থায়*' না দেখাতেন, তাহলে হামের দুষ্ট আচরণ ও নিজের পিতার প্রতি তাঁর অভক্তি, ও আপন জন্মদাতার প্রতি তাঁর ভাইদের সম্মান ও মর্যাদাও প্রকাশ পেত না (গ)। এমনটা মনে হয় যে, যাকোবের বিরুদ্ধে এসৌয়ের চক্রান্তও তাঁর আশীর্বাদ-বঞ্চনার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ছিল, অথচ তাঁর আত্মা দুশ্চরিত্রতা ও ধর্মহীনতার '*শিকড়ের*' অধিকারী ছিল (ঘ)। আর যদি যোসেফের মনিবের স্ত্রী তাঁর সঙ্গে প্রেমে না পড়ত, তাহলে যেকোন লালসা-আক্রমণ ক্ষেত্রে বলবান সেই যোসেফের কৌমার্যের উজ্জ্বল আদর্শ বিষয়েও কিছুই জানতে পারতাম না (ঙ)।

[১৯] সুতরাং, ধারাবাহিক পরীক্ষার মধ্যকার অবসরকালে, এসো, আসন্ন পরীক্ষার বিরুদ্ধে স্থিতমূল হয়ে দাঁড়াই ও যা কিছু ঘটতে পারে সেবিষয়েও প্রস্তুত হয়ে থাকি, যেন অপ্রস্তুতি-দায়ে দোষী বলে প্রতিপন্ন না হয়ে বরং আগে থেকে সযত্নে তৈরী মানুষের পরিচয় দিতে পারি। কেননা আমরা আমাদের সাধ্যমত সবকিছু করার পর আমাদের মানব দুর্বলতা বশত যা কিছু ঘাটতি দেখা দেবে, ঈশ্বর তা '*পূরণ করবেন*'(ক), কেননা *যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে সবকিছুতে কার্যকর হন* (খ), কারণ

তারা যে কি হয়ে উঠবে, তা তিনি নিজের নির্ভুল পূর্বজ্ঞান অনুসারে আগে থেকে দেখেছেন।

‘সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর’

৩০। [১] আমার এমনটা মনে হয় যে, ‘*আমাদের পরীক্ষায় এনো না*’ আপন বচনে লুক ‘*সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর*’(ক) বচনের অর্থও আমাদের শিখিয়েছেন। কেননা এমনটা স্বাভাবিক হতে পারে যে, প্রভু সেই শিষ্যের (খ) কাছে সংক্ষিপ্ত ভাবে কথা বলেছিলেন যেহেতু সেই শিষ্য ইতিমধ্যে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলেন, কিন্তু যাদের পক্ষে স্পষ্টতর শিক্ষা দরকার ছিল, সেই লোকের ভিড়ের কাছে তিনি সাধারণ ভাবে কথা বলেছিলেন। যে শত্রু নিজের সমস্ত চালাকি দ্বারা বা নিজের ইচ্ছার যেকোন সেবাকর্মী দ্বারা *আমাদের সঙ্গে সংগ্রাম* (গ) করে থাকে, যখন আমরা সেই শত্রুর আক্রমণের অধীন নই, তখন ঈশ্বর আমাদের নিস্তার করেন না; তিনি বরং তখনই আমাদের নিস্তার করেন যখন আমাদের বিরুদ্ধে যাই ঘটুক না কেন আমরা সেই সমস্ত কিছুর সামনে সাহসের সঙ্গে স্থিতমূল হয়ে দাঁড়াই ও বিজয়ী হই। আমি এইভাবেই ‘*ধার্মিকের অনেক ক্লেশ আছে, কিন্তু সেই সবকিছু থেকে তিনি তাকে উদ্ধার করেন*’(ঘ) বচনটা ব্যাখ্যা করেছিলাম, কেননা আমরা যখন ক্লেশভোগ করছি না, তখন যে ঈশ্বর ক্লেশ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন এমন নয়, (কেননা যখন পল বলেন ‘*আমাকে পদে পদে ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে*’(ঙ), তখন তিনি বলতে চান তিনি ঠিক সেসময়ই ক্লেশভোগ করছিলেন), কিন্তু তিনি তখনই আমাদের উদ্ধার করেন, যখন আমরা ক্লিষ্ট হয়েও ঈশ্বরের সহায়তায় চূর্ণ হই না। হিব্রুদের ঐতিহ্য অনুসারে ক্লেশ বলতে এমন দুর্দশা বোঝায় যা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয়; অন্যদিকে ‘চূর্ণ হওয়া’ আমাদের সেই স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যা ক্লেশ দ্বারা পরাভূত হয়েছে ও ক্লেশের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তাই পল সঠিক অর্থেই বলেন, ‘*পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না*’(চ)। আমি মনে করি, সামসঙ্গীত-মালার এই পদ একই অর্থ বহন করে, তথা, আমার ‘*ক্লেশে তুমি আমাকে প্রসারিত স্থানে রেখেছ*’(ছ), কারণ দুর্দশার দিনে ঈশ্বরের সাহসদানকারী ও পরিত্রাণদায়ী বাণীর সহযোগিতা ও উপস্থিতি জনিত আনন্দ ও প্রফুল্লতা ‘প্রসারণ’ বলে অভিহিত।

[২] 'সেই ধূর্তজন থেকে' প্রত্যেককে 'নিস্তার' বাক্যটাও একইভাবে বুঝতে হবে। শয়তান যোবকে নানা পরীক্ষায় ঘিরে রাখবার অধিকার পায়নি বিধায়ই যে ঈশ্বর তাঁকে নিস্তার করেছিলেন এমন নয়, কেননা শয়তান সেই অধিকার পেয়েছিল [ক], কিন্তু এইজন্য তাঁকে নিস্তার করেছিলেন কারণ '*সেইসব কিছুতে*' যোব প্রভুর সামনে পাপ না করে [খ] বরং নিজের ধর্মিষ্ঠতা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই যখন শয়তান বলেছিল, '*যোব বিনা স্বার্থেই কি ঈশ্বরকে ভয় করে? তুমি তার চারদিকে, তার বাড়ির চারদিকে ও তার সবকিছুর চারদিকে কি রক্ষণ-বেষ্টনী রাখনি? তুমি কি তার সমস্ত কর্ম আশিসমণ্ডিত করনি ও তার পশুপাল দেশ জুড়ে ছড়াওনি? কিন্তু তুমি একবার হাত বাড়িয়ে তার সেই সবকিছু স্পর্শ কর, আর সে অবশ্যই তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিশাপ দেবে*'[গ]। কিন্তু শয়তান যা বলেছিল, যোব সেই সবকিছু ভোগ করার পরে ঈশ্বরকে তাঁর মুখের উপরেই অভিশাপ দেননি বরং শয়তানের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হওয়ার পরেও প্রভুকে ধন্য বলতে থাকলেন, আর যখন তাঁর স্ত্রী বলেছিল, '*প্রভুর বিরুদ্ধে একটা কথা বল ও মর*'[ঘ], তখন তিনি তাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, '*তুমি নির্বোধ এক স্ত্রীলোকের মতই কথা বলছ! আমরা ঈশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?*'[ঙ]।

যোব সম্পর্কে শয়তান দ্বিতীয় বারের মত প্রভুর সঙ্গে কথা বলেছিল, '*চামড়ার বদলে চামড়া! নিজের প্রাণের বদলে একজন নিজের সবকিছুও দেবে। কিন্তু তুমি একবার হাত বাড়িয়ে তাকে হাড়ে-মাংসে স্পর্শ কর, তবেই তুমি দেখবে,আর সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিশাপ দেবে*'[চ]। কিন্তু শয়তান পুণ্যের সেই বীরযোদ্ধা দ্বারা পরাজিত হল ও মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হল। কেননা কঠোরতম কষ্ট ভোগ করলেও তিনি বিশ্বস্ত হয়ে থাকলেন ও প্রভুর সম্মুখে '*নিজের ওষ্ঠাধরে*'[ছ] কোন পাপ করেননি। যোব দু' দু'বার লড়াই করলেন ও বিজয়ী হলেন, কিন্তু তেমন সংগ্রামে তিনবারের মত সংগ্রামরত হননি, কারণ এমনটা অবধারিত ছিল যে, তিনটে লড়াই ত্রাণকর্তার জন্যই রাখা হবে, যেইভাবে তিনটে সুসমাচারে লেখা রয়েছে [জ] যখন আপন মানব অবস্থায় পরিচিত আমাদের ত্রাণকর্তা সেই শত্রুর উপর তিনবার জয়ী হয়েছিলেন।

[৩] অতএব, যাতে আমরা সদ্‌জ্ঞানেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করি যেন পরীক্ষায় না পড়ি ও সেই ধূর্তজন থেকে নিস্তার পাই, তবে এসো, যত্ন সহকারে এসমস্ত বিষয়

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি ও নিজেদের মধ্যে তা অনুসন্ধান করি। তবেই আমরা ঈশ্বরকে শোনার মাধ্যমে তাঁর সাড়া পাবার যোগ্য হয়ে উঠব। এসো, তাঁকে অনুনয় করি, যখন আমরা পরীক্ষিত হই তখন যেন আমাদের মৃত্যুভোগ না করতে হয়, ও যখন আমরা *'সেই ধূর্তজনের অগ্নিবাণ'*(ক) দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন যেন সেগুলো দ্বারা আগুনে পুড়ে না যাই। সেই বারোজন নবীর একজনের বাণী অনুসারে, যাদের হৃদয় *'তন্দুরের মত'* হয়েছে (খ), তারাই আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু যারা *'বিশ্বাসের ঢাল'*(গ) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সেই ধূর্তজনের ছোড়া সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দেয়, তারাই আগুনে পুড়ে যায় না, যদি নিজেদের মধ্যে *'অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী সেই জলের নদনদী'* থাকে (ঘ) যা সেই ধূর্তজনের আগুন ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে তা অনুপ্রাণিত ও পরিত্রাণদায়ী সেই চিন্তাধারার বন্যার মাধ্যমে সহজেই নিঃশেষিত করে: সেই যে চিন্তাধারা সত্য-সন্দর্শন থেকে তারই আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত যে আত্মিক হতে আকাঙ্ক্ষা করে।

প্রার্থনা বিষয়ক অতিরিক্ত আলোচনা

প্রার্থনাকালে মনোভাব ও অঙ্গভঙ্গি

৩১। [১] এসমস্ত কিছু বলার পর, প্রার্থনা প্রসঙ্গ সংক্রান্ত আলোচনাটা সম্পন্ন করার জন্য, প্রার্থনাকালে আমাদের সমুচিত মনোভাব ও অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কে, যে স্থানে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, ও অসাধারণ পরিস্থিতি বাদে কোন্ দিকে আমাদের ফিরে তাকানো উচিত, ও প্রার্থনার জন্য কোন্ সময় বিশেষভাবে উপযোগী ও চিহ্নিত, ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কে কিছু কথা যোগ করা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি না। মনোভাব তো আত্মার সঙ্গে, ও অঙ্গভঙ্গি দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। পল এইভাবেই, যেইভাবে উপরে বলেছি (ক), মনোভাবকে বর্ণনা করেন যখন তিনি বলেন আমাদের বিনা ক্রোধে ও বিনা বিবাদে প্রার্থনা করতে হবে, কিন্তু *'শুচি হাত তুলে'*(খ) বলে তিনি অঙ্গভঙ্গিকে বর্ণনা করেন। আমার মতে একথা সামসঙ্গীত-মালা থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে লেখা আছে, *আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন* (গ)। স্থান সম্পর্কে, *'আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থানে … পুরুষমানুষেরা প্রার্থনা করুক'*(ঘ)। এবং দিক সম্পর্কে, শলোমনের প্রজ্ঞা পুস্তকে,

‘তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য সূর্যের আগেই ওঠা দরকার, আলোর প্রথম আগমনেই তোমার কাছে প্রার্থনা করা দরকার’[৬]।

[২] সেই অনুসারে, আমি মনে করি, যে কেউ প্রার্থনা করতে উদ্যত হয়, তার পক্ষে কিছুক্ষণের মত কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত যাতে প্রার্থনাকালে সে আরও মনোযোগী ও সজাগ হতে পারে। তাকে সমস্ত পরীক্ষা ও কষ্টকর চিন্তা সরিয়ে দিতে হবে ও তার সাধ্যমত তাঁরই মহত্ত্ব স্মরণ করতে হবে যাঁর কাছে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, তাকে সেই অভক্তি স্মরণ করতে হবে যা তখনই উপস্থিত যখন মানুষ হাঁই তুলতে তুলতে, অমনোযোগী ভাবে ও অবজ্ঞা ভরে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়; ও তাকে বাহ্যিক সমস্ত বিষয় সরিয়ে দিতে হবে। তাই হাত প্রসারিত করার আগে, বলতে গেলে, আত্মাকেই প্রসারিত ক’রে, চোখের আগে মনকে উত্তোলিত ক’রে ও পায়ে দাঁড়াবার আগে নিজের যুক্তিকে মর্ত থেকে তুলে তা বিশ্বপ্রভুর সামনে হাজির করিয়ে তার প্রার্থনা করা উচিত। যে কেউ হয় তো তার প্রতি অন্যায় করে থাকে, তেমন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধ তাকে যত বিদ্বেষের স্মৃতি সরিয়ে দিতে হবে, সেইভাবে যেভাবে সে এমনটা চাইবে যে, সে নিজে অন্যায় কিছু করে থাকলে বা কোন প্রতিবেশীর প্রতি পাপকর্ম করে থাকলে, অথবা ন্যায়-যুক্তি বিরুদ্ধ কোন কর্ম করে থাকলে সেবিষয়ে ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্বেষের স্মৃতি রাখবেন না।

এবং যদিও দেহের বহু অঙ্গভঙ্গি রয়েছে তবু এবিষয়ে তার কোন সন্দেহ থাকার নয় যে প্রসারিত হাতে ও উত্তোলিত চোখে দাঁড়ানো উত্তম অঙ্গভঙ্গি, কেননা সেই অঙ্গভঙ্গি দেহে সেই সমস্ত বিশিষ্টতার ছবি বহন করে যা প্রার্থনারত আত্মার পক্ষে সমুচিত। আমি বলতে চাই, অসাধারণ পরিস্থিতি বাদেই সেই অঙ্গভঙ্গি উত্তম বলে গণ্য করা উচিত। কেননা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে পায়ে অসহ্য ব্যথা বশত আমরা বসা অবস্থায় সমুচিত ভাবে প্রার্থনা করতে পারি, অথবা গায়ে জ্বর বা সেই ধরনের অন্য পীড়ার কারণে শুয়েও প্রার্থনা করতে পারি। তাছাড়া কোন না কোন অবস্থার কারণে, উদাহরণ স্বরূপ আমরা যাত্রা করছি বা আমাদের ব্যবসাই আমাদের প্রার্থনা-ঋণ শোধ করার জন্য কাজ থেকে বিরত থাকতে দেয় না, ইত্যাদি অবস্থার কারণে আমরা এমনভাবে প্রার্থনা করতে পারি কেমন যেন প্রার্থনা করছি না।

[৩] তাছাড়া আমাদের জানা উচিত যে, বিনম্রতা ও অধীনতার চিহ্ন হিসাবে জানুপাত তখনই প্রয়োজন যখন এক ব্যক্তি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম স্বীকার করতে অভিপ্রায় করে, কেননা সে সেই পাপকর্ম নিরাময়ের লক্ষ্যে ও ক্ষমা পাবার লক্ষ্যেই অনুনয় করছে। এক্ষেত্রে পল বলেন, *'এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি'*(ক)। এটা আধ্যাত্মিক জানুপাত বলে অভিহিত, কারণ যিশু-নামে প্রতিটি সৃষ্টজীব ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভূমিষ্ঠ হল ও তাঁর কাছে নিজেকে নমিত করল। আমি মনে করি, প্রেরিতদূত তখনই তেমনটা ইঙ্গিত করেন যখন বলেন, *'যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়'*(খ)। কেননা আদৌ কোন প্রয়োজন নেই যে আমরা এমনটা ধরে নিই যে, স্বর্গীয় প্রাণী এমন দেহের অধিকারী যেগুলোর দৈহিক জানু আছে, কারণ যারা এ সমস্ত বিষয়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই দেহগুলো গোলাকার। যে কেউ একথা মানতে অসম্মত, অথচ দেহের যে প্রতিটি অঙ্গ স্বীয় স্বীয় ভূমিকার অধিকারী তা মেনে নেয়, তবে, পাছে ঈশ্বর দ্বারা কিছু না কিছু বৃথাই গড়া হয়ে থাকে, সে (যদি না সে ঐশযুক্তির প্রতি লজ্জাকর ভাবে ব্যবহার করে) তার অভিমতের সংশ্লিষ্ট উভয় বিষয়ে হোঁচট খাবে। কেননা হয় সে বলবে যে দেহের অঙ্গগুলো ঈশ্বর দ্বারা বৃথাই গড়া হয়েছে বিধায় সেগুলো নিজ নিজ বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী নয়, না হয় এমনটা সমর্থন করবে যে, স্বর্গীয় প্রাণীগুলোতেও অন্ত্ররাজি ও মলদ্বার নিজ নিজ ভূমিকার অধিকারী। এবং যে কেউ এমনটা ধরে নিত যে, মূর্তিগুলোর মত সেই স্বর্গীয় প্রাণীদেরও কেবল বাহ্যিক চেহারায় মানুষের মত কিন্তু ভিতরে সেগুলোর কিছু নেই, সে একেবারে নির্বোধের মত ব্যবহার করত। জানুপাত সংক্রান্ত আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ও *'যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়'*(গ) বচন লক্ষ করার ফলে এটাই আমার বক্তব্য। কিন্তু তাছাড়া *প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে* (ঘ) নবীর এই বচন একই অর্থ বহন করে।

প্রার্থনার উপযুক্ত স্থান

[৪] এদিকে, স্থান সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত যে, যে সুন্দর ভাবে প্রার্থনা করে, তার জন্য যেকোন স্থান উপযুক্ত, কারণ, *যেকোন স্থানেই আমার উদ্দেশে ধূপ অর্পণ কর;*

একথা বলছেন প্রভু [ক], এবং '*আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থানে পুরুষমানুষেরা … প্রার্থনা করুক*'[খ]। কিন্তু শান্তশিষ্ট ও বিভ্রান্তি-মুক্ত ভাবে প্রার্থনা করার জন্য ব্যবস্থা করার ব্যাপারে এক একজনের এমন স্থান থাকা উচিত যা বলতে গেলে ও সম্ভব হলে তার নিজের ঘরে পবিত্র স্থান বলে স্বতন্ত্র ও বেছে নেওয়া স্থান। স্থানের সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সে এমনটা দেখবে পাছে যে স্থানে সে প্রার্থনা করে সেখানে কোন বিধি-নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়ে থাকে বা ন্যায়-যুক্তি বিরুদ্ধ কোন কিছু করা হয়ে থাকে। নইলে নিজেকে শুধু নয়, তার ব্যক্তিগত প্রার্থনার স্থানটাকেও সে এমন বস্তু করবে যা থেকে ঈশ্বরের মর্যাদা দূরে সরে যাবে। স্থান সম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে আমি আমার নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে সাহস করব যা রূঢ় বলে মনে হতে পারলেও তবু যে কেউ বিষয়টা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে তার পক্ষে উপেক্ষা করা উচিত নয়; অর্থাৎ যে স্থানে যৌন মিলন হয়, এমন মিলন যা অবৈধ নয় বরং যা প্রেরিতদূতের এই উক্তির অনুযায়ী তথা, '*আমি আজ্ঞা হিসাবে নয়, অনুমতি হিসাবেই*'[গ], তেমন স্থান ঈশ্বরকে অনুনয় করার জন্য পবিত্র ও শুচি কিনা। কেননা, যেভাবে প্রার্থনা করা উচিত, প্রার্থনার জন্য তেমন সময় নির্ধারণ করা অসম্ভব হলে, (যদি-না এক ব্যক্তি '*পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে নির্দিষ্ট কালের মত*'[ঘ] তাতে নিজেকে নিবিষ্ট করে), তাহলে সেই স্থান উপযুক্ত কিনা, তাও সম্ভব হলে একই বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

[৫] যে প্রার্থনার স্থান বিশিষ্ট আশীর্বাদ ও উপকারের স্থান, সেটা হলো সেই স্থান যেখানে বিশ্বাসীগণ একত্রে সম্মিলিত হয়। এমনটাও হতে পারে যে দূত-পরাক্রমবৃন্দ বিশ্বাসীদের ভিড়ে উপস্থিত, আর সেইসঙ্গে স্বয়ং প্রভু ও ত্রাণকর্তার পরাক্রমও এমনকি পবিত্র আত্মাগুলোও উপস্থিত; আমি তাদেরই কথা ভাবছি যারা ইতিমধ্যে নিদ্রাগত ও যারা এখনও জীবিত, যদিও তেমনটা কেমন হয় তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। দূতদের সম্পর্কে আমাদের এইভাবে ভাবতে হবে: যদি '*প্রভুর দূত প্রভুভীরুদের চারপাশে শিবির বসান ও তাদের নিস্তার করেন*'[ক], এবং যখন যাকোব বলেন, '*সেই দূত আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে নিস্তার করেন*'[খ], তখন তিনি শুধু নিজের বিষয়ে নয়, কিন্তু যারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেদের উৎসর্গ করে তাদের বিষয়েও সত্যকথা বলেন, তাহলে এমনটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, যখন লোকদের মহাসমাবেশ প্রকৃত মনোভাবে খ্রিষ্টের গৌরবার্থে

একত্রে সমবেত হয়, তখন সেই যে দূত প্রভুভীরুদের এক একজনের চারপাশে রয়েছেন, এক একজনের সেই দূত তারও চারপাশে শিবির বসান যার জন্য তিনি রক্ষক ও পথদিশারী বলে নিযুক্ত হয়েছেন। এর ফলে, যখন পবিত্রজনেরা একত্রে সমবেত, তখন সেই স্থানে দ্বিবিধ মণ্ডলী উপস্থিত তথা মানুষদের নিয়ে গড়া এক মণ্ডলী ও দূতদের নিয়ে গড়া এক মণ্ডলী। আর যখন রাফায়েল এমনটা বলেন যে, তিনি কেবল তোবিতেরই প্রার্থনা '*স্মৃতিচিহ্ন*'(গ) রূপে উপস্থাপন করেছেন, ও সেটার পরে সেই সারারও প্রার্থনা উপস্থাপন করেছেন যিনি তোবিয়াসের সঙ্গে বিবাহের ফলে তোবিতের পুত্রবধূ হয়েছিলেন, তখন আমরা কীবা বলব যখন বহু বহু মানুষ একই মনে ও একই সঙ্কল্পে একত্রে যাত্রা করে ও খ্রিষ্টে এক দেহ হয়ে ওঠে? মণ্ডলীর সঙ্গে প্রভুর পরাক্রমের উপস্থিতি সম্পর্কে পল বলেন, '*যখন তোমরা ও আমার আত্মা আমাদের প্রভু যিশুর পরাক্রমের সঙ্গে সমবেত হলে…* '(ঘ); একথা দ্বারা তিনি বলতে চান যে, প্রভু যিশুর পরাক্রম শুধু এফেসীয়দের সঙ্গে নয় (ঙ), করিন্থীয়দেরও সঙ্গে সমবেত। আর যখন পল দেহে পরিবৃত অবস্থায়ও এমনটা ভাবেন যে তাঁর নিজের আত্মা তাদেরই সঙ্গে মিলিত যারা করিন্থে ছিল, তখন আমরা সেই অভিমত প্রত্যাখ্যান করব না যে, একইপ্রকারে, যারা এখনও দেহে রয়েছে, তাদের চেয়ে পরলোকগত সেই সুখীজনেরাই আত্মায় মণ্ডলীর সমাবেশে আরও শীঘ্রই আসেন। সুতরাং, কেউই যেন মণ্ডলীর সমাবেশে প্রার্থনাগুলো অবজ্ঞা না করে, কেননা যে কেউ সরল মনে সেখানে সমবেত হয়, সেই প্রার্থনাগুলো তার জন্য অসাধারণ কিছু বয়ে আনে।

[৬] যেমন যিশুর পরাক্রম, পলের ও তাঁর সদৃশ যারা তাদের আত্মা, ও সেই দূতগণ যাঁরা পবিত্রজনদের এক একজনের চারপাশে শিবির বসান যাঁরা সেই দূতগণ তাদেরই যাত্রা-সঙ্গী হন যারা সরল মনে একত্রে সমবেত হয় ও তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তেমনি আমাদের এও ধরে নিতে হবে যে, যে কেউ নিজের পবিত্র দূতের অযোগ্য হয় ও ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করায় পাপ ও অন্যায়ের মধ্য দিয়ে শয়তানের দূতের হাতে নিজেকে তুলে দেয়, সেই ব্যক্তি, তার মত অল্পজন মাত্র থাকলেও, সম্ভবত বেশিক্ষণ ধরে সেই স্বর্গদূতদের লক্ষ্য এড়াবে না যাঁরা ঐশইচ্ছার সেবায় মণ্ডলীর উপর দৃষ্টি রাখেন; এবং সেই দূতগণ তেমন ব্যক্তির অপরাধ সকলের সামনে জ্ঞাত করবেন। আর তেমন ব্যক্তিরা

বহুসংখ্যক হলে ও তারা অধিক দৈহিক ধরনের কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থেকে মানব-সম্মেলনের লক্ষ্যে সমবেত হলে তবে দূতগণ তাদের উপর দৃষ্টি রাখবেন না। বিষয়টা ইশাইয়ার লেখায় স্পষ্ট হয় যেখানে প্রভু বলেন, *'তোমরা আমার সাক্ষাতে হাজির হলেও … তবু আমি তোমাদের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব; তোমরা তোমাদের প্রার্থনা শতগুণে বাড়ালেও, তবু আমি তোমাদের শুনব না'*(ক)। কেননা এমনটা হতে পারে যে, পবিত্র জনগণের ও সুখময় দূতগণের উপরোল্লিখিত সেই দ্বিবিধ শ্রেণির স্থানে ভক্তিহীন জনগণের ও মন্দ দূতগণের দ্বিবিধ সভা থাকে। তেমন সভা সম্পর্কে পবিত্র দূতগন ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তিগণ উভয়ই বলতে পারেন, *'আমি অসারের সভায় বসিনি, যাব না ভণ্ডদের সঙ্গে, অপকর্মাদের মণ্ডলী ঘৃণা করেছি, বসব না ভক্তিহীনদের সঙ্গে'*(খ)।

[৭] সুতরাং আমি মনে করি, যারা যেরুশালেমে ও সমগ্র যুদেয়ায় ছিল, তারা তাদের বহু পাপকর্মের কারণে তাদের শত্রুদের অধীন হয়েছিল যেহেতু যারা বিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা ঈশ্বর দ্বারা, রক্ষীদূতগণ দ্বারা ও পবিত্র লোকদের থেকে আগত পরিত্রাণ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাই সেই গোটা সভাগুলো সময় সময় পরীক্ষায় পড়ার জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল যার ফলে তাদের যা কিছু ছিল বলে তারা মনে করছিল, তাও তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল (ক)। আর যিশু ক্ষুধার্ত হলে যে ডুমুরগাছ তাঁকে কোন ফল দেয়নি বিধায় অভিশপ্ত হয়েছিল ও শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছিল (খ), তারা সেই গাছের মত শুকিয়ে গেছে ও বিশ্বাস গুণে তাদের যেটুকু জীবন-শক্তি ছিল তা হারিয়ে ফেলেছে। আমি মনে করি, প্রার্থনার স্থানের কথা আলোচনা করায় ও পবিত্রজনেরা মহা শ্রদ্ধা সহকারে যে স্থানে সমবেত হয় তেমন স্থানই যে উত্তম, এই অভিমত উপস্থাপন করায় এসমস্ত কথা বলা প্রয়োজন ছিল।

পুব দিকে ফিরেই প্রর্থনা করা উত্তম

৩২। প্রার্থনাকালে এক ব্যক্তির যে কোন্ দিকে ফিরে তাকানো উচিত সেবিষয়ে দু'টো কথা বলা দরকার। যেহেতু চার দিক তথা উত্তর ও দক্ষিণ দিক এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দিক আছে, সেজন্য কেইবা এতে সাথে সাথে সম্মত হবে না যে সূর্যোদয়ের দিকটাই অতি স্পষ্ট ভাবে দেখায় যে সেই দিকে ফিরেই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেহেতু সেই দিক প্রতীকাকারে এমনটা ব্যক্ত করে যে আত্মা *সত্যকার আলোর* (ক)

উদয়ের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে? যে কেউ নিজের অনুরোধ সেই দিকে নিবেদন করতে ইচ্ছা করে যে দিকে তার বাড়ির সামনের দিক রয়েছে, বাড়ির দরজা যেই দিকে অবস্থিত হোক না কেন, একথা ব'লে যে দেওয়ালের দৃষ্টির চেয়ে আকাশের দৃষ্টিই তার কাছে আকর্ষণীয় ও তার বাড়ির পূব দিকের উন্মুক্ত কোন স্থান নেই, তবে উত্তরে আমরা বলব যে, মানুষের বাড়ি-ঘরের সামনের দিক যে এক দিকে বা অন্য দিকে উন্মুক্ত তা সর্বস্বীকৃত ব্যাপার, কিন্তু অবশিষ্ট তিন দিকের চেয়ে সূর্যোদয়ের দিকটাই প্রকৃতিগত ভাবেই উত্তম বলে গণ্য করা উচিত, এবং সর্বস্বীকৃতির চেয়ে যা প্রকৃতি অনুযায়ী তা-ই সমর্থনযোগ্য। তাছাড়া, যে কেউ খোলা মাঠে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করত, কেনই বা একই যুক্তি অনুসারে সে সূর্যাস্তের চেয়ে সূর্যোদয়ের দিকে ফিরে প্রার্থনা করবে? যখন সেই ক্ষেত্রে পূব দিকটাই উত্তম বলে গণ্য, তখন কেনই বা সেই দিক সবসময়ই উত্তম বলে গণ্য হবে না? এবিষয়ে একথা যথেষ্ট হোক।

প্রর্থনার চার পর্যায়

৩৩। [১] আমি মনে করি, প্রার্থনার নানা পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করায় এই পুস্তিকা শেষ করতে পারব। আমি মনে করি, উল্লেখযোগ্য চারটে পর্যায় রয়েছে যা আমি শাস্ত্রে এদিক ওদিক নানা স্থানে পেয়েছি, আর এগুলো অনুসারেই প্রতিটি প্রার্থনা গঠিত হওয়া উচিত। পর্যায়গুলো এ: প্রার্থনার প্রারম্ভে, ভূমিকা স্বরূপ, এক একজনের সাধ্যমত ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করা উচিত সেই খ্রিষ্টের দ্বারা যিনি তাঁর সঙ্গে গৌরবান্বিত ও সেই পবিত্র আত্মায় যিনি তাঁর সঙ্গে স্তুতিবাদের পাত্র। এরপর, প্রত্যেকে সাধারণ ধন্যবাদ-জ্ঞাপনকে স্থান দেবে: এতে প্রত্যেকে ধন্যবাদের বিষয়বস্তু হিসাবে সেই সমস্ত উপকার উল্লেখ করবে যা ততসংখ্যক মানুষের কাছে মঞ্জুর করা হয়, ও সেই বিশেষ বিশেষ আশীর্বাদ উল্লেখ করা হবে যা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বর থেকে পেয়েছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, আমি মনে করি, প্রত্যেকে ঈশ্বরের সামনে নিজের পাপকর্ম তিক্ত ভাবে নিন্দা করবে, প্রথমত, সে যেন, যে সমস্ত কু-অভ্যাস তাকে পাপ করতে প্ররোচনা করে, তা থেকে মুক্ত হবার জন্য নিরাময় যাচনা করতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, সে যেন অতীত অপকর্ম বিষয়ে ক্ষমা অর্জন করতে পারে। পাপস্বীকারের পর আমি মনে করি যে, চতুর্থ পর্যায় হিসাবে, এমন যাচনা যোগ করা উচিত যা মহৎ ও স্বর্গীয় বিষয়গুলো

সংক্রান্ত—নিজেদের জন্য ও সকলের জন্য, আবার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের জন্য। অবশেষে, প্রতিটি প্রার্থনা পবিত্র আত্মায় খ্রিষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরবারোপণ দিয়ে সমাপ্ত করা হবে।

[২] আমি আগে বলেছিলাম, এ পর্যায়গুলো আমি শাস্ত্রে এদিক ওদিক নানা স্থানে পেয়েছি। গৌরবারোপণটা পেয়েছি ১০৪ নং সামসঙ্গীতের এই বাণীতে, ‘*হে প্রভু, ঈশ্বর আমার, তুমি কেমন অতিশয় মহান। তুমি ধন্যবাদ-স্তুতিতে ও মহিমায় পরিবৃত, তুমি উত্তরীয়ের মত আলোতে আবৃত। তুমি আকাশ বিছিয়ে দাও চাঁদোয়ার মত, ঊর্ধ্ব জলরাশির উপরে স্থাপন কর নিজ কক্ষের কড়িকাঠ; মেঘমালাকে কর তোমার রথ, বাতাসের পাখায় ভর করে কর চলাচল; বাতাসকে কর তোমার নিজের দূত, আগুনের শিখাকে তোমার নিজের সেবাকর্মী। তিনি পৃথিবী স্থিতমূল ভিত্তির উপরে স্থাপন করেন, তা যুগযুগ ধরে কখনও টলবে না; অতল তা ঢাকে বসনের মত, জলরাশি গিরিমালার উপর বিরাজ করে। সেই জলরাশি তোমার ধমকে পালিয়ে যাবে, তোমার কণ্ঠের গর্জনে ভয়েতে অভিভূত হবে*’[ক]। অধিকাংশে সামসঙ্গীতটা পিতার গৌরবারোপণে কেন্দ্রীভূত। এবং এক একজন নিজের জন্য বহু বহু বচন বেছে নিয়ে দেখতে পারে গৌরবারোপণ সংক্রান্ত এ বিষয়বস্তু কেমন ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত।

[৩] ধন্যাবাদ-জ্ঞাপন হিসাবে সেটাই উল্লেখ করা হোক যা শামুয়েলের ২য় পুস্তকে পাওয়া যায় ও যা নাথানের দেওয়া প্রতিশ্রুতির পরে দাউদ দ্বারা উচ্চারিত; দাউদ ঈশ্বরের দানসমূহ বিষয়ে বিস্মিত হয়ে এবাণী দ্বারা তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, ‘*হে প্রভু আমার প্রভু, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি ভালবেসেছ? তোমার দৃষ্টিতে, প্রভু আমার, আমাকে সামান্যই করা হয়েছিল, অথচ আসন্ন দীর্ঘ কাল ধরে তুমি তোমার দাসের কুলের খাতিরে কথা বলেছ। হে প্রভু আমার প্রভু, মানুষের পক্ষে এ তো নিয়ম! এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে? প্রভু, তুমি তো এখন তোমার আপন দাসকে জান। তুমি তোমার দাসের খাতিরে এসমস্ত করেছ ও তোমার হৃদয় অনুসারে তোমার এই সমস্ত মহাকর্ম সাধন করে তা তোমার দাসের কাছে জ্ঞাত করেছে সে যেন তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারে, হে প্রভু আমার প্রভু*’[ক]।

[৪] পাপস্বীকার উদাহরণ এটা, ‘*আমার সমস্ত অপরাধ থেকে আমাকে উদ্ধার কর*’[ক] ; এবং অন্য পদগুলোতে, ‘*আমার মূর্খতার ফলে আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় ও পচনশীল। আমি অত্যন্ত নুব্জ, ভ্রষ্ট, শোকার্ত মনে ঘুরি সারাদিন*’[খ]।

[৫] যাচনা হিসাবে ২৮ নং সামসঙ্গীত লক্ষণীয়, ‘*আমায় টেনে নিয়ে যেয়ো না পাপীদের সঙ্গে, ও অপকর্মাদের সঙ্গে আমাকে বিলুপ্ত ক'রো না*’[ক]।

[৬] এটা ন্যায়সঙ্গত যে, গৌরবারোপণে শুরু ক'রে আমরা আমাদের প্রার্থনা গৌরবারোপণে সমাপ্ত করব, পবিত্র আত্মায় খ্রিষ্টের দ্বারা নিখিল বিশ্বের সেই পিতার প্রশংসাগান ও গৌরবকীর্তন ক'রে যাঁর *গৌরব হোক চিরকাল* [ক]।

উপসংহার

৩৪। তাই, শিক্ষার আগ্রহী ও ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তপ্রাণ হে ভ্রাতা আম্ব্রোজ ও ভগিনী তাতিয়ানা, এটাই হলো প্রার্থনা প্রসঙ্গে, সুসমাচারগুলোতে প্রার্থনা বিষয়ে ও মথিতে সেই প্রার্থনার আগেকার বচনগুলো ক্ষেত্রে তোমাদের খাতিরে আমার সাধ্যমত লড়াইয়ের ফলাফল। আর আমি এতে নিরাশ নই যে, সামনে যা রয়েছে তোমরা যদি *সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হও ও পিছনে যা কিছু আছে তা ভুলে যাও* [ক], ও সেইসঙ্গে যদি এসমস্ত বিষয়ে অধ্যয়নরত এই আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে দাতা যিনি, সেই ঈশ্বর থেকে আমি এবিষয়ে এমন অতিরিক্ত ও আরও বেশি ঐশ্বরিক অনুগ্রহদান পাব যা গ্রহণ করে নিয়ে এই সমস্ত বিষয়ে পুনরায় ও আরও উপযুক্তভাবে, আরও উন্নতভাবে ও আরও স্পষ্টতরভাবে আলোচনা করতে পারব। আপাতত, এসমস্ত কিছু ক্ষমার চোখে পড়।

---

১ (ক) সাম ১০৪:২৪ সত্তরী পাঠ্য।
(খ) ১ করি ১:৩০।
(গ) প্রজ্ঞা ৯:১৩-১৬।
(ঘ) ২ করি ৯:১৪।
(ঙ) ২ করি ১২:২-৪ দ্রঃ।
(চ) যোহন ১৫:১৪-১৫।
(ছ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক থাকায় বন্ধনীতে [ ] অন্তর্ভুক্ত সম্ভাব্য পাঠ্য যোগ করা

হয়েছে।
(জ) ১ করি ২:১১ দ্রঃ।
(ঝ) ১ করি ২:১২-১৩।

২ [১](ক) আদি ১৮:১১। ‘আম্ব্রোজ’ ছিলেন অরিগেনেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক; ‘তাতিয়ানা’ অজানা ব্যক্তি, যদিও ‘বীরত্বপূর্ণা’ বলে চিহ্নিতা হওয়ায় অনুমান করা যায় তিনি নির্যাতনকালে সাহসের সঙ্গে বিশ্বাস স্বীকারে স্থিতমূল থেকেছিলেন।
(খ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে।
(গ) ২ করি ১২:৬-৭ দ্রঃ।
(ঘ) রো ৮:২৬।

২ [২](ক) অরিগেনেসের উল্লিখিত বচনটা অপ্রামাণিক (যোহন ৩:১২; মথি ৬:৩৩; লুক ১২:৩১ দ্রঃ)।
(খ) লুক ৬:২৮।
(গ) মথি ৯:৩৮; লুক ১০:২ দ্রঃ।
(ঘ) লুক ২২:৪০; মথি ২৬:৪১; মার্ক ১৪:৩৮ দ্রঃ।
(ঙ) মথি ২৪:২০; মার্ক ১৩:৮ দ্রঃ।
(চ) মথি ৬:৭।
(ছ) ১ তি ২:৮-১০।
(জ) মথি ৫:২৩-২৪।
(ঝ) ১ করি ৭:৫ দ্রঃ, ‘পাছে শয়তান ··· তোমাদের পরীক্ষা করে’ এর বদলে অরিগেনেস ‘উল্লসিত হয়’ ব্যবহার করেন।
(ঞ) মার্ক ১১:২৫ দ্রঃ।
(ট) ১ করি ১১:৪-৫ দ্রঃ।

২ [৩](ক) মথি ৫:১৭ দ্রঃ।
(খ) রো ৮:২৬।
(গ) রো ৮:২৬-২৭।
(ঘ) গা ৪:৬।
(ঙ) সাম ৪৪:২৫ দ্রঃ।
(চ) ফিলি ৩:২১ দ্রঃ।
(ছ) ২ করি ১২:৪।
(জ) রো ৮:৩৭।

২ [৪](ক) রো ৮:২৬।
(খ) ১ করি ১৪:১৫।
(গ) ১ করি ২:১০।
(ঘ) ‘আত্মা ··· **সাধ্যমত** তা উপলব্ধি করেছেন’। এ বাক্য অনুসারে যদি অরিগেনেস এমনটা

সমর্থন করেন যে, পবিত্র আত্মা কেবল 'সাধ্যমত'-ই ঈশ্বরের বিষয়ে জানেন, তাহলে খ্রিষ্টবিশ্বাস, বিশেষভাবে পরবর্তীকালীন নিকেয়া-মহাসভার ভিত্তিতেও, তাঁর এ ধারণা গ্রহণ করতে পারে না। অন্যদিকে, অরিগেনেস 'প্রাথমিক তত্ত্বমালা' নামক নিজের প্রধান লেখায় প্রেরিতদূত পলের একই বচন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্ট বলেন যে, 'যিনি একাই পিতাকে জানেন, সেই পুত্র যেমন যাকে ইচ্ছা করেন তাকে পিতাকে প্রকাশ করেন, তেমনি যিনি একাই ঈশ্বরের গভীরতম বিষয় তলিয়ে দেখেন, সেই পবিত্র আত্মাও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন'; তবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করা ক্ষেত্রে পুত্র যে জ্ঞানের অধিকারী ও পবিত্র আত্মা যে শক্তির অধিকারী, সেই জ্ঞান ও শক্তি অনুরূপ তথা সদৃশ। সুতরাং 'আত্মা … **সাধ্যমত** তা উপলব্ধি করেছেন' বলতে সম্ভবত 'আত্মা … **নিজের অধিকার অনুসারে** তা উপলব্ধি করেছেন' বোঝায়।

(ঙ) লুক ১১:১।

(চ) লুক ১১:১।

(ছ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে; সম্ভবত পাঠ্যের এই ফাঁকে মথি ৩:৫-৬ পদ দু'টো উল্লেখিত ছিল।

(জ) মথি ৩:৫-৬ দ্রঃ।

(ঝ) মথি ১১:৯ দ্রঃ।

(ঞ) অরিগেনেসের মতে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে দু' শ্রেণির শিষ্য রয়েছে, সরল শিষ্য ও পরিপক্ক শিষ্য। পরিপক্ক যারা, তারা, তাঁর মতে, গভীরতর ও অধিক রহস্যময় ঐশতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম। সেই ভিত্তিতে তিনি এখানে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মধ্যেও সেই দু' শ্রেণির শিষ্যত্ব উপস্থাপন করেন।

২ [৫](ক) ১ শামু ১:১২-১৩ দ্রঃ।

(খ) হো ১৪:১০।

৩ [১] (ক) গ্রীক ভাষায় সাধারণত 'এউখে' (εὐχὴ) শব্দটা 'মানত' অর্থে অনুধাবনযোগ্য, অর্থাৎ, 'যাকোব এই বলে মানত করলেন'। কিন্তু এই অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশে (অর্থাৎ ৩ 'ক') 'প্রার্থনা' শব্দটা এজন্য রাখা হচ্ছে যেহেতু অরিগেনেস নিজের আলোচনায় বলেন যে, 'এউখে' (εὐχὴ) ও 'প্রসেউখে' [προσευχή] শব্দ দু'টো সাধারণত 'প্রার্থনা' অর্থটা বহন করলেও তবু সময় সময় 'মানত' অর্থও বহন করে।

(খ) আদি ২৮:২০-২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে।

৩ [২] (ক) 'শব্দটা সেই অর্থেও ব্যবহৃত যে অর্থ অনুসারে আমরা নিজেরা সাধারণত তা ব্যবহার করি': অর্থাৎ শব্দটা 'প্রার্থনা' অর্থ অনুসারে ব্যবহৃত।

(খ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে। তাই বন্ধনীর [ ] মধ্যকার বাক্যটা সম্ভব্য পাঠ্য উপস্থাপন করে।

(গ) যাত্রা ৮:৪ সত্তরী দ্রঃ।
(ঘ) যাত্রা ৮:৫।

৩ [৩] (ক) যাত্রা ৮:২৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) যাত্রা ৪:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) যাত্রা ৮:২৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) যাত্রা ৯:২৭-২৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) যাত্রা ৯:৩৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(চ) যাত্রা ১০:১৭-১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩ [৪] (ক) 'শব্দটা বহুবার সাধারণ ব্যবহারের চেয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত' : অর্থাৎ 'মানত' অর্থে ব্যবহৃত ; সুতরাং এই অধ্যোয়ে 'প্রার্থনা' শব্দটার বদলে 'মানত' শব্দই ব্যবহৃত হবে।
(খ) লেবীয় ২৭:১-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) গণনা ৬:১-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) গণনা ৬:১১-১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) গণনা ৬:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(চ) গণনা ৬:২০-২১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ছ) গণনা ৩০:১-৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(জ) প্রবচন ৭:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঝ) প্রবচন ১৯:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ
(ঞ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে। তাই বন্ধনীর [ ] মধ্যকার বাক্যটা সম্ভব্য পাঠ্য উপস্থাপন করে।
(ট) প্রবচন ২০:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ
(ঠ) উপ ৫:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ড) প্রেরিত ২১:২৩।

৪ [১] (ক) ১ শামু ১:৯-১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৪ [২] (ক) লেবীয় ২৭:২; গণনা ৬:২১ ইত্যাদি দ্রঃ ; এপুস্তকের ৩:৪ দ্রঃ।
(খ) বিচারক ১১:৩০-৩১।

৫ [১] (ক) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে। সম্ভাব্য পাঠ্য এটি হতে পারে, 'কেননা কেউ না কেউ রয়েছে যারা এই অর্থেও প্রার্থনা মেনে নেয় না, বরং প্রার্থনা করে যারা তাদের বিদ্রূপ করে ও যত ধরনের প্রার্থনা আদৌ নিঃশেষ করতে ইচ্ছা করে।'
(খ) 'দূরদৃষ্টি' : ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।
(গ) ২ থে ২:৪, ৯।

৫ [২] (ক) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।
(খ) মথি ৬:৮ দ্রঃ।
(গ) প্রজ্ঞা ১১:২৪ দ্রঃ।

৫ [৪] (ক) সাম ৫৩:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) গা ১:১৫ দ্রঃ।
(গ) রো ৯:১১-১২ দ্রঃ।
(ঘ) ফিলি ৪:১৩ দ্রঃ।
(ঙ) আদি ২৫:২৩।
(চ) সাম ৯০:১-২ দ্রঃ।
(ছ) পাণ্ডুলিপিতে এস্থানে একটা ফাঁক রয়েছে।

৫ [৫] (ক) এফে ১:৪-৫।
(খ) রো ৮:২৯-৩০।
(গ) ২ রাজা ২২; ১ রাজা ১৩:১-৩।
(ঘ) সাম ১০৯:৭।
(ঙ) প্রেরিত ১:১৬, ২০; সাম ১০৯:৭-৮ দ্রঃ।

৬ [১] (ক) এসমস্ত কথা প্লেটোর দর্শনবিদ্যার উপর নির্ভর করে।

৬ [২] (ক) ‘স্বাধীন ইচ্ছা’: স্তোয়া মতবাদের প্রকৃত শব্দ হলো ‘স্বনিয়ন্ত্রণ’; এই অনুবাদে সহজবোধ্য ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ শব্দটাই ব্যবহার করা হবে।

৬ [৩] (ক) রো ১:২০ দ্রঃ।
(খ) মথি ২৫:৩৪; লুক ১১:৫০; হিব্রু ৪:৩; ৯:২৬; প্রকাশ ১৩:৮; ১৭:৮ দ্রঃ।
(গ) ‘দূরদৃষ্টি’: কথ্য ভাষায় πρόνοια (প্রনোইয়া) গ্রীক শব্দের সাধারণ ও প্রচলিত অর্থ ‘যত্ন’ হলেও তবু ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে তার প্রকৃত অর্থ হলো ‘পূর্ব-চিন্তা’ বা ‘পূর্ব-ভাবনা’, আর সেই অনুসারে গ্রীক দর্শনবিদ্যায় πρόνοια (প্রনোইয়া) শব্দটা ঈশ্বরের এমন ভাবনা-কর্ম নির্দেশ করে যা তিনি স্বাধীন ভাবে ও যত্ন সহকারে অনুশীলন করেন যাতে প্রতিটি মানুষ ইচ্ছা করলে নিজ নিজ জীবন-লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে পারে। এই অর্থে শব্দটা প্লেটোর মত সেই দার্শনিকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় যাঁরা অন্ধ নিয়তি, ভাগ্য, কপাল ইত্যাদি ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন।
অরিগেনেসও নিজের লেখায় একই সংগ্রামে যোগ দেন, কেননা, তাঁর ধারণায়, যদি ভাগ্যের মত এমন কিছু থাকে যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে স্বাধীন ও কার্যকর, তাহলে ভাগ্যই ঈশ্বরের স্থান দখল করে। সেজন্য তিনিও πρόνοια (প্রনোইয়া) শব্দটা দার্শনিকদের অর্থে তথা ঈশ্বরের (যত্নশীল) ‘দূরদৃষ্টি’ অর্থে ব্যবহার করেন।
পুরাতন ও নূতন নিয়ম মিলে πρόνοια (প্রনোইয়া) শব্দটা কেবল তিনবার উল্লিখিত ও ‘দূরদৃষ্টি’ শব্দে অনূদিত (প্রজ্ঞা ১৪:৩; ১৭:২; প্রেরিত ২৪:২); কিন্তু বাইবেলে শব্দটা যে

তিনবার মাত্র উল্লিখিত, এর অর্থ এ নয় যে ধারণাটা বাইবেলে অচেনা বা অনুপস্থিত; বাস্তবিকই ‘পর্বতে প্রভু নিজেই দেখেন’ বাক্যটা (আদি ২২:১৪) ও ‘তোমাদের জন্য ঈশ্বর কি বেশি চিন্তা করবেন না?’ (মথি ৬:৩০) যিশুর এবাণী ছাড়া অন্যান্য বাণীও ধারণাটাকে স্পষ্টভাবে ধ্বনিত করে।

একই প্রকারে, ধারণাটা যে বাংলা ঐতিহ্যেও বর্তমান তা অনস্বীকার্য; বস্তুত আপদে-বিপদে ‘ঈশ্বর ভাববেন’, ‘ঈশ্বর চিন্তা করবেন’ বা ‘ঈশ্বর দেখবেন’ বলা স্বাভাবিক। কিন্তু ধারণাটা বাংলা বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা তত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যেহেতু অরিগেনেস ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাষা প্রয়োগ করেন, সেজন্য এই অনুবাদে কথ্য ভাষার ‘যত্ন’ শব্দের বদলে ‘দূরদৃষ্টি’ শব্দটা বেছে নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই বিকল্প সমার্থক অন্য বাংলা শব্দও ব্যবহার করা যেতে পারত, যেমন ঈশ্বরের ‘পূর্বজ্ঞান’। কিন্তু অরিগেনেস ‘পূর্বজ্ঞান’ (πρόγνωσις, প্রগ্নসিস) শব্দটা অন্য অর্থে ব্যবহার করেন, এমনকি এই ৬:৩ পরিচ্ছেদে তিনি ‘দূরদৃষ্টি’ ও ‘পূর্বজ্ঞান’ ধারণা দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন।

অবশেষে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, সেইকালে, যখন πρόνοια (প্রনোইয়া) ও ‘πρόγνωσις, (প্রগ্নসিস) শব্দ দু’টো লাতিন ধর্ম ও দর্শনবিদ্যার ভাষায় অনূদিত হয়, তখন ‘providentia’ (প্রবিদেন্তিয়া) ও ‘præscientia’ (প্রেশেন্তিয়া) শব্দ দু’টো ব্যবহৃত হয় ও লাতিন ভিত্তিক ভাষাগুলোতে (ইতালি, স্পেন, ইংগ্রেজি, জার্মান ইত্যাদি ভাষায়) সামান্য বানান পার্থক্য সহ স্থান পায় এবং আজও ধর্ম ও দর্শনবিদ্যার উপরোল্লিখিত অর্থ দু’টো তথা ঈশ্বরের ‘(যত্নশীল) দূরদৃষ্টি’ ও ‘পূর্বজ্ঞান’ অর্থ দু’টো বহন করে থাকে।

৬ [৪] (ক) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।
(খ) এফে ৩:২০ দ্রঃ।

৬ [৫] (ক) ২ রাজা ২৩:১৫; ২ রাজা ২১:২৪; ২২:২ দ্রঃ।
(খ) সাম ১০৯:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) গা ১:১৫ দ্রঃ।
(ঘ) প্রেরিত ৯:৫।
(ঙ) প্রেরিত ৭:৫৮-৫৯; ২২:২০।
(চ) ১ করি ১:২৯।
(ছ) ১ করি ১৫:৯।
(জ) ১ করি ১৫:১০।
(ঝ) ২ করি ১২:৭ দ্রঃ।

৭ (ক) ৫ অধ্যায় দ্রঃ।
(খ) সাম ১৪৮:৩ ক।
(গ) সাম ১৪৮:৩ খ।
(ঘ) ৬:৩ অধ্যায় দ্রঃ।
(ঙ) দ্বিঃবিঃ ৪:১৯।

৮ [১] (ক) মথি ৬:৭।
(খ) ২:২ অধ্যায় দ্রঃ।
(গ) ১ তি ২:৮।
(ঘ) ১ করি ৭:৫ দ্রঃ।
(ঙ) মথি ১৮:৩৫ দ্রঃ।

৮ [২] (ক) সাম ৭:১০; যেরে ১১:২০; ১৭:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ; রো ৮:২৭; প্রকাশ ২:২৩ দ্রঃ।

৯ [১] (ক) ১ তি ২:৮; মথি ৬:১২, ১৪; লুক ১১:৪।
(খ) ১ তি ২:৮।
(গ) ১ তি ২:৯-১০।

৯ [২] (ক) সাম ১২৩:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) সাম ২৫:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) ২ করি ৩:১৮ দ্রঃ।
(ঘ) সাম ৪:৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৯ [৩] (ক) যেরে ৭:২২-২৩; জাখা ৭:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) মার্ক ১১:২৫ দ্রঃ।

১০ [১] (ক) 'দূরদৃষ্টি' : ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।
(খ) ইশা ৫৮:৯।
(গ) ইশা ৫৮:৯।
(ঘ) যোব ২:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) যোব ১:২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(চ) দ্বিঃবিঃ ১৫:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১০ [২] (ক) যেরে ২৩:২৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) ৮:১ অধ্যায় দ্রঃ।
(গ) যোহন ১:২৬ দ্রঃ।
(ঘ) হিব্রু ২:১৭; ৩:১; ৪:১৪; ৫:১০; ৬:২০; ৭:২৬; ৮:১; ৯:১১; ১০:১০ দ্রঃ।
(ঙ) যোহন ১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭; ১ যোহন ২:১ দ্রঃ।
(চ) লুক ১৮:১।
(ছ) লুক ১৮:১-২ দ্রঃ।
(জ) লুক ১১:৫-৬।
(ঝ) লুক ১১:৮।
(ঞ) লুক ১১:৯-১০; মথি ৭:৭-৮ দ্রঃ।

(ট) রো ৮:১৫।
(ঠ) লুক ১১:১৩; মথি ৭:১১; যাত্রা ১৬:৪ দ্রঃ।

১১ [১] (ক) লুক ১৫:৭ দ্রঃ।
(খ) তোবিত ৩:১৬-১৭ দ্রঃ।
(গ) তোবিত ১২:১২ দ্রঃ।
(ঘ) পাণ্ডুলিপিতে ‘পবিত্রজনদের প্রার্থনা’ বাক্যটা নেই।
(ঙ) তোবিত ১২:১৫ দ্রঃ।
(চ) তোবিত ১২:৮ দ্রঃ।
(ছ) ২ মাকা ১৫:১৩ পাণ্ডুলিপির পাঠ্য দ্রঃ।
(জ) ২ মাকা ১৫:১৫ পাণ্ডুলিপির পাঠ্য দ্রঃ।
(ঝ) ২ মাকা ১৫:১৪ পাণ্ডুলিপির পাঠ্য দ্রঃ।

১১ [২] (ক) ১ করি ১৩:২ দ্রঃ।
(খ) ১ করি ১২:২৬।
(গ) ২ করি ১১:২৮-২৯।
(ঘ) মথি ২৫:৩৫-৩৬ দ্রঃ।

১১ [৩] (ক) মথি ৪:১১ দ্রঃ।
(খ) লুক ২২:২৭ দ্রঃ।
(গ) ইশা ২৭:১২।
(ঘ) যেরে ৭:৩৫; ১০:১৬; ১১:৫২ দ্রঃ।
(ঙ) প্রেরিত ২:২১; রো ১০:১২-১৩ দ্রঃ।
(চ) প্রকাশ ১:২০; ২:১, ৮, ১২, ১৮; ৩:১, ৭, ১৪ দ্রঃ।
(ছ) যোহন ১:৫১।
(জ) হো ১০:১২ সপ্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১১ [৫] (ক) মথি ১০:৩০; লুক ২২:২৭ দ্রঃ।
(খ) মথি ১৮:১০।

১২ [১] (ক) ১ করি ১৪:১৫ দ্রঃ।
(খ) ১ থে ৫:১৭।
(গ) সাম ৮:৩; প্রবচন ৫:২২ দ্রঃ।

১২ [২] (ক) ১ থে ৫:১৭।
(খ) দা ৬:১০।
(গ) প্রেরিত ১০:৯-১১ দ্রঃ।
(ঘ) সাম ৫:৪। ‘তুমি শুনবে আমার কণ্ঠ’ এর বদলে ‘তুমি শুনবে আমার প্রার্থনা’ বাক্যটা ব্যবহৃত।

(ঙ) সাম ১৪১:২ দ্রঃ।
(চ) সাম ১১৯:৬২।
(ছ) প্রেরিত ১৬:২৫ দ্রঃ।

১৩ [১] (ক) মার্ক ১:৩৫।
(খ) লুক ১১:১।
(গ) লুক ৬:১২।
(ঘ) যোহন ১৭:১।
(ঙ) যোহন ১১:৪২।

১৩ [২] (ক) যেরে ১৫:১; সাম ৯৯:৬।
(খ) ১ শামু ১:৯ … দ্রঃ।
(গ) ২ রাজা ২০:১ … ; ইশা ৩৯:১ … ; মথি ১:৯-১০ দ্রঃ।
(ঘ) এস্থার ৩:৬, ৭; ৪:১৬, ১৭; ৯:২৬-২৮।
(ঙ) যুদিথ ১৩:৪-১০।
(চ) দা ৩:২৪, ৪৯, ৫০।
(ছ) দা ৬ অধ্যায়।
(জ) যোনা ১:১৭; ২:১; ৩:১-৪।

১৩ [৩] (ক) সাম ২০:৮ দ্রঃ।
(খ) সাম ৩৩:১৭।
(গ) যুদিথ ২:২৪ উত্যাদি।
(ঘ) দা ৩:২৭/৯৪।
(ঙ) ১ করি ৬:১৫; ১২:২৭।
(চ) সাম ৫৮:৭-৮ দ্রঃ।
(ছ) যোনা ২:১-২ দ্রঃ।
(জ) ইশা ২৫:৮ দ্রঃ।

১৩ [৪] (ক) ২ করি ১০:৩।
(খ) রো ৮:১৩ দ্রঃ।
(গ) দ্বিঃবিঃ ৪:২০; যেরে ১১:৪ দ্রঃ।
(ঘ) দা ৩:৩৯-৪০ দ্রঃ।
(ঙ) সাম ৭৪:১৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(চ) সাম ৯১:১৩ দ্রঃ।
(ছ) লুক ১০:১৯।
(জ) যোব ৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১৩ [৫] (ক) ১ শামু ১২:১৬-১৮।
(খ) যোহন ৪:৩৫-৩৬ দ্রঃ।
(গ) ১ রাজা ১৭:১; লুক ৪:২৫; যাকোব ৫:১৭-১৮ দ্রঃ।

১৪ [১] (ক) অপ্রামাণিক বচন; যোহন ৩:১২; মথি ৬:৩৩; লুক ১২:৩১ দ্রঃ।
(খ) ২:২ অধ্যায় দ্রঃ।

১৪ [২] (ক) ১ তি ২:১।

১৪ [৩] (ক) লুক ১:১৩।
(খ) যাত্রা ৩২:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) দ্বিঃবিঃ ৯:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) এস্থার ৩:১৭ক-খ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) এস্থার ৩:১৭ঞ-ট সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১৪ [৪] (ক) দা ৩:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) তোবিত ৩:১-২ দ্রঃ।
(গ) প্রেরিত ১০:৪৫; ১১:২; রো ৪:১২; গা ২:১২; কল ৪:১১; তীত ১:১০ দ্রঃ।
(ঘ) 'অবেলুস': প্রাচীনকালের ব্যাকরণবিদদের ব্যবহৃত একটা বিশেষ চিহ্ন; যে শব্দ বা বাক্য তেমন চিহ্নে চিহ্নিত ছিল, সেই শব্দ বা বাক্য নিষিদ্ধ বলে গণ্য ছিল।
(ঙ) ১ শামু ১:১০-১১।
(চ) হাবা ৩:১-২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ছ) যোনা ২:২-৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১৪ [৫] (ক) রো ৮:২৬-২৭।
(খ) যোশুয়া ১০:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) বিচারক ১৬:৩০।
(ঘ) মথি ১১:২৫; লুক ১০:২১।
১৪ [৬] (ক) মথি ৯:৬; যোহন ২০:২৩ দ্রঃ।
(খ) প্রেরিত ৭:৬০।
(গ) মথি ১৭:১৫; লুক ৯:৩৮।

১৫ [১] (ক) ১৩:১ অধ্যায় দ্রঃ।
(খ) মথি ৬:৯; … লুক ১১:১ …।
(গ) ৮:১৩ ও ৫:১১ অধ্যায় দ্রঃ।
(ঘ) অরিগেনেস οὐσία [উসিয়া, যা এখানে 'অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব' বলে অনূদিত] গ্রীক শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার করেন যা পরবর্তীকালে, নিকেয়া-মহাসভার সময়ে, বিশিষ্ট অন্য অর্থ বহন করল।
(ঙ) হিব্রু ২:১৭ … ; ৮:৩; ৭:২০-২১; সাম ১১০:৪।

১৫ [২] (ক) যোহন ১৬:২৩-২৪।

১৫ [৩] (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) ইশা ৪৯:২২-২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১৫ [৪] (ক) মার্ক ১০:১৮; ধুক ১৮:১৯; মথি ১৯:১৭।
(খ) ১ যোহন ২:১ দ্রঃ।
(গ) হিব্রু ৪:১৫ দ্রঃ।
(ঘ) ১ পি ১:৩, ২৩; রো ৮:১৪-১৫।
(ঙ) সাম ২২:২৩; হিব্রু ২:১২।

১৬ [১] (ক) মথি ৩২:২২; মার্ক ১২:২৭; লুক ২০:৩৮।

১৬ [২] (ক) মথি ৬:৩৩ দ্রঃ।
(খ) ১ করি ১২:১, ৪।
(গ) ১ করি ১২:৭।
(ঘ) রো ১২:৬।
(ঙ) ১ করি ১২:১১ দ্রঃ।

১৬ [৩] (ক) ১ শামু ১:১৯-২০; ১৩:২ অধ্যায় দ্রঃ।
(খ) 'অধিপতি' : মার্ক ৩:২২; যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০; ১৬:১১ দ্রঃ।
(গ) আদি ২৭:২৮।

১৭ [১] (ক) ১ করি ১:৫ দ্রঃ।

১৭ [২] (ক) যোহন ৩:২৯।
(খ) ইশা ৪০:৬-৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) হিব্রু ১২:২৮ দ্রঃ।
(ঘ) লুক ২:১৩; যোশুয়া ৫:১৪; কল ১:১৬; লুক ২০:৩৬ দ্রঃ।
(ঙ) মথি ৬:৮ দ্রঃ।

১৮ [১] (ক) ১ করি ৩:১০।

১৮ [২] (ক) মথি ৬:৯-১৩।
(খ) লুক ১১:২-৪।

১৮ [৩] (ক) মথি ৫:১-২।
(খ) লুক ১১:১।

১৯ [১] (ক) ৮:২–১০:২ অধ্যায় দ্রঃ।
(খ) মথি ৬:৫-৯।

১৯ [২] (ক) যোহন ৫:৪৪।
(খ) মথি ৬:২, ৫ দ্রঃ।
(গ) মথি ৬:৫।
(ঘ) লুক ১৬:২৫; গা ৬:৮ দ্রঃ।

১৯ [৩] (ক) সাম ৮২:৭ দ্রঃ।
(খ) ২ তি ৩:৪।

২০ [১] (ক) এফে ৫:২৭।
(খ) দ্বিঃবিঃ ২৩:১-২।
(গ) দ্বিঃবিঃ ২৩:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) দ্বিঃবিঃ ২৩:৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) মথি ৮:১০ দ্রঃ।
(চ) মথি ৭:১৪।
(ছ) মথি ৬:৫।
(জ) লুক ৪:১৯।
(ঝ) দ্বিঃবিঃ ১৬:১৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২০ [২] (ক) মথি ৬:৫।
(খ) মথি ৬:৬; কল ২:৩; ১ তি ৬:১৮-১৯ দ্রঃ।
(গ) এফে ৩:১৭।
(ঘ) যোহন ১:১৪; ১৪:২৩ দ্রঃ।

২১ [১] (ক) মথি ৬:৭ দ্রঃ।

২১ [২] (ক) ১ করি ২:৬ দ্রঃ।
(খ) প্রবচন ১০:১৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) সাম ৫৮:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) মথি ৬:৮ দ্রঃ।

২২ [১] (ক) মথি ৬:৯।
(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) দ্বিঃবিঃ ৩২:২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) ইশা ১:২।
(চ) মালা ১:৬।

২২ [২] (ক) গা ৪:১-২।
(খ) গা ৪:৪।

(গ) রো ৮:১৫।
(ঘ) যোহন ১:১২।
(ঙ) ১ যোহন ৩:৯।

২২ [৩] (ক) লুক ১১:৬।
(খ) ১ করি ১২:৩।
(গ) ‘আরও বেশি ভ্রান্তমতপন্থী দ্বারা’: অরিগেনেস বিশেষভাবে ভ্রান্তমতপন্থী সেই মার্কিওন, বাসিলিদেস ও ভালেন্তিনুসের কথা ভাবছেন যাদের বিষয়ে তিনি অন্যত্র বলেন, “যিশু-নাম করলেও ওরা যিশুর অধিকারী নয় যেহেতু ওরা তাঁকে উচিত মত স্বীকার করে না” (যেরেমিয়া বিষয়ক উপদেশ ১০:৫ দ্রঃ)।
(ঘ) ১ যোহন ৩:৯, ১৮।
(ঙ) রো ৮:১৬-১৭ দ্রঃ।
(চ) রো ১০:১০ দ্রঃ।

২২ [৪] (ক) যোহন ১:১৪; কল ১:১৫; ২ করি ৪:৪; কল ৩:১০ দ্রঃ।
(খ) মথি ৫:৪৫ দ্রঃ।
(গ) ১ করি ১১:৭।
(ঘ) কল ১:১৫।
(ঙ) ফিলি ৩:২১ দ্রঃ।
(চ) রো ১২:২।
(ছ) ১ যোহন ৩:৮।
(জ) ১ যোহন ৩:৮।

২২ [৫] (ক) ১২ অধ্যায় দ্রঃ।
(খ) ফিলি ৩:২০ দ্রঃ।
(গ) ইশা ৬৬:১ দ্রঃ।
(ঘ) ১ করি ১৫:৪৯ দ্রঃ।

২৩ [১] (ক) যোহন ১৩:১।
(খ) যোহন ১৩:৩।
(গ) যোহন ১৪:২৮।
(ঘ) যোহন ১৬:৫।
(ঙ) যোহন ১৪:২৩।

২৩ [২] (ক) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।
(খ) যোহন ২০:১৭।

২৩ [৩] (ক) আদি ৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) লুক ১৩:২৫ দ্রঃ।

(গ) যেরে ২৩:২৪।
(ঘ) মথি ৫:৩৪-৩৫; ইশা ৬৬:১ দ্রঃ।
(ঙ) আদি ৩:৯।

২৩ [৪] (ক) দ্বিঃবিঃ ২৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য; লেবীয় ২৬:১২; এজে ৩৭:২৭; ২ করি ৬:১৬ দ্রঃ।
(খ) আদি ৪:১৬।
(গ) ১ করি ১৫:৪৯।
(ঘ) ফিলি ২:১৫, প্রকাশ ১:২০; আদি ১:১৪, ১৬; প্রজ্ঞা ১৩:২।
(ঙ) সাম ১২৩:১।
(চ) উপ ৫:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ছ) ফিলি ৩:২১ দ্রঃ।
(জ) হিব্রু ১:৮; মথি ৫:৩৪, ৩৫।

২৩ [৫] (ক) প্রজ্ঞা ৭:২৫ দ্রঃ।

২৪ [১] (ক) মথি ৬:৯; লুক ১১:২।
(খ) পাণ্ডুলিপি এস্থানে অস্পষ্ট হওয়ায় উপস্থাপিত বাক্যটা সংশোধিত।

২৪ [২] (ক) আদি ১৭:৫।
(খ) যোহন ১:৪২; মার্ক ৩:১৬ দ্রঃ।
(গ) প্রেরিত ৯:৪, ৫; ১৩:৯।
(ঘ) যাত্রা ৩:১৪।
(ঙ) 'দূরদৃষ্টি': ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।

২৪ [৩] (ক) যাত্রা ২০:৭।
(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:২-৩।
(গ) সাম ৪৫:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৪ [৪] (ক) সাম ৩৪:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) সাম ৩০:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) সাম ৩০:১।

২৪ [৫] (ক) সাম ৩১:১৯।
(খ) সাম ১০৯:১১-১২।
(গ) তাতিয়ানুস ছিল সেকালের এক ভ্রান্তমতপন্থী।
(ঘ) আদি ১:৩।
(ঙ) আদি ১:১১, ৯, ২০, ২৪।

২৫ [১] (ক) মথি ৬:১০; লুক ১১:১২।
(খ) লুক ১৭:২০-২১ দ্রঃ।
(গ) দ্বিঃবিঃ ৩০:১৪; রো ১০:৮।
(ঘ) ২০:১ ও ২৩:১ অধ্যায় দ্রঃ।
(ঙ) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ।
(চ) ১ করি ১:৩০।
(ছ) ১ করি ২:৮; ২ করি ৪:৪।
(জ) রো ৬:১২।

২৫ [২] (ক) ১ করি ১২:৮।
(খ) ১ করি ১৩:৯-১২ দ্রঃ।
(গ) ফিলি ৩:১৪।
(ঘ) ১ করি ১৫:২৪, ২৮ দ্রঃ।
(ঙ) ১ থে ৫:১৭।

২৫ [৩] (ক) ২ করি :৬:১৪-১৫ দ্রঃ।
(খ) রো ৬:১২ দ্রঃ।
(গ) গা ৫:১৯।
(ঘ) কল ৩:৫ দ্রঃ।
(ঙ) গা ৫:২২; যোহন ১৫:৮, ১৬ দ্রঃ।
(চ) আদি ৩:৮ দ্রঃ।
(ছ) ২ করি ৬:১৬।
(জ) ১ করি ১৫:২৪; মথি ২৬:৬৪; মর্ক ১৪:৬২; লকি ২২:৬৯; সাম ১১০:১; ইশা ৬৬:১।
(ঝ) ১ করি ১৫:২৬।
(ঞ) ১ করি ১৫:৩৩, ১ করি ১৫:২৬; মথি ১৯:২৮ দ্রঃ।

২৬ [১] (ক)[মথি ৬:১০।
(খ) লুক ১১:২, ৩।
(গ) মথি ২৫:৩৪ দ্রঃ।
(ঘ) ১ করি ১৫:৪১।

২৬ [৩] (ক) এফে ৬:১২; ইশা ৩৪:৫ দ্রঃ।
(খ) এফে ৬:১২।
(গ) হিব্রু ১:৮; সাম ৪৫:৭; প্রেরিত ৭:৪৯; ইশা ৬৬:১ দ্রঃ এবং এই লেখা ২৩:৩ দ্রঃ।
(ঘ) যোহন ৪:৩৪; ১৭:৪।
(ঙ) ১ করি ৬:১৭ দ্রঃ।

২৬ [৪] (ক) মথি ২৮:১৮।
(খ) মথি ২৮:২০।
(গ) কল ১:১৫।
(ঘ) ফিলি ২:৮।
(ঙ) মথি ২৮:১৮।

২৬ [৫] (ক) এফে ৬:১২ দ্রঃ।
(খ) ফিলি ৩:২০।
(গ) মথি ৬:২০; লুক ১২:৩৪ দ্রঃ।
(ঘ) ১ করি ১৫:৪৯।
(ঙ) এফে ৬:১২ দ্রঃ।
(চ) ১ করি ১৫:৪৯।
(ছ) যোব ৪০:১৪ সপ্তরী পাঠ্য দ্রঃ; অর্থাৎ সেই 'লেভিয়াথান' যা সাম ১০৪:২৬-তেও উল্লিখিত।
(জ) লুক ১০:১৮ দ্রঃ।

২৬ [৬] (ক) ফিলি ৩:২০।
(খ) আদি ৩:১৯ দ্রঃ।
(গ) যোহন ৬:৬৩; ১ করি ৬:৯-১০; ১৫:৫০ দ্রঃ।
(ঘ) ১ করি ১৫:৫০।

২৭ [১] (ক) মথি ৬:১১; লুক ১১:৩।

২৭ [২] (ক) যোহন ৬:২৬।
(খ) যোহন ৬:২৭।
(গ) যোহন ৬:২৮-২৯।
(ঘ) সাম ১০৭:২০।
(ঙ) যোহন ৬:৩২-৩৩।

২৭ [৩] (ক) যোহন ৬:৩২।
(খ) যোহন ৬:৩৪-৩৫।
(গ) যোহন ৬:৫১।

২৭ [৪] (ক) দ্বিঃবিঃ ৯:৯ দ্রঃ।
(খ) যোহন ৬:৫১।
(গ) যোহন ৬:৫৩-৫৭।
(ঘ) যোহন ১:১৪ক।
(ঙ) যোহন ৬:১১ দ্রঃ।

(চ) যোহন ১:১৪গ।
(ছ) যোহন ৬:৫৮।

২৭ [৫] (ক) ১ করি ৩:১-৩ দ্রঃ। সে-ই ‘মাংসময় মানুষ’, যে ‘আত্মিক’ মানুষের মত চলে না।
(খ) হিব্রু ৫:১২-১৪।
(গ) রো ১৪:২।

২৭ [৬] (ক) প্রবচন ১৫:১৭।
(খ) ১ করি ১০:৫; মথি ৫:১৭; ৭:১২; ২২:৪০; লুক ১৬:১৬ দ্রঃ। এখানে অরিগেনেস সেই মার্কিওন পন্থী ভ্রান্তমতাবলম্বীদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যারা এমনটা শেখাত যে, পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পিতা থেকে আলাদা এক ঈশ্বর।
(গ) আমোস ৮:১১; রো ১৪:৮; গা ২:১৯ দ্রঃ)।

২৭ [৭] (ক) ‘এপিউসিয়োন’ [ἐπιούσιον] গ্রীক শব্দটান প্রকৃত অর্থ একেবারে অস্পষ্ট। সেসময় থেকে আজ পর্যন্তও বহু ব্যাখ্যাতা শব্দটার প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করে আসছেন, কিন্তু তেমন প্রচেষ্টা নিষ্ফল। যাই হোক, রোম-মণ্ডলী থেকে উৎপন্ন মণ্ডলীগুলো সেকাল থেকে ‘দৈনিক’ অর্থ গ্রহণ করে আসছে; এবং প্রাচ্য গ্রীক মণ্ডলীগুলো অরিগেনেসের অর্থ তথা ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’ বা তদানুরূপ অর্থ গ্রহণ করে থাকে।
(খ) যোব ৩৩:১, ৩১; ৩৪:১৬; ৩৭:১৪; ইশা ১:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) সাম ৫১:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) যাত্রা ১৯:৫।

২৭ [৮] (ক) অরিগেনেস প্লেটোর মতবাদপন্থী দার্শনিকদের কথা বলছেন।
(খ) অরিগেনেস স্তোয়া মতবাদপন্থী দার্শনিকদের কথা বলছেন।

২৭ [১০] (ক) আদি ৩:২২ দ্রঃ।
(খ) প্রবচন ৩:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) সাম ৭৮:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৭ [১১] (ক) আদি ১৮:২-৬ দ্রঃ।
(খ) প্রকাশ ৩:২০।

২৭ [১২] (ক) সাম ১০৪:৫; যাকোব ৫:৮; ১ থে ৩:১৩ দ্রঃ।
(খ) সাম ৭৪:১৩-১৪ সত্তরী পাঠ্য; প্রকাশ ১২:৩-১৭; ১৩:২, ৪, ১১; ১৬:১৩; ২০:২।
(গ) মথি ৩:৭; লুক ৩:৭।
(ঘ) সাম ৭৪:১৩-১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) প্রেরিত ১০:১১-১২।
(চ) প্রেরিত ১১:৮।

(ছ) প্রেরিত ১০:২৮।
(জ) প্রেরিত ১০:১৫।
(ঝ) মথি ১৩:৪৭ দ্রঃ।

২৭ [১৩] (ক) যোহন ১:১।
(খ) আদি ১৯:৩৭ দ্রঃ।
(গ) আদি ১৯:৩৮ দ্রঃ।
(ঘ) মথি ২৮:১৫।
(ঙ) সাম ৯৫:৭-৮।
(চ) যোশুয়া ২২:১৬, ১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ছ) সাম ৯০:৪।
(জ) প্রকাশ ২০:৪-৬ দ্রঃ। অরিগেনেস এ সহস্রবর্ষকাল 'বিখ্যাত' বলে থাকেন কেননা আদি থেকেই সেই সহস্রবর্ষকাল বিষয়ে মণ্ডলীর মধ্যে দ্বিবিধ অভিমত বর্তমান ছিল। অরিগেনেসের আগে বা অরিগেনেসের সমকালে যাঁরা প্রকাশ ২০:৪-৬ এর ভিত্তিতে সমর্থন করতেন খ্রিষ্ট এ 'পৃথিবীতে' সহস্র বছর ধরে রাজত্ব করবেন (যদিও ঐশপ্রকাশ পুস্তক প্রকৃতপক্ষে এমনটা বলে না যে, সেই রাজ্য পৃথিবীময়), তাঁদের মধ্যে পাপিয়াস, সাধু ইউস্তিনুস, সাধু ইরেনেউস, হয়তো তের্তুল্লিয়ানুস ও সাধু হিপ্পলিতুস উল্লেখযোগ্য। অরিগেনেস তেমন ধারণা সমর্থন করতেন না; তাঁর কাছে খ্রিষ্টের সহস্রকালীন রাজ্য আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যদিও এবিষয়ে তাঁর ধারণা যথেষ্ট অস্পষ্ট।
(ঝ) হিব্রু ১৩:৮।

২৭ [১৪] (ক) হিব্রু ১০:১।
(খ) যাত্রা ১২:২-৩, ৬।
(গ) যাত্রা ১২:১৮।
(ঘ) হিব্রু ১০:১; যাত্রা ১২:২, ৩, ৬, ১৫, ১৮; হো ১৪:১০; যাকোব ২:২৩ দ্রঃ।
(ঙ) দ্বিঃবিঃ ১৬:৯; লেবীয় ১৬:২৯ দ্রঃ।
(চ) লেবীয় ২৩:২৪-২৮ দ্রঃ।
(ছ) যাত্রা ২১:২; দ্বিঃবিঃ ১৫:১ দ্রঃ।
(জ) লেবীয় ২৫:৮।
(ঝ) রো ১১:৩৩

২৭ [১৫] (ক) হিব্রু ৯:২৬।
(খ) এফে ২:৭।
(গ) মথি ১২:৩১ দ্রঃ।

২৭ [১৬] (ক) হিব্রু ৪:৯ দ্রঃ।
(খ) দ্বিঃবিঃ ১৬:১৬ দ্রঃ।

(গ) এফে ৩:২০।
(ঘ) ১ করি ২:৯।

২৭ [১৭] (ক) ১ করি ৩:২২।

২৮ [১] (ক) মথি ৬:১২; লুক ১১:৪। লক্ষণীয় বিষয়, এখানে লুক অনুসারে প্রার্থনাটা বলে "আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করেছি" কিন্তু ১৮:২ অধ্যায়ে লুক অনুসারে একই বচনটা ছিল "আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি"।
(খ) রো ১৩:৭-৮।

২৮ [২] (ক) মথি ১২:৩৬ দ্রঃ।

২৮ [৩] (ক) এফে ২:১০; রো ৯:২০ দ্রঃ।
(খ) মার্ক ১২:৩০; লুক ১০:২৭; মথি ২২:৩৭; দ্বিঃবিঃ ৬:৫; ১৩:৩ দ্রঃ।
(গ) ১ শামু ২:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) এফে ৪:৩০ দ্রঃ।
(ঙ) যোহন ১৫:৮, ১৬; ৬:৬৩; ১ পি ৩:১৮; ২ করি ৩:৬ দ্রঃ।
(চ) মথি ১৮:১০ দ্রঃ।
(ছ) ১ করি ৪:৯ দ্রঃ।

২৮ [৪] (ক) ১ তি ৫:৩, ১৬, ১৭।
(খ) ১ করি ৭:৩।
(গ) ১ করি ৭:৫।

২৮ [৫] (ক) রো ১৩:৮ দ্রঃ।
(খ) কল ২:১৪।
(গ) ২ করি ৫:১০।
(ঘ) প্রবচন ২২:২৬-১৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৮ [৬] (ক) সাম ৭৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৮ [৭] (ক) মথি ১৮:৩২।
(খ) মথি ১৮:৩৫।
(গ) লুক ১৭:৩-৪।
(ঘ) প্রবচন ১৫:৩২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৮ [৮] (ক) লুক ১১:৪।
(খ) মথি ৬:১২।
(গ) মথি ৭:১৬, ২০; লুক ৬:৪৪।

(ঘ) ১ করি ২:১৪-১৫; রো ৮:১৪; গা ৫:১৮ দ্রঃ।
(ঙ) যোহন ২০:২৩ দ্রঃ।

২৮ [৯] (ক) যোহন ২০:২২-২৩।
(খ) সাম ৪০:৬ দ্রঃ।
(গ) ১ শামু ২:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৮ [১০] (ক) সেসময় কোন না কোন পাপ, বিশেষভাবে প্রতিমাপূজা, ব্যভিচার ও নরহত্যা এমন পাপ বলে পরিগণিত ছিল যা সেই পাপীকে মণ্ডলী থেকে আজীবন বিচ্যুত করত; কিন্তু, যেভাবে আফ্রিকার মণ্ডলীগুলোতে সাধু চিপ্রিয়ানুস সংক্রান্ত বিবাদে লক্ষণীয়, সেই অনুসারে ৩য় শতাব্দী থেকে পাপক্ষমা ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিল, কেননা যে খ্রিষ্টিয়ান প্রতিমার সামনে ধূপ জ্বালাবার ফলে মণ্ডলী থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, সে নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত-রীতি প্রকাশ্যে পালন করার মাধ্যমে পুনরায় মণ্ডলীর সহভাগিতায় গৃহীত হতে পারত।
(খ) ১ যোহন ৫:১৬।
(গ) যোব ১:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৯ [১] (ক) মথি ৬:১৩; লুক ১১:৪।
(খ) হিব্রু ৫:২; যাকোব ৪:১; ১ পি ২:১১; গা ৫:১৭; রো ৮:৭।

২৯ [২] (ক) যোব ৭:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) সাম ১৮:৩০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) ১ করি ১০:১৩।
(ঘ) এফে ৬:১২; গা ৫:১৭; যাকোব ৪:১; ১ পি ২:১১ দ্রঃ।
(ঙ) লেবীয় ১৭:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(চ) এফে ৬:১২।
(ছ) ১ করি ১০:১৩।
(জ) সাম ৯১:১৩ দ্রঃ।

২৯ [৩] (ক) যুদিথ ৮:২৬-২৭।
(খ) সাম ৩৪:২০।
(গ) প্রেরিত ১৪:২২।

২৯ [৪] (ক) ২ করি ১১:২৩।
(খ) ২ করি ১১:২৪-২৫।
(গ) ২ করি ৪:৮-৯ দ্রঃ।
(ঘ) ১ করি ৪:১১-১৩।

২৯ [৫] (ক) সাম ২৬:২।
(খ) প্রবচন ৩০:৯খ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) প্রবচন ৩০:৯ক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) ১ করি ১:৫।
(ঙ) ২ করি ১২:৭।
(চ) ২ বংশ ৩২:২৫-২৬।

২৯ [৬] (ক) সাম ৩৭:১৪।
(খ) প্রবচন ১৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) লুক ১৬:২২-২৪ দ্রঃ।
(ঘ) এফে ৫:৩ দ্রঃ।
(ঙ) কল ১:৫ দ্রঃ।

২৯ [৭] (ক) ১ করি ৩:১৭।
(খ) প্রবচন ৪:২৩ দ্রঃ।

২৯ [৮] (ক) মথি ৬:২।
(খ) যোহন ৫:৪৪।

২৯ [৯] (ক) যোব ৭:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) পরমগীত ২:৯-১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) সাম ১:২।
(ঘ) প্রবচন ১০:৩১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৯ [১০] (ক) ১ যোহন ৫:২০; যোহন ১:১৪, ইত্যাদি দ্রঃ।

২৯ [১১] (ক) লুক ২২:৪০; মথি ২৬:৪১; মার্ক ১৪:৩৮।
(খ) মথি ৭:১৮ দ্রঃ।

২৯ [১২] (ক) রো ১:২২-২৪।
(খ) রো ১:২২-২৪, ২৬-২৮।
(গ) 'যারা ঈশ্বরত্বকে দু'ভাগ করে …' তারা হলো সেই মার্কিওন পন্থী ভ্রান্তমতাবলম্বীরা যারা পুরাতন নিয়মের কড়া ও অমঙ্গলকর ঈশ্বরকে নূতন নিয়মের দয়াবান ও মঙ্গলময় ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বলে কল্পনা করত।
(ঘ) রো ১:২৪।
(ঙ) রো ১:২৬, ২৮।

২৯ [১৩] (ক) গণনা ১১:৪-৬।
(খ) গণনা ১১:১০।
(গ) গণনা ১১:১৮-২০।

২৯ [১৫] (ক) রো ১:২৩।
(খ) রো ১:২৪।
(গ) রো ১:২৬-২৭।
(ঘ) ইশা ৪:৪; মালা ৩২:১ দ্রঃ।
(ঙ) মথি ৫:২৫-২৬; লুক ১২:৫৮-৫৯ দ্রঃ।
(চ) ইশা ৪:৪।
(ছ) মালা ৩:২-৩।
(জ) রো ১:২৮।

২৯ [১৬] (ক) যাত্রা ৭:৩ ইত্যাদি দ্রঃ।
(খ) যাত্রা ৯:২৭।
(গ) প্রবচন ১:১৭ সত্তরী দ্রঃ।
(ঘ) সাম ৬৬:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) মথি ১০:২৯; লুক ১২:৬ দ্রঃ।
(চ) রো ১:২৪।
(ছ) রো ১:২৬।
(জ) রো ১:২৮।

২৯ [১৭] (ক) যোব ৪০:৮।
(খ) দ্বিঃবিঃ ৮:৩, ১৫, ২।

২৯ [১৮] (ক) আদি ৩:১, ৬।
(খ) আদি ৪:৬।
(গ) আদি ৯:২০-২৪।
(ঘ) হিব্রু ১২:১৫-১৬ দ্রঃ।
(ঙ) আদি ৩৯:৭ … দ্রঃ।

২৯ [১৯] (ক) ফিলি ৪:১৯।
(খ) রো ৮:২৮ দ্রঃ।

৩০ [১] (ক) লুক ১১:৪; মথি ৪:১৩।
(খ) লুক ১১:১।
(গ) এফে ৬:১১, ১২ দ্রঃ।
(ঘ) সাম ৩৪:২০।
(ঙ) ২ করি ৪:৮।
(চ) ২ করি ৪:৮।
(ছ) সাম ৪:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩০ [২] (ক) যোব ১:১২।
(খ) যোব ১:২২।
(গ) যোব ১:৯-১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঘ) যোব ২:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ঙ) যোব ২:১০।
(চ) যোব ২:৪-৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(ছ) যোব ২:১০।
(জ) মথি ৪:১-১১; মার্ক ১:১২-১৩; লুক ৪:১-১৩।

৩০ [৩] (ক) এফে ৬:১৬ দ্রঃ।
(খ) হো ৭:৬।
(গ) এফে ৬:১৬।
(ঘ) যোহন ৭:৩৮; ৪:১৪ দ্রঃ।

৩১ [১] (ক) ২ ও ৯:১ অধ্যায় দ্রঃ।
(খ) ১ তি ২:৮।
(গ) সাম ১৪১:২।
(ঘ) ১ তি ২:৮।
(ঙ) প্রজ্ঞা ১৬:২৮।

৩১ [৩] (ক) এফে ৩:১৪-১৫।
(খ) ফিলি ২:১০।
(গ) ফিলি ২:১০।
(ঘ) ইশা ৫৪:২৩।

৩১ [৪] (ক) মালা ১:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(খ) ১ তি ২:৮।
(গ) ১ করি ৭:৬।
(ঘ) ১ করি ৭:৫।

৩১ [৫] (ক) সাম ৩৪:৮।
(খ) আদি ৪৮:১৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।
(গ) তোবিত ১২:১২; ৩:১৬-১৭।
(ঘ) ১ করি ৫:৪।
(ঙ) এমনটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, প্রেরিতদূত পল এফেসস থেকেই করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখেছিলেন।

৩১ [৬] (ক) ইশা ১:১২, ১৫।
(খ) সাম ২৬:৪-৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩১ [৭] (ক) লুক ৮:১৮ দ্রঃ।

(খ) মার্ক ১১:২০-২১, ১৩-১৪; মথি ২১:১৮-১৯।

৩২ (ক) যোহন ১:৯।

৩৩ [২] (ক) সাম ১০৪:১-৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩৩ [৩] (ক) ২ শামু ৭:১৮-২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩৩ [৪] (ক) সাম ৩৯:৯।

(খ) সাম ৩৮:৬-৭।

৩৩ [৫] (ক) সাম ২৮:৩ সত্তরী পাঠ দ্রঃ।

৩৩ [৬] (ক) রো ১৬:২৭; হিব্রু ১৩:২১; গা ১:৫; ২ তি ৪:১৮।

৩৪ (ক) ফিলি ৩:১৩।

সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী

২৩৫ সালে রোম-সাম্রাজ্য খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে তীব্র নির্যাতন শুরু করলে অরিগেনেস তাঁর আপন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আম্ব্রোজ ও আলেক্সান্দ্রিয়ার পুরোহিত প্রতোক্তেতোসের সমীপে এই লেখা প্রেরণ করেন, যাতে নির্যাতনকালে গ্রেপ্তার হলে তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে খ্রিষ্টবিশ্বাস বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকেন। কেননা খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষে সাক্ষ্যমরণের চেয়ে আরও গৌরবময় মৃত্যু নেই।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১

প্রারম্ভিক বাণী

১। *‘তোমরা যাদের দুধছাড়া করা হয়েছে, মাতৃবক্ষ থেকে যাদের সরানো হয়েছে, সেই তোমরা এক একজন ক্লেশের উপরে ক্লেশ প্রতীক্ষা কর, প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা প্রতীক্ষা কর—আর ক্ষণিকের মধ্যে, আর ক্ষণিকের মধ্যে, ওষ্ঠের অবজ্ঞা দ্বারা, অন্য ভাষায়’*(ক)।

কিন্তু তোমরা, হে অধিক ঈশ্বরভীরু আম্ব্রোজ ও অধিক ভক্তপ্রাণ প্রতোক্তেতোস, তোমরা তো *আর মাংসময় মানুষ বা খ্রিষ্টে শিশু নও* (খ), তোমরা বরং তোমাদের আধ্যাত্মিক *বয়সে বেড়ে উঠেছ* (গ), ফলে তোমাদের আর *দুধ নয়, গুরুপাক খাদ্যই প্রয়োজন* (ঘ)। ইশাইয়া দ্বারা যারা ‘দুধছাড়া’ ও ‘মাতৃবক্ষ থেকে সরানো’ বলে অভিহিত হয়েছে, তাদের মত তোমরা এবার শোনো কেমন করে দুধছাড়া প্রতিযোগীদের জন্য একটা ক্লেশ শুধু নয়, কিন্তু ‘ক্লেশের উপরে ক্লেশ’ এর কথাই পূর্বঘোষণা করা হচ্ছে। যে কেউ ‘ক্লেশের উপরে ক্লেশ’ অস্বীকার করবে না বরং সুযোগ্য প্রতিযোগীর মত তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে, সে সেইসঙ্গে সেই ‘প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা’ও সাগ্রহে গ্রহণ করবে যা

'ক্লেশের উপরে ক্লেশ' এর কিছুক্ষণ পরে উপভোগ করবে। কেননা এটাই হলো সেই 'আর ক্ষণিকের মধ্যে, আর ক্ষণিকের মধ্যে,' কথাগুলোর অর্থ।

২। তাছাড়া, পবিত্র শাস্ত্রের ভাষার সঙ্গে অপরিচিত যারা, তারা যদি আমাদের ভক্তিহীন বা নির্বোধ বলে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করত, তাহলে এসো, এমনটা স্মরণ করি যে, 'ক্ষণিকের মধ্যে' যে 'প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা' আমাদের মঞ্জুর করা হবে, তা 'ওষ্ঠের অবজ্ঞা দ্বারা, অন্য ভাষায়' মঞ্জুর করা হবে। এবং এমন কেইবা থাকবে যে, 'প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা'ও অবিলম্বে সাগ্রহে গ্রহণ করার লক্ষ্যে 'ক্লেশের উপরে ক্লেশ' সাগ্রহে গ্রহণ করবে না? তেমন মানুষ পলের সঙ্গে এবিষয়ে একমত হবে যে, *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট* (যা দিয়ে, বলতে গেলে, আমরা সুখ ক্রয় করি) *তুলনার যোগ্য নয়* (ক), বিশেষভাবে এই কারণে যে, 'আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার' তাদেরই জন্য 'লঘু' বলে চিহ্নিত যারা বর্তমানকালীন দুখঃকষ্টে ভারাক্রান্ত নয়, কেননা সেই যে *ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী অতি গুরুতর ভার অর্জন করছে* (খ), সেই লঘু ভারকে এ গুরুতর ভার দ্বারা একেবারে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়। তেমনটা তখনই ঘটবে যদি, আমাদের নির্যাতকেরা আমাদের আত্মার উপরে, বলতে গেলে, চাপ দিতে ইচ্ছা করতে করতে, আমরা আমাদের মন দুঃখকষ্ট থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের বর্তমানকালীন দুঃখকষ্টের দিকে নয়, বরং তাদেরই জন্য রাখা সেই পুরস্কারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে যারা এই সমস্ত পরীক্ষা সহিষ্ণুতার সঙ্গে বরণ করায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে খ্রিষ্টে সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে লড়াই করেছে (গ)। ঈশ্বর আপন উপকার বৃদ্ধি করেন, ও যে লড়াই করে তার কষ্টের জন্য যা প্রাপ্য, সেটার চেয়ে তিনি বহুগুণেই প্রদান করেন, কেননা সামান্যতম ব্যাপারে কার্পণ্য করেন না এমন ঈশ্বর হিসাবে তাঁর পক্ষে প্রদান করা যেমন ন্যায্য, তেমনি, যারা সাধ্যমত নিজেদের 'মাটির পাত্র'((ঘ) অবজ্ঞা করায় সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসে বলে প্রমাণ দিয়েছে, তিনি নিজের বদান্যতায় যে কেমন করে তাদের জন্য নিজের মঙ্গলদান বৃদ্ধি করবেন তেমনটা জানা-ও তাঁর পক্ষে ন্যায্য।

৩। আর আমি মনে করি যে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তারাই ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করতে মহৎ আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মাকে কেবল পার্থিব দেহ থেকে নয়, কিন্তু দৈহিক যত কিছু থেকেও সরিয়ে নেয় ও পৃথক করে; আর যখন সময় এমনটা দেবে যে, যা কিছু মৃত্যু বলে গণ্য, তারা সেই মৃত্যু-পরিণামী দেহকে ত্যাগ করবে, তখন নিজেদের 'হীনাবস্থার দেহটা'((ক) ছেড়ে দেওয়ায়ও তাদের কোন টানাটানি হয় না, ও সেই বাণী শুনতে পাবে যা বিষয়ে প্রেরিতদূত প্রার্থনা করেছিলেন, *দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে?* (খ)। কেননা *ক্ষয়শীল দেহ দ্বারা চাপ-প্রাপ্ত হয়ে* (গ) যারা *এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছে* (ঘ), তাদের মধ্যে কেইবা সর্বপ্রথমে এ বলে ধন্যবাদ জানাবে না, 'কে আমাকে নিস্তার করবে?' আর সেই ব্যক্তি যখন দেখে, তেমন স্বীকারোক্তি দ্বারা তাকে 'মৃত্যু-পরিণামী দেহ' থেকে নিস্তার করা হয়েছে, তখন সে এই পবিত্র উক্তিও উচ্চারণ করে বলে উঠবে, *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারাই* (ঙ)। যে কেউ মনে করে, এসব কিছু তার পক্ষে কঠিন, তার মানে হলো যে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই '*সর্বশক্তিমান জীবনময় ঈশ্বরের জন্য*' কখনও '*তৃষাতুর*' হয়নি, '*হরিণ যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল*', সে '*তেমনি ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষায়*' কখনও '*ব্যাকুল*' হয়নি, ও '*কবে যাব আমি, কবে দেখতে পাব ঈশ্বরের শ্রীমুখ?*'(চ) কথাও কখনও উচ্চারণ করেনি। তাছাড়া সে মনে মনে তাও ভাবেনি যা নবী তখন ভেবেছিলেন যখন কেউ না কেউ তাঁকে বলেছিল, '*কোথায় তোমার ঈশ্বর?*' তিনি '*প্রতি দিন*' নিজেই নিজের '*প্রাণ উজাড় করে দিতেন*', ও নিজের দুর্বলতায় অবসন্ন ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণে বারে বারে নিজেকে তীব্রভাবে তিরস্কার করে বলতেন, '*উল্লসিত কণ্ঠে ও উৎসব-মুখর হর্ষধ্বনিতে ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে আমি ঈশ্বরের গৃহ পর্যন্ত সেই চমৎকার তাঁবু-স্থানে প্রবেশ করব*'(ছ)।

৪। সুতরাং আমি তোমাদের অনুরোধ করি যেন তোমরা তোমাদের বর্তমান সমস্ত লড়াইতে স্বর্গে তাদেরই জন্য সঞ্চিত সেই প্রচুর মজুরির কথা স্মরণ কর যারা ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত ও নিন্দিত; এবং যেমন একসময় প্রেরিতদূতেরা যিশু-নামের খাতিরে *অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন বলে আনন্দ* (ক) করেছিলেন, তেমনি তোমরাও যেন মানবপুত্রের জন্য *আনন্দ কর ও নেচে ওঠ* (খ)। আর যদি কোন সময়

তোমরা নিজেদের প্রাণ সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে বোধ কর, তাহলে আমাদের অন্তরে খ্রিষ্টের যে মনোভাব রয়েছে (গ), সেই মনোভাব বলে উঠুক, *প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি? কেন আমাকে অস্থির করছ? ঈশ্বরের প্রত্যাশায় থাক, কারণ আমি আবারও তাঁর স্তুতিবাদ করব* (ঘ)। আমি প্রার্থনা রাখি যেন আমাদের প্রাণ কখনও অস্থির না হয়; এমনকি আরও প্রার্থনা রাখি যেন বিচারালয়ের সাক্ষাতে ও আমাদের ঘাড়ের উপরে রাখা নিষ্কোষিত খড়্গের সাক্ষাতেও আমাদের প্রাণ *ঈশ্বরের সেই শান্তি দ্বারা সংরক্ষিত থাকে যা সমস্ত ধারণার অতীত* (ঙ), এবং *যারা দেহ থেকে প্রবাসী* বলে গণ্য *তারা বিশ্বপ্রভুর সঙ্গে বসবাস করে* (চ) একথা ভেবে আমাদের প্রাণ যেন শান্তি ফিরে পায়। কিন্তু আমরা প্রাণের শান্তি সবসময় রক্ষা করতে সক্ষম না হলে, তবে কমপক্ষে যেন আমাদের প্রাণের অস্থিরতা ব্যক্ত না হয় বা পৌত্তলিক দর্শকদের সামনে প্রকাশ না পায়, যাতে করে আমরা তখন ঈশ্বরের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পেতে পারি যখন তাঁকে বলব, *হে আমার ঈশ্বর, আমার মধ্যে আমার প্রাণ অস্থির* (ছ)। ঐশবাণী সেই কথাও স্মরণ করতে আমাদের পরামর্শ দেন যা ইশাইয়াতে এভাবে ব্যক্ত, *মানুষের অপমান ভয় করো না, তাদের বিদ্রূপে উদ্বিগ্ন হয়ো না* (জ)। কেননা যেহেতু ঈশ্বর স্পষ্টভাবেই আকাশমণ্ডলের গতি ও আকাশমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, সেসমস্ত কিছুরও গতির উপরে, এবং পৃথিবীতে ও সমুদ্রে যা কিছু সম্পাদন করা হয় সেসমস্ত কিছুর উপরেও, তথা ভিন্ন ভিন্ন সকল জন্তু ও গাছগাছালির জন্ম, উদ্ভব, খাদ্য ও বৃদ্ধির উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, সেজন্য আমাদের চোখ বন্ধ রেখে ঈশ্বরের দিকে না তাকিয়ে বরং যারা অল্পক্ষণের মধ্যে মরবে ও যাদের নিজ নিজ কাজকর্ম অনুযায়ী বিচারের হাতে তুলে দেওয়া হবে, ভয়েতে তাদেরই দিকে চোখ ফেরানো নির্বুদ্ধিতা স্বরূপ (ঝ)।

৫। একসময় ঈশ্বর দ্বারা আব্রাহামকে বলা হয়েছিল, *তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাও* (ক); কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের হয় তো বলা হবে, 'গোটা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাও'; ও ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়া ভাল, যাতে করে তিনি আজও আমাদের সেই স্বর্গসমূহ দেখাতে পারেন যেখানে সেই স্বর্গ রয়েছে যাকে স্বর্গরাজ্য বলা হয়। আপাতত আমরা এমনটা দেখতে পাই যে, জীবন নানা লড়াইতে পূর্ণ ও বহু গুণাবলি অর্জনের লক্ষ্যে নানা প্রতিযোগীতেও পূর্ণ; এমনকি ঈশ্বরের স্বত্বাংশের (খ) বাইরের বহুজন সম্পর্কে এমনটা

মনে হবে তারা আত্মসংযমের জন্য লড়াই করেছে, অন্য অন্য কেউ সম্পর্কে এমনটা মনে হবে তারা বিশ্বপ্রভুর সঙ্কল্প পালন করায়ই সাহসের সঙ্গে মারা গেছে। যারা যুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপার অনুসন্ধান করতে দক্ষ, তাদের বেলায় এমনটা মনে হতে পারবে, তারা সদ্‌জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিল, আর যাদের অভিপ্রায় ছিল ধর্মসম্মত জীবন যাপন করা, তাদের বেলায় এমনটা মনে হতে পারবে, তারা ধর্মময়তায় নিজেদের সঁপে দিয়েছিল। ‘*মাংসে আকর্ষণ*’[গ] ও সেইসঙ্গে যারা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে তাদের অনেক কার্যক্ষমতাও গুণাবলির এক একটার জন্য যুদ্ধে নামে; কিন্তু সত্যকার ধর্মের খাতিরে লড়াইতে যোগ দেয় যারা, তারা হলো *সেই মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজক-সমাজ, পবিত্র জনগণ, এমন জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন* [ঘ]। অন্য অন্য মানুষ রয়েছে যারা এমনটাও দেখায় না যে, ভক্তপ্রাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধলে তারা ধর্ম-ছাড়া-জীনের চেয়ে নিজেদের ধর্মের জন্য মৃত্যু বেছে নিয়ে নিজেদের ধর্মের জন্য মরতে সম্মত হবে। কিন্তু যারা সেই মনোনীত বংশের মানুষ হতে বাসনা করে, তারা এক একজন প্রতিটি ক্ষণে এমনকি যারা নিজেদের বহুঈশ্বরবাদী বলে দেখায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক তারা যখন তার বিরুদ্ধ চক্রান্ত করে, তখনও সে এবিষয়ে নিশ্চিত যে, তাকে ঈশ্বরকে শুনতে হবে যিনি বলেন, *আমার সামনে তোমার কোন দেবতা থাকবে না* ও *তোমরা হৃদয়েও অন্য দেবতাদের নাম উল্লেখ করবে না, তোমাদের মুখেও তাদের নাম উচ্চারণ করবে না* [ঙ]। এইজন্য তেমন মানুষেরা *ধর্মময়তা লাভের জন্য হৃদয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁকে মুখে স্বীকার করে* [চ], কেননা তারা উপলব্ধি করে যে, হৃদয়ে এভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলে তারা ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত হতে পারবে না, ও তাদের কথন সেই মনোভাব অনুযায়ী না হলে তারা নিজেরাও পরিত্রাণ পেতে পারবে না। কেননা খ্রিষ্টে লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে যারা এমনটা মনে করে যে, ‘পরিত্রাণ লাভের জন্য মুখে স্বীকার করা’ যোগ না করলেও ‘ধর্মময়তা লাভের জন্য হৃদয়ে বিশ্বাস’ করা-ই যথেষ্ট, তারা নিজেদের ভোলায়। এমনকি এটাও বলা যেতে পারে যে, যার হৃদয় ঈশ্বর থেকে দূরে রয়েছে [ছ], হৃদয়ে ঈশ্বরকে সম্মান করা ও মুখে পরিত্রাণ লাভের জন্য স্বীকার না করার চেয়ে তার পক্ষে ওষ্ঠে তাঁকে সম্মান করা-ই ভাল।

প্রতিমাপূজা ও বিশ্বাস-অস্বীকার বিষয়ে সাবধান

৬। এমনটা মনে হতে পারে যে, যিনি আজ্ঞা করেন, *'তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না, কোন বস্তুর সাদৃশ্যও তৈরি করবে না'*, ইত্যাদি [ক], তিনি *'তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না'* ও *'সেগুলির উপাসনা করবে না'*[খ] বাক্য দু'টোর মধ্যে পার্থক্য রাখেন [গ]; তবে, সেই অনুসারে, যে কেউ মূর্তিগুলোতে সত্যি বিশ্বাস করে সে হয় তো সেগুলোকে উপাসনা করতে পারে, কিন্তু যে কেউ সেগুলোকে বিশ্বাস করে না কিন্তু যাতে অধিকাংশ অন্যান্য লোকের মত সেও ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারে সেইলক্ষ্যে কাপুরুষত্বের কারণে (ও তেমন কাপুরুষত্বকে সে 'অবস্থা-পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বভাব' বলে থাকে) সেগুলোকে উপাসনা করার ভান করে, সে মূর্তিগুলোকে উপাসনা করে না কিন্তু এমনি সেগুলোর সামনে প্রণিপাত করে। তেমনটা হলে তবে আমি বলতে পারতাম যে, যারা বিচারালয়ে শপথ ক'রে বা বিচারে আনীত হবার আগেও খ্রিষ্টধর্ম অস্বীকার করে, তারা যখন প্রভু ঈশ্বরের নাম থেকে 'ঈশ্বর' নামটা নিয়ে তা অসার ও নির্জীব পদার্থে আরোপ করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে উপাসনা করে না কিন্তু এমনিই দেব-দেবীর সামনে প্রণিপাত করে। তাই মোয়াব-কন্যাদের সঙ্গে যারা কলঙ্কিত হয়েছিল [ঘ], সেই লোকেরাও প্রতিমার সামনে প্রণিপাত করেছিল কিন্তু প্রতিমাপূজা করেনি। ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে শাস্ত্র স্পষ্ট বলে যে, *সেই মেয়েরা নিজেদের দেবতাদের উদ্দেশে উদ্‌যাপিত বলিদানে সেই লোকদের আমন্ত্রণ করল, আর জনগণ সেই বলিদানে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ খেল ও তাদের পুতুলগুলোর সামনে প্রণিপাত করল ও বেয়েলফেগোরের উদ্দেশে দীক্ষিত হল* [ঙ]। লক্ষ কর, শাস্ত্র এমনটা বলে না যে, 'আর লোকেরা তাদের পুতুলগুলোকে উপাসনা করল', কেননা যে মেয়েদের সঙ্গে তারা ব্যভিচার করছিল, তত মহৎ চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণের পরে তাদের পক্ষে সেই মেয়েদের দ্বারা এক মুহূর্তেই প্ররোচিত হয়ে প্রতিমাগুলোকে ঈশ্বর বলে গণ্য না করা সম্ভব ছিল না। এমনটা হতে পারে যে, যাত্রাপুস্তকে সেই বাছুর সংক্রান্ত বর্ণনায়ও তারা ঠিক সেইভাবে ব্যবহার ক'রে এমনিই প্রণিপাত করেছিল কিন্তু তাদের তৈরী বাছুরটাকে উপাসনা করেনি [চ]।

সুতরাং বর্তমান প্রলোভনও ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার পরীক্ষা ও যাচাই বলে গণ্য করতে হবে, যেইভাবে দ্বিতীয় বিবরণে লেখা রয়েছে, *তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাস কিনা, তা জানবার জন্যই প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করছেন* (ছ); কিন্তু প্রলোভনের সম্মুখীন হয়ে '*তোমরা, তোমাদের ঈশ্বর প্রভু যিনি, তাঁরই অনুগামী হবে, তাঁকেই ভয় করবে ও তাঁরই আজ্ঞাগুলো পালন করবে*', (বিশেষভাবে, '*আমাকে ছাড়া তোমার কোন দেবতা থাকবে না*' আজ্ঞাটাই পালন করবে); আর তখনই *তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও তাঁকেই আঁকড়িয়ে ধরবে* (জ) যখন তিনি এখানকার স্থান থেকে তোমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে, প্রেরিতদূতের কথামত, *ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বৃদ্ধিক্রমে* (ঝ) নিজের সঙ্গে যুক্ত করবেন।

৭। কিন্তু, যখন প্রতিটি মন্দ কথা তোমার ঈশ্বর প্রভুর কাছে জঘন্য কর্ম স্বরূপ (ক), তখন কতই না বড় জঘন্য কর্ম হবে (খ) অস্বীকারোক্তির মন্দ কথা ও অন্য দেবতাকে ডাকবার মন্দ কথা, ও সেই যে ভাগ্য-দেবেরই দিব্যি দিয়ে মন্দ শপথ যে ভাগ্য প্রকৃতপক্ষে অসার কথা মাত্র। তেমন কিছু আমাদের কাছে দাবীকৃত হলে আমাদের সেই একজনের কথা স্মরণ করতে হবে যিনি এশিক্ষা দিয়েছিলেন, *কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আদৌ শপথ করো না* (গ)। কেননা যখন '*স্বর্গের দিব্যি দিয়ে*' যে শপথ করে সে '*ঈশ্বরের সিংহাসনের*' নিন্দা করে, '*পৃথিবীর দিব্যি দিয়ে*' যে শপথ করে সে যাকে ঈশ্বরের '*পাদপীঠ*' বলা হয় তা দেবতা করায় ভক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম সাধন করে, '*যেরুশালেমের দিব্যি দিয়ে*' যে শপথ করে সে পাপ করে যেহেতু সেটা হলো '*মহান রাজার নগরী*', ও '*নিজের মাথার দিব্যি দিয়ে*'(ঘ) যে শপথ করে সে অপরাধ করে, তখন কারও ভাগের দিব্যি দিয়ে শপথ করা আর কতই না গুরুতর পাপ বলে গণ্য হবে! তাই আমাদের সেই বচন স্মরণ করতে হবে যা অনুসারে *মানুষ যত ভিত্তিহীন কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রত্যেকটার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে* (ঙ), কেননা অস্বীকারোক্তিতে উচ্চারিত শপথের চেয়ে আর কোন্ কথা বেশি ভিত্তিহীন?

কিন্তু এমনটা হতে পারে যে, সেই শত্রু চালাকি করে নিজের প্রভাব দ্বারা *সূর্যের বা চাঁদের বা আকাশের তারকা-বাহিনীর কারও উদ্দেশে প্রণিপাত* (চ) করতে আমাদের প্ররোচিত করতে ইচ্ছা করবে; আচ্ছা, এক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে যে, ঈশ্বর তেমনটা

করতে আজ্ঞা করেননি; কেননা যখন স্রষ্টা উপস্থিত আছেন, আমাদের প্রয়োজন দেখেন ও সকলের প্রার্থনার আগেও সাড়া দেন, তখন আমাদের কোন সৃষ্টবস্তুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে নেই। বস্তুত যারা '*প্রভুর স্বত্বাংশ*'(ছ) সূর্য নিজেই তাদের উপাসনার পাত্র হতে ইচ্ছা করে না; এমনকি, সম্ভবত সূর্য অন্য কারও উপাসনার পাত্র হতে চায় না, বরং সে তাঁরই অনুকরণ করে যিনি বলেছিলেন, '*আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি সেই পিতা ঈশ্বর*'(জ)। কেমন যেন সূর্যের উদ্দেশে যে কেউ প্রণিপাত করতে চাইত তাকে সূর্য বলত: "তুমি আমাকে দেবতা বলে ডাক কেন? সত্যকার ঈশ্বর একজন মাত্র রয়েছেন; তবে তুমি আমার উদ্দেশে প্রণিপাত করতে চাও কেন? কেননা *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে ও কেবল তাঁরই উপাসনা করবে* (ঝ)। আর আমি, আমি তো একটা সৃষ্টবস্তু মাত্র; তাই যে উপাসনা করে তাকে তুমি উপাসনা করতে চাও কেন? কেননা আমিও পিতার উদ্দেশে প্রণিপাত করি ও তাঁরই উপাসনা করি। এবং তাঁর প্রতি বাধ্যতা গুণে আমি অসারতায় বশীভূত, তাঁরই কারণে যিনি প্রত্যাশায়ই আমাকে বশীভূত করেছেন। হ্যাঁ, যদিও আপাতত আমি ক্ষয়শীল দেহে পরিবৃত, তবু আমি অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হব ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য"(ঞ)।

৮। আমাদের অভক্তির একটা নবীরও প্রতীক্ষায় থাকতে হবে; এমনকি, হয় তো একজনমাত্র নয় বরং বহুজন নবীরও প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। সেই নবীরা আমাদের এমন বাণী দেবে যা প্রভুরই বাণী যেন, কিন্তু সেই বাণী এমন যা প্রভু দিতে আজ্ঞা করেননি (ক), সেই নবীর প্রজ্ঞার বাণীটা এমন যা প্রজ্ঞার বাণীর (খ) চেয়ে একেবারে অন্য ধরনের বাণী, যাতে করে সে নিজের মুখের খড়্গ দ্বারা আমাদের খুন করতে পারে। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে, পাপী যখন আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটে, তখন এসো, আমরা বলি, *বধিরের মত আমি তো শুনি না, আমি বোবারই মত যে খোলে না মুখ; আমি তেমন মানুষের মত হয়েছি যে কিছুই শোনে না* (গ)। কেননা যারা হীন ধরনের কথা বলে যখন তাদের সংশোধন করার কোন আশা আমাদের থাকে না, তখন অভক্তির কথার প্রতি বধির হওয়া উত্তম।

৯। এবং যে সময় আমরা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে আহূত, তখন আমাদের পক্ষে সেটাই বোঝা উপকারী যা ঈশ্বর এ বলে আমাদের শেখাতে ইচ্ছা করেন, *তোমার ঈশ্বর প্রভু এই আমি, আমি এমন ঈশ্বর যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না* (ক)। আমি মনে করি, ব্যাপারটা কেমন যেন একটা বরের মত যে নিজের কনের প্রতি সমস্ত মনোযোগ দেন যাতে কনে সবদিক দিয়ে বরের সঙ্গে ভক্তি সহকারে জীবনযাপন করে ও বরের সঙ্গে বাদে অন্য কারও সঙ্গে মেলামেশা না করার জন্য একেবারে সতর্ক। তাতে বর প্রজ্ঞাবান হলে তবে এমন অন্তর্জ্বালা দেখায় যা উপযুক্ত ভাবে কনের সঙ্গে ব্যবহার করায় ঔষধের মত কাজ করবে। সেই অনুসারে, বিধানকর্তা যিনি, সেই একজনও, বিশেষভাবে তখনই যখন দেখা যাচ্ছে যে সেই একজন হলেন *নিখিল সৃষ্টির সেই প্রথমজাতজন* (খ), তিনি আপন কনে সেই আত্মাকে বলেন যে, ঈশ্বর কোন প্রতিপক্ষকে মানেন না, আর এইভাবে তাঁকে শোনে যারা, তাদের তিনি অপদূতদের ও তথাকথিত দেব-দেবীর সঙ্গে ব্যভিচার করা থেকে দূরে রাখেন। অন্য দেব-দেবীর সঙ্গে যেকোন প্রকারে ও যেকোন সময়ে ব্যভিচার করতে গিয়েছে যারা, কোন প্রতিপক্ষকে মানেন না তেমন ঈশ্বর বলেই তিনি তাদের বলেন, *যা ঈশ্বর নয়, তা দ্বারাই ওরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাল, নিজ নিজ প্রতিমা দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল; তাই আমিও এমন লোকদের দ্বারা ওদের অন্তর্জ্বালা জন্মাব যারা এক জাতিও নয়, মূর্খই এক জাতি দ্বারা ওদের ক্ষুব্ধ করে তুলব। কেননা আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল ও সেই গভীর পাতাল পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে* (গ)।

১০। আর বর প্রজ্ঞাবান ও দুর্মতি-মুক্ত হওয়ায় যদি এমনটাও নয় যে তিনি নিজের খাতিরেই আপন কনেকে সমস্ত মলিনতা থেকে ফেরাতে সচেষ্ট, তবু কনের খাতিরেই তা করতে সচেষ্ট, কেননা তিনি তার মলিনতা ও জঘন্যতা দেখেন বিধায়ই ব্যভিচার থেকে তাকে দূরে সরাবার জন্য উপযোগী কথা দিয়ে তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে উদ্দেশ ক'রে তাকে নিরাময় করার জন্য ও ফেরাবার জন্য যা কিছু করা দরকার, তাঁর সাধ্যমত সেইসব কিছু করবেন। আর যে আত্মা অন্য এক দেবতাকে ডাকবে ও যিনি সত্যকার একমাত্র ঈশ্বর ও অনন্য প্রভু তাঁকে অস্বীকার করবে, তখন তোমার মতে কি সেই আত্মার পক্ষে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক থাকতে পারে? যাই হোক, আমি মনে করি যে, যেমন *বেশ্যার সঙ্গে যে*

মিলিত হয়, সে তার সঙ্গে একদেহ হয় [ক], তেমনি কোন না কোন দেবতাকে যে স্বীকার করে, বিশেষভাবে যে তেমনটা তখনই করে যখন বিশ্বাস পরীক্ষা ও যাচাই করা হচ্ছে, সে যাকে স্বীকার করে তার সঙ্গে একীভূত ও মিলিত হয়। আর যে অস্বীকার করে, সে তার নিজের অস্বীকার দ্বারা কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারাই তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যাঁকে সে অস্বীকার করে; হ্যাঁ, সে অঙ্গচ্ছেদ ভোগ করে ও যাঁকে অস্বীকার করেছে, তাঁর কাছ থেকে উচ্ছিন্ন হয়। তাই যে স্বীকার করে সে যখন স্বীকৃত হয়, ও যে অস্বীকার করে সে যখন অস্বীকৃত হয়, তখন ভেবে দেখ ব্যাপারটা কেমন অপরিহার্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত ও তেমন কর্মের আবশ্যকীয় ফলাফল; আর সেইজন্য লেখা রয়েছে, *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; [কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব]* [খ]। এমনকি, যে স্বীকার করে ও যে অস্বীকার করে, তাদের উভয়কে উদ্দেশ করে স্বয়ং বাণী ও স্বয়ং সত্য একথা বলতে পারেন, "*তোমরা যে পরিমাপে দেবে, সেই পরিমাপে ফিরে পাবে* [গ]। তাই তুমি যে আমাকে স্বীকার করায় নিজের স্বীকারোক্তির পরিমাপ দিয়েছ ও তোমার স্বীকারোক্তির পরিমাপ পূর্ণ করেছে [ঘ], সেই তুমি আমার কাছ থেকে আমার স্বীকারোক্তির পূর্ণ পরিমাপে, *ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই পাবে ও তা তোমার কোলে ফেলে দেওয়া হবে* [ঙ]। কিন্তু তুমি যে আমাকে অস্বীকার করায় তোমার অস্বীকারের পরিমাপ দিয়েছ, তোমার সেই অস্বীকারের অনুপাতে তোমার বিষয়ে আমার অস্বীকারের পরিমাপ ফিরে পাবে।"

বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকা

১১। এসো, আমরা একইভাবে অনুসন্ধান করি কেমন করে আমাদের স্বীকারোক্তির পরিমাপ পূর্ণ বা অপূর্ণ বা অপরদিকে অভাবী হতে পারে। যে দিয়াবল আমাদের সাক্ষ্যমরণ বা আমাদের সিদ্ধতালাভের বিরোধী আচরণ করতে আমাদের প্ররোচনা করায় অস্বীকারের মন্দ চিন্তা বা সন্দেহ বা সম্ভাব্য অন্য যেকোন যুক্তি দ্বারা আমাদের কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা করে, আমরা যদি পরীক্ষা বা প্রলোভনের সময়ে তাকে আমাদের অন্তরে

স্থান না দিই; তাছাড়া আমরা যদি আমাদের স্বীকারোক্তির অসঙ্গত কোন কথা দ্বারা নিজেদের দূষিত না করি; ও যদি আমরা আমাদের বিপক্ষদের যেকোন নিন্দা, বিদ্রূপ, হাসাহাসি, অপবাদ সহ্য করি এমনকি ওদের সেই দয়াও সহ্য করি যে দয়া ওরা মনে মনে সেইজন্যই আমাদের প্রতি টের পাচ্ছে যেহেতু ওদের বিবেচনায় আমরা ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ও নির্বোধ, ও সেই অনুসারে ওরা আমাদের প্রতারিত বলে ডাকে; ও তাছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েদের বা তাদের মায়ের বা আমাদের জীবনে যাদের প্রিয়জন বলে গণ্য করি তাদেরও প্রতি আমাদের স্নেহ-মমতা দ্বারা তাদের সঙ্গে আসক্ত থাকতে ও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে আকর্ষিত হয়ে যদি আমরা আমাদের সঙ্কল্প থেকে সরে না পড়ি বরং সেই সমস্ত বন্ধনের প্রতি বিমুখ হয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই হই ও তাঁর সেই জীবনের হাতে নিজেদের তুলে দিই যে-জীবন তাঁর সঙ্গে ও তাঁর সান্নিধ্যেই সেইভাবে যাপিত জীবন যেভাবে তারা সেই জীবন যাপন করবে যারা তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রের সঙ্গে ও তাঁর সহভাগীদের (ক) সঙ্গে একাত্মতার অধিকারী হবে, তাহলেই আমরা বলতে পারব, আমাদের স্বীকারোক্তির পরিমাপ পূর্ণ করেছি। কিন্তু আমরা সেই সমস্ত শর্তের একটারও অভাবী হলে তবে আমরা সেই পরিমাপ পূর্ণ না করে তা বরং কলঙ্কিত করেছি ও আমাদের স্বীকারোক্তিতে অসঙ্গত কিছু না কিছু মিশিয়ে দিয়েছি। তেমন অবস্থায় আমরা তাদেরই মত হব যারা ভিত্তির উপরে কাঠ বা ঘাস বা খড় দিয়ে গাঁথে (খ)।

১২। আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, যাকে ঈশ্বরের সন্ধি বলে, আমরা তা তখনই তাঁর সঙ্গে স্থির করা শর্তসমূহ হিসাবে গ্রাহ্য করেছি যখন খ্রিষ্টীয় জীবন ধারণ করব বলে সিদ্ধান্ত করেছিলাম। এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের তেমন শর্তগুলোর মধ্যে ছিল সুসমাচারে উপস্থাপিত সেই গোটা জীবনধারণ যা সম্পর্কে সেই সুসমাচার বলে, *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে* (ক)। আর আমরা তখনই আরও উৎসাহিত হয়ে উঠি যখন শুনি, *বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের*

বিনিময়ে কী দিতে পারবে? কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন [খ]।

একজনকে যে নিজেকে অস্বীকার করতে হবে ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে, একথা যে শুধু আমাদের উল্লিখিত মথির পাঠ্যাংশে লেখা তা নয়, কিন্তু লুক ও মার্কেও একই কথা লেখা আছে। লুক যা বলেন তা-ই শোনো, *তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং* [গ] *নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে-ই তা বাঁচাবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় করে নিজেকে হারায় বা নিজের বিনাশ ঘটায়, তাতে তার কী লাভ হবে?* [ঘ]; এবং মার্ক বলেন, *নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ* [ঙ] *সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে* [চ]।

অতএব, বহু দিন আগেই আমাদের পক্ষে নিজেদের অস্বীকার করে একথা বলা উচিত ছিল, *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়* [ছ]। তবে এখন দেখা যাক আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্রুশ তুলে নিয়ে যিশুর অনুসরণ করেছি কিনা; তেমনটা হয় যদি 'আমাদের অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্ট জীবনযাপন করেন'। আমাদের প্রাণকে প্রাণের চেয়ে উত্তম কিছু বলে ফিরে পাবার লক্ষে যদি আমরা আমাদের প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছা করি, তাহলে এসো, আমাদের সাক্ষ্যমরণের দ্বারাই তা হারাই। কেননা খ্রিষ্টের খাতিরে মৃত্যুতে নিজেদের প্রাণকে তাঁর পায়ে ফেলে আমরা যদি খ্রিষ্টের খাতিরে তা হারাই, তাহলে আমরা আমাদের সেই প্রাণের জন্য সত্যকার পরিত্রাণ অর্জন করব; কিন্তু বিপরীত ব্যবহার করলে তবে আমরা এমনটা শুনব যে, যে কেউ নিজেকে হারানোতে ও বিনাশ করায় সমগ্র ইন্দ্রিয়যোগ্য জগৎকে জয় করেছে, তার পক্ষে তাতে কোন লাভ হয় না; এবং যে কেউ একবার নিজের প্রাণ হারায় বা বিনাশ করে, সে যদিও সমগ্র জগৎকে জয় করে তবু সে তার সেই হারানো প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিমূল্য হিসাবে কিছুই দিতে

সক্ষম হবে না। কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট প্রাণ [জ] বস্তুগত সমস্ত কিছুর চেয়েও অধিক মূল্যবান। কেবল তিনিই আমাদের একবার হারানো প্রাণের জন্য বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছেন, যিনি আপন মূল্যবান রক্তমূল্যে [ঝ] আমাদের মুক্ত করেছেন।

১৩। গভীরতর উপলব্ধি ক্রমে ইশাইয়া বলেন, *তোমার মুক্তিমূল্য হিসাবে আমি মিশরকে দিয়েছি, ইথিওপিয়া ও সিয়েনেনকে তোমার বদলে দিয়েছি, কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে মূল্যবান* [ক]। তোমরা এই পদের ও অন্যান্য পদেরও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জানতে পারবে যদি খ্রিষ্টে শিখতে ও '*আয়নায় ও ঝাপসা ঝাপসাই*' দেওয়া শিক্ষা অতিক্রম করতে, ও ফলত যিনি তোমাদের আহ্বান করেন তাঁর কাছে শীঘ্রই চলতে বাসনা কর; তবেই, যেহেতু তোমরা আগে কখনও '*মুখোমুখি হয়ে*'[খ] জাননি, সেজন্য তোমরা স্বর্গস্থ পিতা ও গুরুর বন্ধু হিসাবেই জানতে পারবে। কেননা বন্ধু যারা, তারা তো ঝাপসা ঝাপসাই শিক্ষা দ্বারা নয়, বরং দৃশ্যগত রূপ ও বাক্যহীন, প্রতীকবিহীন ও প্রতিচ্ছবিহীন প্রজ্ঞা দ্বারাই শেখে; আর তেমনটা তখনই সম্ভব হবে যখন তারা বোধগম্য বস্তুগুলোর প্রকৃতি ও সত্যের সৌন্দর্যের নাগাল পাবে। যদি এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে পলকে তৃতীয় স্বর্গে ও পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ও তিনি অকথনীয় এমন কথা শুনেছিলেন যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই [গ], তাহলে এর ফলে তোমরাও উপলব্ধি করবে যে, যে অকথনীয় কথা পলকে প্রকাশ করা হয়েছিল ও যা শোনার পর তিনি সেই তৃতীয় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন, সেই কথার চেয়ে তোমরা সাথে সাথে আরও বেশি ও মহৎ কিছু জানতে পারবে। কিন্তু তোমরা নেমে আসতে পারবে না যদি ক্রুশ তুলে নিয়ে সেই যিশুর অনুসরণ না কর যাঁকে আমরা এমন '*পরম মহাযাজক*' রূপে পেয়েছি '*যিনি স্বর্গসকলের মধ্য দিয়ে গমন করেছেন*'[ঘ]। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ থেকে পিছটান না দিলে তবে কেবল পৃথিবী ও পার্থিব রহস্যগুলোর মধ্য দিয়ে শুধু নয়, কিন্তু স্বর্গসকলের ও স্বর্গীয় রহস্যগুলোর উর্ধ্বেও অতিক্রম করে স্বর্গসকলের মধ্য দিয়ে গমন করবে। কেননা এ দৃশ্যগুলোর চেয়ে ঈশ্বরে এমন ধনাগারেই যেন গুপ্ত আরও বেশি দৃশ্য রয়েছে যা দৈহিক প্রকৃতির পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় যদি না আগে সেই প্রকৃতিকে বস্তুগত সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত করা না হয়। এবং আমি এতে নিশ্চিত যে, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা-সঙ্ঘ যা যা দেখেছে, এমনকি যাঁদের ঈশ্বর '*বাতাস ও অগ্নিশিখা*'[ঙ] করেছেন সেই পবিত্র দূতগণও

যা যা দেখেছেন, তার চেয়ে ঈশ্বর আরও বেশি মহত্তর এমন দৃশ্যগুলো ধরে আছেন ও নিজেরই জন্য রাখেন যা তিনি তখনই প্রকাশ করবেন যখন *গোটা বিশ্বসৃষ্টি সেই শত্রুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য* (চ)।

১৪। অতএব, যাঁরা ইতিমধ্যে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে যিনি খ্রিষ্টীয় বিষয়গুলো শেখার আসক্তি ক্ষেত্রে বহু সাক্ষ্যমরের চেয়েও আরও বেশি আসক্তির অধিকারী ছিলেন, সেই তিনি যথেষ্ট দ্রুতভাবে সেই চূড়ায় আরোহণ করবেন; আর তুমি, হে পুণ্যবান আম্ব্রোজ, সুসমাচারের উক্তিগুলো মহা যত্ন সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এমনটা দেখতে পাচ্ছ যে, তেমন বিশেষ ও মহত্তর আশিসধারা হয় তো কেউই অর্জন করবে না বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্রই তা অর্জন করবে, অথচ তেমন কিছু তুমিই অর্জন করবে যদি সন্দেহমুক্ত হয়ে লড়াইটা পেরিয়ে যাবে। ব্যাপারটা শাস্ত্র এভাবে ব্যক্ত করে: একদিন পিতর ত্রাণকর্তাকে বললেন, ‘*দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব? যিশু তাঁদের*’, অর্থাৎ প্রেরিতদূতদের, ‘*বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা সকলে যারা আমার অনুগামী হয়েছ, নবসৃষ্টি-কালে যখন ঈশ্বর* (ক) *নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। আর যে কেউ আমার নামের জন্য ভাই, কি বোন, কি পিতামাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা, কি বাড়ি ত্যাগ করেছে, সে তার বহুগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে*’(খ)। এসমস্ত কথার কারণে, পৃথিবীতে তোমার যা আছে যদি আমি সেইমত বা সেটার আরও বেশির অধিকারী হতাম, তাহলে আমি প্রার্থনা করতাম যাতে খ্রিষ্টে ঈশ্বরের কাছে সাক্ষ্যমর হতে পারতাম যাতে করে তার ‘বহুগুণ’ অথবা মার্ক যেইভাবে বলেন, তার ‘শতগুণ’ পেতে পারতাম, আর তা এমন কিছু যা, সাক্ষ্যমরণে আহূত হলে আমরা যে অল্প কিছু পিছনে ফেলে রাখি, তার চেয়ে অনেক বেশি, কেননা সেই অল্প কিছু শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

এই কারণে, আমাকে যদি সাক্ষ্যমর হতে হয়, তবে জমাজমি ও বাড়ি সহ ছেলেমেয়েদেরও পিছনে ফেলে রাখতে ইচ্ছা করতাম যাতে, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল অভিহিত* (গ), আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ঈশ্বর সেই পিতা

অনুসারে আমি বহুজনের পিতা বলে অভিহিত হতে পারতাম, অথবা, সূক্ষ্ম কথা ব্যবহার করতে গেলে, আমি শতগুণ ও পবিত্রতর সন্তানদের পিতা বলে অভিহিত হতে পারতাম। আর যদি কোন না কোন পিতা থাকে যাদের কাছে তা-ই বলা হয় যা আব্রাহামকে বলা হয়েছিল তথা, *শুভ বার্ধক্যের পরে তোমাকে সমাধি দেওয়া হওয়ার পর তুমি শান্তিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে* [ঘ], তাহলে কেউ না কেউ বলতে পারবে (যদিও আমি জানি না লোকটা সত্যকথা বলবে কিনা), হয় তো তাঁরা হলেন সেই পিতা যাঁরা একসময় সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন ও ছেলেমেয়েকে পিছনে ফেলে রেখেছিলেন যাদের প্রতিদানে তাঁরা হলেন পিতাদের তথা আদিপিতা আব্রাহাম ও অন্যান্য আদিপিতাদের পিতা। কেননা এমনটা হতে পারে যে, যাঁরা ছেলেমেয়েকে পিছনে ফেলে রেখেছেন ও সাক্ষ্যমর হয়েছেন, তাঁরা শিশুদের নয় বরং পিতাদেরই পিতা।

১৫। কিন্তু এমন কেউ থাকতে পারে যে শ্রেয়তর অনুগ্রহদান বিষয়ে আগ্রহী ও তাদেরই সাক্ষ্যমর বলে থাকে যারা ধনবান বা পিতা যেহেতু তারা শতগুণে সন্তানদের জন্ম দেবে বা শতগুণে জমাজমি ও বাড়ি পাবে, কিন্তু [সেই ব্যক্তি] এমনটা জিজ্ঞাসা করে, তারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাক্ষ্যমরদের চেয়েও বহুগুণ পাবে যাঁরা এই জীবনকালে গরিব ছিল। তেমন ব্যক্তিকেকে এই উত্তর দিতে হবে যে, যাঁরা নির্যাতন ও দুঃখকষ্ট বহন করেন তাঁরা যেমন সাক্ষ্যমরণে এমন উৎকৃষ্টতা দেখান যা তাদেরই উৎকৃষ্টতার চেয়ে আরও উন্নত যারা সেইভাবে পরীক্ষিত হয়নি, তেমনি যাঁরা ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের মহা ভালবাসা হাতিয়ার ক'রে নিজেদের দেহ ও জীবনের প্রতি আসক্তি ছাড়া তেমন পার্থিব বন্ধনও ভেঙে দিয়েছেন ও ছিন্নভিন্ন করেছেন ও সত্যিকারে সেই ঈশ্বরের বাণীকে বহন করেছেন যা *জীবন্ত ও কার্যকর, যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ* [ক], তাঁরা সেই সমস্ত বন্ধন চূর্ণ করে ও নিজেদের জন্য পাখা গড়ে ঈগলের মত আপন প্রভুর বাড়িতে ফিরে যেতে সক্ষম হলেন [খ]। সুতরাং, যেমন এমনটা ন্যায়সঙ্গত যে, যারা নির্যাতন ও কষ্ট দিয়ে পরীক্ষিত হয়নি, তারা প্রধান আসন তাঁদেরই জন্য ছেড়ে দেবে যাঁরা নানা নির্যাতন-যন্ত্রে, পীড়নযন্ত্রে ও আগুনে নিজেদের সহিষ্ণুতা দেখালেন, তেমনি এটাও যুক্তিসঙ্গত যে, গরিব এই আমরা সাক্ষ্যমর হয়ে উঠলেও তবু আমরাও তোমাদের জন্য প্রধান আসন ছেড়ে দেব, কেননা অন্যান্যরা যা অন্বেষণ করে, তোমরা খ্রিষ্টে

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার খাতিরে সেই প্রতারণাময় খ্যাতি পায়ে মাড়িয়ে দাও, আপন বড় বড় সম্পদের প্রতি আসক্তি ও আপন ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ-মমতাও পায়ে মাড়িয়ে দাও।

১৬। তাছাড়া, বহুগুণ বা শতগুণ ভাই, ছেলেমেয়ে, পতিামাতা, জামাজমি ও বাড়ি-ঘর সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ক্ষেত্রে শাস্ত্রের গভীরতা লক্ষ কর; বস্তুত তাদের মধ্যে স্ত্রীর কথা তালিকাভুক্ত নয় (ক)। কেননা শাস্ত্র এমনটা বলে না যে, যে কেউ আমার নামের জন্য ভাই, কি বোন, কি পিতামাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা, কি বাড়ি কি স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তার বহুগুণ পাবে। কেননা মৃতদের *পুনরুত্থানের সময়ে তারা বিবাহও করে না, কারও বিবাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতদের মত* (খ) রয়েছে।

১৭। সুতরাং, যোশুয়া পবিত্র ভূমিতে লোকদের বসতি দিয়ে তাদের যা যা বললেন, শাস্ত্রও তা এখন আমাদের বলতে পারে। পাঠ্যাংশ এরূপ, *এখন তোমরা প্রভুকে ভয় কর, সততা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর উপাসনা কর* (ক)। আর আমরা প্রতিমা পূজা করতে পথভ্রষ্ট হলে তবে শাস্ত্র আমাদের বলবে, *তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নদীর ওপারে ও মিশরে যে দেবতাদের উপাসনা করত, তাদের তোমরা দূর করে দাও ও প্রভুরই উপাসনা কর* (খ)।

যখন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্যত ছিলে, সেই আদিতে তোমাদের একথা বলা ন্যায়সঙ্গত হত তথা, ‘*যদি প্রভুর উপাসনা করায় তোমাদের অসন্তোষ হয়, তাহলে যার উপাসনা করতে চাও, তাকে আজই বেছে নাও: নদীর ওপারে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত, সেই দেবতারাই হোক, কিংবা যাদের দেশে তোমরা বাস করছ, সেই আমোরীয়দের দেবতারাই হোক*’; এবং ধর্মশিক্ষক তোমাদের বলতে পারতেন, ‘*কিন্তু আমার ও আমার পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে—আমরা প্রভুরই উপাসনা করব, কেননা তিনি পবিত্র*’(গ)। কিন্তু তোমাদের কাছে এখন তেমন কথা বলা সম্ভব নয়, কেননা সেসময় তোমরা বলেছিলে, *আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করব, তা দূরে থাকুক! কেননা আমাদের ঈশ্বর প্রভু যিনি তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন … এবং আমরা যে পথে এসেছি, সেই সকল পথে … তিনিই আমাদের রক্ষা করেছেন* (ঘ)।

তাছাড়া, বহুদিন আগে, ধর্ম সংক্রান্ত চুক্তি গ্রহণকালে তোমরা তোমাদের ধর্মশিক্ষককে এই উত্তর দিয়েছিলে, *আমরাও প্রভুরই উপাসনা করব, কারণ তিনিই আমাদের ঈশ্বর* (ঙ)। অতএব, মানুষদের সঙ্গে যে চুক্তি ভঙ্গ করে সে যখন যুদ্ধবিরতির বাইরে ও রক্ষার বহিরাগত মানুষ হয়, তখন যারা ঈশ্বরের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল অস্বীকার করায় তা শূন্য ও অকার্যকর করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময়ে যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এখন সেই শয়তানের পিছনে ছোটে, তাদের বিষয়ে কীবা বলতে হবে? এলি আপন ছেলেদের যা বলেছিলেন, সেই লোককে তা-ই বলতে হবে, *মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে তারা তার জন্য প্রার্থনাও করবে; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?* (চ)।

১৮। লড়াইতে সংগ্রামরত ও সাক্ষ্যমরণে আহূত এই তোমাদের দেখবার জন্য মহৎ একটা নাট্যশালা দর্শকদের নিয়ে পরিপূর্ণ, ঠিক যেন আমরা এমন বড় ভিড়ের কাছে কথা বলতাম যারা যোদ্ধাদের মধ্যে কেইবা বিজয়ী হবে তা দেখবার জন্য সমবেত। আর পল যা বলেছিলেন, তুমি লড়াই করতে করতে যে তার চেয়ে ন্যূনতম কথা বলবে এমন নয়; হ্যাঁ, তুমিও তাঁর সেই কথা বলবে, *আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি* (ক)। তাই যখন আমরা খ্রিষ্টধর্মের জন্য লড়াই করব, তখন গোটা জগৎ এবং ভাল ও মন্দ সকল স্বর্গদূত ও সকল মানুষ, যারা ঈশ্বরের স্বত্বাংশের মানুষ (খ) ও যারা অপর স্বত্বাংশের মানুষ আমাদের শুনবে। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গদূতবৃন্দ আমাদের নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠবেন, নদনদী করতালি দেবে, গিরিমালা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে ও মাঠের সকল গাছপালা তাদের শাখা দিয়ে তালি দেবে (গ); নইলে, এমনটা না হোক, যারা অমঙ্গল নিয়ে আনন্দিত, অতলের সেই পরাক্রমগুলোই উল্লাসে মেতে উঠবে। আর যারা পরাজিত হয়েছে ও তাদের স্বর্গীয় সাক্ষ্যমরণ থেকে পতিত হয়েছে, তাদের বিষয়ে পাতালবাসীদের দ্বারা যে কী বলা হবে, ইশাইয়ার কথা প্রয়োগ করে তা দেখা কোন ভাবে নির্বোধ ব্যাপার নয়। কেননা অস্বীকারের অভক্তি ক্ষেত্রে সেই কথা আমাদের আরও বেশি শিহরিত করবে, কেননা যে কেউ অস্বীকার করেছে, আমি মনে করি তেমন লোককে একথা বলা হবে, *তোমার আগমনে অভিনন্দন জানাবার জন্য পাতাল অস্থির, পৃথিবীকে যারা শাসন করত, সেই সকল দৈত্যকে তোমার*

জন্য জাগিয়ে তোলা হয়েছে, তারা জাতিগুলির রাজাদেরও তাদের রাজাসন থেকে উঠিয়ে দেবে; তারা সকলে উত্তর দিয়ে তোমার কাছে কথা বলবে [ঘ]। আর যারা পরাজিত হয়েছে, সেই পরাজিত পরাক্রমগুলো কী বলবে? আর যাদের অস্বীকারের বন্দি করা হয়েছে, দিয়াবলের দ্বারা যাদের বন্দি করা হয়েছিল, ওদের কাছে এরা একথা ছাড়া আর কীবা বলবে, *আমাদের যেমন বন্দি করা হয়েছিল তেমনি তোমাদেরও বন্দি করা হয়েছে; তোমরা আমাদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছ* [ঙ]। এবং ঈশ্বরে যার মহৎ ও গৌরবময় প্রত্যাশা ছিল সে যখন কাপুরুষত্ব দ্বারা বা তার বিশ্বাসের জন্য তার উপরে চাপা কষ্টের দ্বারা পরাভূত হয়, তখন সে একথা শুনবে, *তোমার গৌরব পাতালে নেমে গেছে, ও সেইসঙ্গে তোমার আনন্দ-ফুর্তিও নেমে গেছে; তারা তোমার নিচে বিছানা হিসাবে অবক্ষয় ছড়িয়ে দিয়েছে, ও কীট-পোকা হয়েছে তোমার কম্বল* [চ]। যে কেউ একসময় মণ্ডলীগুলোতে প্রায়ই দীপ্তিমান হয়ে তা প্রভাতী তারার মত আলোকিত করত ও নিজের সৎকর্ম দ্বারা মানুষের সামনে উজ্জ্বল ছিল [ছ], এবং তারপরে সেই মহৎ লড়াইতে তেমন সিংহাসনের মুকুট হারিয়ে ফেলেছে, সে একথা শুনবে, *হে প্রভাতী তারা, তুমি যে উষার সময়ে ওঠ, আকাশ থেকে তোমার এ কেমন পতন? আহা, তোমাকে কেমন ভূমিসাৎ করা হয়েছে* [জ]। এবং যে কেউ নিজের অস্বীকারের ফলে দিয়াবলের মত হয়ে গেছে, তাকে একথা বলা হবে, *যারা খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে মারা গেছে ও যারা গহ্বরে নেমে আসে, সেই বহুজনের সঙ্গে তাকেও জঘন্য লাশের মত উপপর্বতগুলোতে ফেলে দেওয়া হবে; রক্তে কলঙ্কিত একটা কাপড় যেমন শুচি হবে না, সেইমত তুমিও শুচি হবে না* [ঝ]। কেননা যে কেউ অস্বীকারের জঘন্য পতন দ্বারা রক্ত ও খুনে কলঙ্কিত ও তত মহৎ অপকর্ম দ্বারা দূষিত, সে কেমন করে শুচি হবে?

যাই হোক, এবার এসো, এমনটা দেখাই যে আমরা এই উক্তি শুনেছি, *যে কেউ … ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়* [ঞ]। এসো, আমরা স্থিতমূল হয়ে দাঁড়াই পাছে আমাদের অন্তরে অস্বীকার বা স্বীকার করা ক্ষেত্রে দ্বিধা জেগে ওঠে, পাছে এলিয়ের সেই বাণী আমাদেরও কাছে উচ্চারিত হয় তথা, *তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে থাকবে? প্রভুই যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর* [ট]।

১৯। এমনটাও সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের প্রতিবেশীর দ্বারাও আমাদের নিন্দা করা হবে ও আমাদের চারদিকে রয়েছে ও আমাদের নির্বোধ মনে ক'রে মাথা নাড়ায় যারা তাদেরও দ্বারা আমাদের অবজ্ঞা করা হবে। কিন্তু তেমন পরিস্থিতিতে, এসো, আমরা ঈশ্বরকে বলি, *তুমি প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের করেছ অপবাদের পাত্র, আশেপাশের লোকদের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু; বিজাতীয়দের কাছে আমাদের করেছ তামাশার বিষয়, জাতিসকল অবজ্ঞায় মাথা নাড়ে। বিদ্রূপকারী ও নিন্দুকদের ডাকে, প্রতিশোধকামী শত্রুদের সামনে আমার অপমানের কথা সামনেই রয়েছে সারাদিন, আমার মুখের লজ্জা আমাকে ঢেকে ফেলেছে* (ক)। কিন্তু তেমন কিছু যখন ঘটবে, তখন আমরা সত্যিই সুখী যদি নবী সৎসাহসের সঙ্গে যা উচ্চারণ করেছিলেন, তা আমরাও ঈশ্বরের কাছে বলতে পারব, *আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন, কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলে যাইনি, অবিশ্বস্তও হইনি তোমার সন্ধির প্রতি, ও পিছন ফিরে তাকায়নি আমাদের হৃদয়* (খ)।

২০। এসো, একথা স্মরণ করি যে, যতদিন আমরা এজীবনে রয়েছি, ততদিন ধরে জীবনের বাইরের যত পথের কথা আমাদের ভাবতে হবে ও ঈশ্বরকে বলতে হবে, *তুমি আমাদের পদক্ষেপ তোমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছ* (ক)। একথাও স্মরণ করা উচিত যে, এই যে স্থানে আমাদের অবনমিত করা হয়েছে, আত্মার জন্য তা কষ্টেরই স্থান, যাতে করে আমাদের প্রার্থনায় আমরা বলতে পারব, *তুমি কষ্টের স্থানে আমাদের অবনমিত করেছ, মৃত্যু-ছায়া আমাদের আচ্ছন্ন করেছে* (খ)। কিন্তু সাহস যুগিয়ে, এসো, একথাও বলি, *আমরা যদি ভুলে যেতাম আমাদের ঈশ্বরের নাম, যদি অঞ্জলি প্রসারিত করতাম বিদেশী কোন দেবতার প্রতি, তবে ঈশ্বর কি তা দেখতেন না?* (গ)।

২১। এসো, আমরা প্রকাশ্য সাক্ষ্যমরণে শুধু নয়, গুপ্ত সাক্ষ্যমরণেও সিদ্ধতাপ্রাপ্ত সাক্ষ্যদাতা হবার জন্য লড়াইতে নামি, যাতে করে প্রেরিতদূতের মত আমরাও চিৎকার করে বলতে পারি, *কেননা আমাদের গর্ব এ: আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই জগতে … আমরা পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই আচরণ করেছি* (ক); এবং এসো, প্রেরিতদূতের উক্তির সঙ্গে নবীরও এই উক্তি চিৎকার করে উচ্চারণ করি, 'তিনি তো

জানেন হৃদয়ের যত গোপন গতি', বিশেষভাবে তখনই যখন আমাদের মৃত্যুর দিকে চালনা করা হয়। তবেই আমরা ঈশ্বরকে তা-ই বলব যা কেবল সাক্ষ্যমরদের দ্বারা উচ্চারিত হতে পারে, *তোমার খাতিরেই তো আমাদের সারাদিন বধ করা হচ্ছে, আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য* (খ)। আর সেই যে বিচারকেরা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমাদের হুমকি দেয়, তাদের প্রতি ভয় যদি মাংসের আকর্ষণ দিয়ে (গ) আমাদের টলটলাতে চেষ্টা করে, তাহলে এসো, সেই বিচারকদের কাছে প্রবচনমালার এই বচন শোনাই, *সন্তান আমার, প্রভুকে সম্মান কর, তবেই তুমি জয়ী হবে। কাউকে ভয় পেয়ো না, কেবল তাঁকেই ভয় কর* (ঘ)।

সাক্ষ্যমরণে মাকাবীয় ভাইদের আদর্শ

২২। এবং উপদেশক পুস্তকে শলোমন যা বলেন, তাও আমাদের এই আলোচনায় উপকারী, *যারা এখনও জীবিত আছে, তাদের চেয়ে, যারা ইতিমধ্যে মারা গেছে, তাদেরই আমি প্রশংসা করেছি* (ক)। যে কেউ নিজের ধর্মের খাতিরে মৃত্যুকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, তার চেয়ে কেইবা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বেশি প্রশংসনীয়? সেই এলেয়াজার ঠিক এধরনের মানুষ ছিলেন: দূষিত জীবনের চেয়ে সম্মানপূর্ণ মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে তিনি পীড়নযন্ত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়েছিলেন (খ); তাতে তিনি এমন 'প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে যা তাঁর নব্বই বছর বয়সের উপযোগী, যা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের মর্যাদা ও সেইসঙ্গে তাঁর পাকা চুলেরও সম্মানের উপযোগী, এমনকি ছেলেবেলা থেকে তাঁর অনিন্দ্য ব্যবহারের উপযোগী, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট পবিত্র বিধিনিয়মের উপযোগী', সেই অনুসারে তিনি বলেছিলেন, *ভান করা আমাদের বয়সকে আদৌ মানায় না; পাছে অনেক যুবক একথা ভাবে যে, এলেয়াজার নব্বই বছর বয়সে বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে নিয়েছে, ফলে এই ক্ষণিকের জীবনায়ুর খাতিরে আমার এই ভানের দরুন পাছে তারাও আমার কারণে পথভ্রষ্ট হয় আর আমি আমার বৃদ্ধ বয়সের জন্য শুধু কলঙ্ক ও অসম্মান অর্জন করি। কেননা যদিও এখন মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি সর্বশক্তিমানের হাত এড়াতে পারব না। সুতরাং, এখন বীরপুরুষ হয়েই*

এজীবন ত্যাগ করে আমি নিজেকে আমার বয়সের যোগ্য বলে দেখাব; এতে যুবকদের কাছে সুযোগ্যই একটা আদর্শ রেখে যাব, যেন পবিত্র ও পূজনীয় বিধিনিয়মের জন্য তারাও তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে (গ)।

প্রার্থনা রাখি, মৃত্যু-দ্বারের, না, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-দ্বারেই সম্মুখীন হওয়ার ক্ষণে, বিশেষভাবে তোমাদের নিপীড়ন করা হলে (কেননা এমনটা আশা পোষণ করা সম্ভব নয় যে বিরোধী পরাক্রমগুলোর ইচ্ছায় তোমাদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না), সেই ক্ষণে তোমরাও এধরনের কথা উচ্চারণ করবে, *পবিত্র জ্ঞান যাঁর অধিকার, সেই প্রভু ভালই জানেন যে, মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তাঁর ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি* (ঘ); এবং বর্ণনা অনুসারে এলেয়াজারের মৃত্যু এরূপ হল, *তিনি এভাবেই প্রাণত্যাগ করলেন; এতে যুবকদের কাছে শুধু নয়, বেশির ভাগ লোকের কাছেও আপন মৃত্যুকে তৎপরতার দৃষ্টান্ত ও দৃঢ়তার স্মৃতি রূপে রেখে গেলেন* (ঙ)।

২৩। মাকাবীয় ২য় পুস্তকে উল্লিখিত সেই যে সাত ভাই নিজেদের ধর্মে অটল হয়ে থাকছিল বিধায় আন্তিওখস [রাজা] বেত ও কশাঘাতের জোরে নিপীড়ন করেছিলেন, তারাও সাক্ষ্যমরণের প্রবল ও উন্নত দৃষ্টান্ত হবে তারই জন্য যে এমনটা ভাবছে সে সেই ছেলেদের চেয়ে কম মানুষ বলে প্রমাণিত হবে যারা নিজ নিজ নিপীড়ন শুধু নয়, কিন্তু নিজ নিজ ভাইদের নিপীড়ন দেখতে দেখতে প্রমাণ করেছিল তাঁদের ধর্ম কেমন দৃঢ়তর ধর্ম।

যাকে শাস্ত্র 'মুখপাত্র' বলে চিহ্নিত করে, তাদের মধ্যে সেই একজন ভক্তিহীন শাসককে বলেছিল, *আমাদের কাছ থেকে আপনি কোন্ কথা বের করতে বা জানতে চেষ্টা করছেন? আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করার চেয়ে আমরা বরং মৃত্যুবরণ করতেই প্রস্তুত* (ক)। এবার এমন কী দরকার আছে যে আমি তাদের নিপীড়ন করার জন্য আগুনে গরম করা সেই চাটু ও কড়াইয়ের কথা উল্লেখ করব যা তারা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কষ্ট ভোগ করে সহ্য করেছিল? কেননা 'মুখপাত্র' বলে অভিহিত যে ছেলে, প্রথমে তার চিহ্বা কেটে ফেলা হল; পরে তার মাথার চামড়া উঠিয়ে দেওয়া হল, আর সে সেই চামড়া উঠিয়ে দেওয়াটা সেইভাবে বহন করল যেভাবে অন্যান্য

লোক পরিচ্ছেদন বহন করে, কেননা তার এ বিশ্বাস ছিল যে, সে এতেও ঈশ্বরের সন্ধি পূরণ করছিল। কিন্তু এতে তুষ্ট না হয়ে আন্তিওখস, ছেলেটার অন্যান্য ভাই ও তার মা দেখতে দেখতেই তার হাত-পা কেটে ফেলালেন একথা ভেবে যে, তিনি যে দৃশ্য ভয়ঙ্কর বলে মনে করছিলেন, সেই দৃশ্য দ্বারা তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প টলাতে পারবেন। তাই তাতেও তুষ্ট না হয়ে আন্তিওখস এমন হুকুম দিলেন যেন, যে ছেলে আগেকার নিপীড়নের কারণে শারীরীক দিক দিয়ে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে গেছিল কিন্তু তখনও শ্বাস নিচ্ছিল, তাকে আগুনের উপরের সেই চাটু ও কড়াইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে একটা চাটুতে ঝলসে দেওয়া হয়। আর ভক্তিহীন শাসকের নিষ্ঠুরতায় ঝলসে দেওয়া বীরের মাংসের ধূম চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অন্যান্য ভাইয়েরা ও তার মা', একথা ভেবে যে ঈশ্বর এসমস্ত নিপীড়নের উপর দৃষ্টি রাখছিলেন, তাতে নিজেদের উৎসাহিত করতে করতে বীরের মত মৃত্যুবরণ করতে পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছিল (খ)। কেননা যারা নিপীড়ন ভোগ করে ঈশ্বরের চোখ যে তাদের উপর উপস্থিত তেমন দৃঢ় ধারণা তাদের সহিষ্ণুতা জাগাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং ধর্মের পক্ষের সেই যোদ্ধাদের বিচারক তাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন ও নিজেই উৎসাহিত হচ্ছিলেন ও বলতে গেলে তাদেরই পক্ষে আনন্দধ্বনি তুলছিলেন যারা তত বড় কষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। তবে তেমন পরিস্থিতিতে আমাদেরও পক্ষে এমনটা সমীচীন হবে যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে সেইভাবে ব্যবহার করে, আমরাও সেই ছেলেদের কথা প্রয়োগ করে তাদের বলব, *প্রভু ঈশ্বর লক্ষ করছেন, আর তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সহবেদনশীল* (গ)।

২৪। সোনা যেভাবে হাপরে যাচাই করা হয় (ক) সেই প্রথম ভাইকে সেইভাবে যাচাই করা হলে পর ভক্তিহীনদের আনন্দ-ফুর্তির জন্য দ্বিতীয়জনকে সামনে টানা হল এবং সেই ভক্তিহীন শাসকের চাকরেরা '*তার মাথার চামড়া-সমেত চুল ছিঁড়ে ফেলে*' তাকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান করছিল ও জিজ্ঞাসা করছিল '*তার শরীর অঙ্গে অঙ্গে নিপীড়িত হওয়ার আগে*' সে প্রতিমার উৎসর্গীকৃত '*মাংস খেতে রাজি*' ছিল কিনা (খ)। কিন্তু সে মনপরিবর্তন করতে অস্বীকার করলে তাকে দ্বিতীয় নিপীড়নের জন্য টানা হল। সে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত অটল থাকল কেননা ভেঙে না পড়ে ও নিজের কষ্টভোগে হার না মেনে সে সেই ঈশ্বরনিন্দুককে উদ্দেশ করে বলে উঠল, *পাষণ্ড! আপনি বর্তমান জীবন*

থেকেই আমাদের মুছে দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁর বিধিনিয়মের জন্য মৃত্যুবরণ করছি বলে, বিশ্বরাজ যিনি, তিনি নবীন ও অনন্ত জীবনেই আমাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন (গ)।

২৫। তৃতীয়জন নিজের কষ্ট শূন্যতা বলে মূল্যায়ন ক'রে ও ঈশ্বরের প্রতি নিজের ভালবাসার কারণে সেইসব কিছু মাড়িয়ে দিয়ে '*তাদের হুকুমে সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা বের করে ও সাহসভরে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে*' সসম্মানে বলল, '*ঈশ্বরের বিধিনিয়মের খাতিরে*' আমি এগুলো ফেলে রাখি; '*কিন্তু আশা রাখি*', স্বধর্মের জন্য যারা লড়াই করেছে, তিনি তাদের যে পুরস্কার মঞ্জুর করেন, '*আমি তাঁর কাছ থেকে এগুলো আবার পাব*'(ক)।

চতুর্থজনকে নিপীড়ন করা হল; কষ্টভোগ করতে করতে সে বলল, *মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন আশা পূরণের প্রতীক্ষা করতে পারি যে, তিনি আমাদের এমন পুনরুত্থানে পুনরুত্থিত করবেন যা ভক্তিহীন শাসক এই আপনার কাছে অজানা, কেননা আপনার পুনরুত্থান জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান হবে না বরং হবে শাস্তি ও চিরকালীন লজ্জার উদ্দেশে পুনরুত্থান* (খ)।

তারপর পঞ্চমজনকে পীড়ন করা হল; কিন্তু আন্তিওখসের দিকে তাকাতে তাকাতে তাঁর নিজের ক্ষয়শীলতা নিজের গর্বকে খর্ব না করার ব্যাপারে তাঁকে ভর্ৎসনা করল কেননা তিনি মনে করছিলেন যে তাঁর কিছু দিনের শাসক-অধিকার বড় একটা কিছু ছিল; সে আরও বলল যে, জনগণ তত নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও সেই ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়নি যিনি আন্তিওখসকে ও তাঁর বংশধরদের অচিন্তনীয় পীড়নে পীড়ন করবেন (গ)।

এর পরে ষষ্ঠজন মৃত্যুবরণ করতে করতে বলল, '*নির্বোধের মত নিজেকে ভোলাবেন না; আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি বলে আমরা আমাদের দোষের ফলেই এই সমস্ত যন্ত্রণা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ভোগ করছি*'; এবং তাঁকে বলল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেষ্টা করার জন্য তিনি যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন, তা যেন মনে না করেন। কেননা যারা ঐশবাণী দ্বারা ঐশ্বরিক হয়েছে, যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে (ঘ)।

২৬। অবশেষে আন্তিওখস কনিষ্ঠজনকে হাতে নিলেন; এবং যেহেতু তিনি এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, যারা তত বড় পীড়ন অমূল্যায়ন করেছিল সেও তাদের প্রকৃত ভাই ও তাদের একই দৃঢ় ধারণার অধিকারী, সেজন্য তিনি অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। আন্তিওখস মনে করছিলেন, তিনি কথা দিয়ে ছেলেটার মন জয় করতে পারবেন, ও দিব্যি দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, *সে তার পিতৃপুরুষদের প্রথা ত্যাগ করলে তবে তিনি তাকে ধনবান করবেন, বড় সুখীও করবেন, এমনকি তাকে তাঁর আপন বন্ধু-পদে উন্নীত করবেন ও তাকে কতগুলো সরকারী দায়িত্ব দেবেন* (ক)। কিন্তু ছেলেটা নিজের জন্য যা ইচ্ছাকৃত ভাবে বেছে নিয়েছিল সেটার চেয়ে আলাদা কথায় আদৌ কান দিচ্ছিল না বিধায় আন্তিওখস তার মাকে ডেকে বারবার চাপ দিচ্ছিলেন, তিনিই যেন *ছেলেটিকে এমন সদুপদেশ দেন সে যেন নিজেকে বাঁচাতে পারে* (খ)। আন্তিওখস যা চাচ্ছিলেন, মা সেবিষয়ে সন্তানকে রাজি করার ভান করে প্রকৃতপক্ষে 'সেই অত্যাচারীকে ভুলিয়ে' বহু কথা দিয়ে সন্তানকে সহিষ্ণুতা বিষয়ে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করলেন যে, যুবকটি পীড়নযন্ত্র আনা হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে বরং নিজেই পীড়নে নিযুক্ত লোকদের প্ররোচনা করে আগে থেকেই তাদের ডেকে বলল, *'তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? তোমরা কেন এত ধীর? আমরা ঈশ্বরের দেওয়া বিধানেরই প্রতি বশ্যতা স্বীকার করি; ঐশবাণীগুলোর বিপরীত একটা আদেশের পক্ষে দাঁড়ানো ন্যায়সঙ্গত নয়।'* উপরন্তু, এমন রাজার মত যিনি আপন বিচারাধীনদের বিরুদ্ধে রায় জারি করছেন, সে সেই অত্যাচারীর দ্বারা বিচারিত না হয়ে বরং নিজেই সেই অত্যাচারীকে বিচার করে তাঁর বিরুদ্ধে নিজের বিচারের রায় ঘোষণা করল। আর সে এমনটা বলেছিল যে, যেহেতু আন্তিওখস '*স্বর্গের সন্তানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়েছিলেন*', সেজন্য তিনি '*সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পাবেন না*'(গ)।

২৭। সেসময় দেখা যেতে পারত, তেমন সন্তানদের *মা প্রভুর উপরে তাঁর সমস্ত আশার খাতিরে কেমন সাহসের সঙ্গে তাদের কষ্ট ও মৃত্যু সহ্য করছিলেন* (ক)। কেননা সত্যকার ধর্মের শিশির ও পবিত্রতার বাতাস এমনটা দেয়নি যে, মস্ত বড় দুর্বিপাকের ভারে অধিকাংশ মায়েদের অন্তরে যে ভালবাসার আগুন জ্বলে ওঠে, সেই ভালবাসার আগুন সেই মায়ের অন্ত্ররাজিতে জ্বলে উঠবে। আমি মনে করি যে, শাস্ত্র থেকে যা সংক্ষিপ্ত ভাবে

ব্যক্ত করেছি, সেই বর্ণনা উপস্থাপন করা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর জন্য অধিক উপকারী হচ্ছে, যাতে করে আমরা দেখতে পারি, অধিক তিক্ত ও ভারী কষ্টের বিরুদ্ধে ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কেমন প্রতাপের অধিকারী যা যেকোন ভালবাসার চেয়েও প্রতাপশালী। কেননা ঈশ্বরের প্রতি এই ভালবাসা ও মানব দুর্বলতা আমাদের অন্তরে একসাথে বাস করতে পারে না, কেননা যখন কোন এক ব্যক্তি বলে *প্রভুই আমার শক্তি ও আমার স্তবগান* [খ] ও *যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম; তিনি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট* [গ], তখন সেই দুর্বলতা নির্বাসিত হয়ে সেই ব্যক্তির আত্মা থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া হয় ও সবদিক দিয়ে নিজের কার্যকারিতা হারায়।

পাপক্ষমা লাভে সাক্ষ্যমরণের ভূমিকা

২৮। সাক্ষ্যমরণ যে প্রকৃতপক্ষে কী ও ঈশ্বরের প্রতি যে কেমন অধিক ভরসা যোগাতে পারে, তাও উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে শেখা যেতে পারে। যেহেতু পবিত্র ব্যক্তি পরকে ভালবাসে ও ঈশ্বর থেকে যা তাকে পরিপ্লুত করেছে সে তেমন উপাকারে সাড়া দিতে ইচ্ছা করে, সেজন্য সে অনুসন্ধান করে, তাঁর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছে সেসমস্ত কিছুর প্রতিদানে সে প্রভুর জন্য কী বা করতে পারে; এবং সে এটা আবিষ্কার করে যে, উচ্চতর মনা মানুষের পক্ষে প্রভুকে দেওয়ার মত এমন কিছুই নেই যা সিদ্ধ সাক্ষ্যমরণের মত তাঁর উপকারের সমতুল্য বলে গণিত হতে পারবে। বাস্তবিকিই লেখা রয়েছে, '*আমার প্রতি প্রভুর উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি কী দিতে পারব?*' এবং শাস্ত্র বলে চলে, '*পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম*'[ক]। কেননা সাধারণত সাক্ষ্যমরণ 'পরিত্রাণের পানপাত্র' বলে অভিহিত, যেইভাবে আমরা সুসমাচারে পেতে পারি। কেননা যাঁরা যিশুর রাজ্যে তাঁর ডান ও বাঁ পাশে বসবার মর্যাদা বাসনা করছিলেন, প্রভু তাঁদের বলেছিলেন, '*আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?*'[খ], এবং 'পানপাত্র' বলায় তিনি সাক্ষ্যমরণ বোঝাচ্ছিলেন, এবং বিষয়টা এই বচনে আরও স্পষ্ট হয়, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে দূর করে দাও, কিন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক* [গ]। তাছাড়া আমরা এও শিখি যে, যিশু যে পাত্রে পান করেছিলেন, যে কেউ

সেই পাত্রে পান করে সে-ই তাঁর সঙ্গে বসবে ও রাজার রাজার সঙ্গে রাজত্ব করবে ও বিচার সম্পাদন করবে। সুতরাং এটাই সেই ‘পরিত্রাণের পানপাত্র’ যা যে কেউ গ্রহণ করে নেয় প্রভুর নাম করবে। *যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে* (ঘ)।

২৯। কিন্তু এমনটা হতে পারে যে, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক* (ক) বচনটার কারণে যে কেউ শাস্ত্রের অভিপ্রায় সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করে না, সে এমনটা ধরে নেবে যে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে ত্রাণকর্তা নিজেকে ভীতিপ্রবণ বলে দেখিয়েছেন; আর যখন তিনি নিজেকে ভীতিপ্রবণ বলে দেখান তখন কেউ না কেউ বলবে, তবে কেইবা নিজেকে উচ্চতর মনার মানুষ দেখাবে? প্রথমত এসো, যারা ত্রাণকর্তার বিষয়ে তেমন ধারণা ধরে নেয়, তাদের জিজ্ঞাসা করি: যিনি বলেছিলেন *প্রভুই আমার আলো ও আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি? প্রভুই আমার জীবনের রক্ষাকর্তা, কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি? আমার মাংস গ্রাস করবার জন্য যখন অপকর্মারা আমাকে আক্রমণ করে, তখন আমার নির্যাতনকারী ও শত্রু যারা, তারাই দুর্বল হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আমার বিরুদ্ধে যদিও সেনাদল শিবির বসায়, আমার হৃদয় ভয় করবে না; আমার বিরুদ্ধে যদিও যুদ্ধ বাধে, তখনও আমি ভরসা রাখব* (খ), তাঁর চেয়ে ত্রাণকর্তা নিম্নতর ব্যক্তি কিনা। কিন্তু এমনটা সম্ভব হতে পারে যে, নবী দ্বারা উচ্চারিত এ বাণীগুলো সেই প্রভুকে ছাড়া অন্য কাউকে লক্ষ করছিল না যিনি পিতার দেওয়া আলো ও পরিত্রাণ গুণে কাইকে ভয় পেতেন না, ও যে রক্ষা দ্বারা ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করছিলেন সেটার গুণে কারও ভয়ে কম্পিত ছিলেন না। এবং যখন শয়তানের গোটা সেনাদল তাঁর বিরুদ্ধে শিবির বসিয়েছিল, তখনও তাঁর হৃদয় আদৌ ভয় করেনি; ও যখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বেধেছিল, তখনও পবিত্র শিক্ষাবাণীতে পূর্ণ তাঁর হৃদয় ঈশ্বরে ভরসা রাখছিল। ফলে এমনটা হতে পারে না যে তিনি ভীতিপ্রবণতার কারণে বলেছিলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক* (গ) ও সেইসঙ্গে সাহস ভরে বলেছিলেন, *আমার বিরুদ্ধে যদিও সেনাদল শিবির বসায়, আমার হৃদয় ভয় করবে না* (ঘ)।

তবে হয় তো এমনটাও হতে পারে যে, সেই বচনে কিছু না কিছু রয়েছে যা আমাদের পরীক্ষা লক্ষ করেনি; তাই সেই তিনটে সুসমাচারে পাত্রের কথা কেমন ভাবে উল্লিখিত তা লক্ষ করায় তোমরা সেই কিছুটা খুঁজে বের করবে। মথি এমনটা লেখেন যে, প্রভু

বলেছিলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, "এই" পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক* [ঙ]; লুক লেখেন, *পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে, "এই" পানপাত্র আমা থেকে দূর করে দাও* [চ]; মার্ক লেখেন, *আব্বা, পিতা, সবই তোমার সাধ্য; "এই" পানপাত্র আমা থেকে দূর করে দাও* [ছ]। অত্রএব, কারণটা যাই হোক না কেন যেহেতু যেকোন সাক্ষ্যমরণ 'পানপাত্র' বলে অভিহিত, সেজন্য এমনটা দেখ, তুমি যদি তেমনটা বলতে পার না যে, যখন তিনি বলেন, '"এই" পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক', তখন তিনি সার্বিক দিক দিয়েই নাকি কেবল এক প্রকারই সাক্ষ্যমরণ অস্বীকার করেন (নইলে এক্ষেত্রে তিনি বলতেন, 'পানপাত্রটা আমা থেকে সরে যাক')। যত্ন সহকারে বিবেচনা কর যদি এমনটা সম্ভব হতে পারে যে, ত্রাণকর্তা দেখতে পেয়েছিলেন, বলতে গেলে, সেই নানা প্রকার পানপাত্র বীনা ছিল ও এক একটার কারণে কীনা হতে পারত, এবং তাঁর প্রজ্ঞার কোন না কোন গভীরতা দ্বারা সেগুলোর পার্থক্য বিচার-বিবেচনা করার পর তিনি এক প্রকার সাক্ষ্যমরণ অস্বীকার করলেন কিন্তু একইসময়ে তিনি গুপ্তভাবে এমন অন্য ধরনের সাক্ষ্যমরণ যাচনা করলেন যা সম্ভবত আরও কঠোর, যাতে করে সেই অন্য পানপাত্র দ্বারা এমন আরও সার্বিক ধরনের উপকার অর্জন করা যেতে পারত যা আরও বেশি মানুষের উপকারে আসত। কিন্তু তেমন ইচ্ছা আদৌ পিতার ইচ্ছা ছিল না যা পুত্রের ইচ্ছার চেয়ে বেশি প্রজ্ঞাময়, কেননা পিতা ঘটনাগুলো এমনভাবে ও এমন ক্রমবিন্যাস অনুসারে নির্ধারণ করছিলেন যা পুত্র যা দেখতেন তারই অতীত। যাই হোক, সামসঙ্গীত-মালায় 'পরিত্রাণের পানপাত্র' স্পষ্টই হলো সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু, আর এই কারণেই '*পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম*' বচনের পর পরে লেখা রয়েছে, '*প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু*'[জ]। অতএব, মৃত্যু আমাদের কাছে "মূল্যবান" বলে আসবে যদি আমরা ঈশ্বরের পবিত্রজন হই ও, বলতে গেলে, যদি আমরা সাধারণ মৃত্যুতে না মরতে যোগ্য হই কিন্তু বিশেষ ধরনেরই এক মৃত্যুতে তথা খ্রিষ্টিয়ান, ধর্মসম্মত ও পবিত্র মৃত্যুতেই মরতে যোগ্য হই।

৩০। এসো, আমরা যে পাপ করেছি তাও স্মরণ করি, এও স্মরণ করি যে, বাপ্তিস্ম ছাড়া পাপের ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব, সুসমাচারের বিধান অনুসারে পাপক্ষমার উদ্দেশে জলে ও পবিত্র আত্মায় পুনরায় বাপ্তিস্ম পাওয়াও অসম্ভব, এবং এও স্মরণ করি যে, সাক্ষ্যমরণে

বাপ্তিস্ম আমাদের দেওয়া হয়েছে; এটা ঠিক এইভাবে অভিহিত, যেইভাবে এ থেকে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, *আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?* (ক)। বচনটার পর পরে এ বচন রয়েছে *আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা কি বাপ্তিস্ম নিতে পার?* (খ)। এবং অন্যত্র তিনি বলেন, *এমন বাপ্তিস্ম আছে, যে-বাপ্তিস্মে আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ* (গ)। তাছাড়া এমনটাও ভাব যদি সাক্ষ্যমরণে বাপ্তিস্ম বহুজনকে সেইভাবে বিশুদ্ধ করার জন্যও উপকারী কিনা যেভাবে ত্রাণকর্তার উপরোল্লিখিত বাপ্তিস্ম জগৎকে পরিশুদ্ধি এনে দিয়েছিল। কেননা মোশির বিধান অনুসারে যারা যজ্ঞবেদির সেবায় নিযুক্ত ছিল, তারা যেমন মনে করছিল *ছাগ ও ষাঁড়ের রক্ত* (ঘ) দ্বারাই তারা জনগণকে পাপের ক্ষমা বিষয়ক সেবা নিবেদন করছিল, তেমনি *যিশুর সাক্ষ্যের জন্য যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল* (ঙ), তাদের প্রাণও স্বর্গীয় যজ্ঞবেদির সেবা বৃথা করে না বরং যারা প্রার্থনা করে তাদের জন্য তারা পাপের ক্ষমা বিষয়ক সেবাও নিবেদন করে। সেইসঙ্গে আমরা এও জানি যে, যেমন মহাযাজক যিশু সেই খ্রিষ্ট নিজেকে বলি রূপে উৎসর্গ করেছেন (চ), তেমনি যে যাজকদের মধ্যে তিনি মহাযাজক, তারাও নিজেদের বলি রূপে উৎসর্গ করে, আর এজন্যই তারা যজ্ঞবেদির পাশে নিজেদেরই উপযুক্ত স্থানের পাশে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাছাড়া দোষমুক্ত যাজকেরা দোষমুক্ত বলি উৎসর্গ করায় ঈশ্বরত্বের সেবা সম্পাদন করত, কিন্তু যারা দোষ-আক্রান্ত ছিল ও দোষ-আক্রান্ত বলি উৎসর্গ করত ও যাদের কথা বিষয়ে মোশি লেবীয় পুস্তকে উল্লেখ করেছিলেন, তারা যজ্ঞবেদি থেকে পৃথক থাকত (ছ)। এবং যে ব্যক্তি নিজের স্বীকারোক্তি আঁকড়িয়ে ধরে থাকে ও সাক্ষ্যমরণের দাবীকৃত প্রতিটি দাবি পূরণ করে, সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কেইবা সেই দোষমুক্ত যাজক যে দোষমুক্ত বলি উৎসর্গ করছে, ও যার বিষয়ে আমরা আগে কথা বলেছি? (জ)।

৩১। কিন্তু আমরা যেন এতে বিস্মিত না হই যখন গভীর শান্তি, স্থৈর্য ও প্রশান্তিতে সাক্ষ্যমরেরা যে মহৎ সুখের অধিকারী হবে, সেই সুখ এমন অবস্থা থেকে শুরু হয় যা দেখতে বিষণ্ন ও বলতে গেলে শীতকালীন; কেননা সুখীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজে জীবনধারণ পরিচালনা করার জন্য কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তা দেখাবার জন্য সর্বপ্রথমে শীতকালে সরু ও সঙ্কীর্ণ পথে চলতে বাধ্য হবে (ক) যাতে পরবর্তীকালে তা-ই

বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যা পরম গীতে তখনই কনেকে বলা হয় যখন কনে নিরাপদে শীতকাল পেরিয়ে গেছে। কেননা সেই কনে বলে, *আমার প্রেমিক উত্তর দিয়ে আমাকে বলছেন: ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী, আমার কপোতী! কাছে চলে এসো! কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে* (খ)। তোমাদেরও মনে রাখতে হবে যে, তোমরা 'শীতকাল পার হয়েই গেছে' কথাটা কোন ভাবে শুনতে পাবে না যদি না তোমাদের সমস্ত শক্তি, প্রতাপ ও মন দিয়ে এ বর্তমানকালীন শীতকালের লড়াইতে না নাম; তবেই, শীতকাল অতীত হওয়ার পর ও বর্ষা থেমে চলে যাওয়ার পরেই সেই ফুলগুলো দেখা দেবে যেগুলো *প্রভুর গৃহে রোপিত হয় ও আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে বিকশিত হয়* (গ)।

৩২। আর আমরা এও জানি যে, যখন যিশু এবিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করেছেন যে, প্রতিমাগুলো ও বহু দেব-দেবীকে পূজা প্রত্যাখ্যান করতে হয়, তখন সেই শত্রু আমাদের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করলেও প্রতিমা পূজা করতে আমাদের বাধ্য করতে পারে না; এজন্য সে, তেমন কাজ করার জন্য যাদের উপর তার অধিকার আছে, তাদের উপরে চাপ দেয়, এবং এইভাবে তার প্রলোভনের সম্মুখীন যারা, সে তাদের হয় সাক্ষ্যমর না হয় পৌত্তলিক করবে। এমনকি, এখনও সে প্রায়ই বলতে থাকে, *তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব* (ক)। তবে এসো, এবিষয়ে অধিক যত্নবান হই যেন কখনও প্রতিমাপূজা না করি ও অপদূতদের অধীনে নিজেদের বশীভূত না করি, কেননা বিজাতীয়দের মূর্তিগুলো অপদূত মাত্র (খ)। আহা, অপদূতদের জোয়ালের অধীনে নিজেকে পুনরায় বশীভূত করার জন্য ও গুরুভার পাপকর্মের বোঝা বহন করার জন্য যে খ্রিষ্টের সুবহ জোয়াল ও লঘুভার বোঝা পরিত্যাগ করেছে, সে কেমন অবস্থায় রয়েছে। এ কেমন হতে পারে যখন আমরা জেনেছি যে, যে কেউ সেই পুতুলগুলোকে পূজা করে *তার হৃদয় যে ছাইমাত্র* (গ), ও সেগুলোর জীবন অসার মাটি মাত্র (ঘ); তাছাড়া আমরা এও ঘোষণা করেছি, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা অসার বহু পুতুলের অধিকারী ছিল, কিন্তু বৃষ্টি দিতে পারে, সেগুলোর মধ্যে এমন কেউ নেই* (ঙ)।

৩৩। নেবুকাদ্নেজারের সেই সোনার মূর্তি যে কেবল সেই প্রাচীনকালে দাঁড়ানো করা হয়েছিল, আনানিয়াস, আজারিয়া ও মিশায়েল সেই মূর্তি পূজা না করলে তিনি যে কেবল সেই কালেই তাঁদের জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন (ক) এমন নয়। কেননা প্রবাসী সত্যকার হিব্রুদের এই আমাদেরও কাছে সেই নেবুকাদ্নেজার আজও একই কথা বলছে। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে, এসো, আমরা সেই পবিত্র মানুষদের অনুকরণ করি যাতে সেই স্বর্গীয় শিশিরের অভিজ্ঞতা করতে পারি যা আমাদের অন্তরে জ্বলন্ত যেকোন আগুন নিভায় ও আমাদের মনকে হালকা করে। মোর্দেকাই যে তোমরা, হামান ইচ্ছা করে সেই তোমরা তার সামনে প্রণিপাত করবে; কিন্তু তোমরা বলবে, *আমি একটা মানুষের গৌরব ঈশ্বরের গৌরবের উপরে রাখব না* (খ)। এসো, ঈশ্বরের বাণী দ্বারা আমরা সেই বেল্‌কে উল্টিয়ে দিই, দানিয়েলের সঙ্গে সেই নাগদানবকে বধ করি, যাতে করে আমরা সিংহদের মুখের সামনে এগিয়ে যেতে যেতে সেগুলো দ্বারা কোন কষ্ট ভোগ করতে না পারি, কিন্তু যে সিংহগুলো আমাদের গ্রাস করতে পারে না, সেই সিংহগুলো দ্বারা তাদেরই মাত্র গ্রাস করা হবে যারা আমাদের বর্তমান লড়াইয়ের জন্য দায়ী। এসো, আমরা সহনশীল হই, কেননা যোবের প্রশংসনীয় কর্মসমূহের মধ্যে লেখা আছে, *মুখে হাত দিয়ে আমি যদি সেগুলোর প্রতি চুম্বন নিবেদন করতাম, তবে তা বিচারের যোগ্য অপরাধ হত* (গ)। এবং এমনটাও সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের মুখে হাত দিয়ে চুম্বন নিবেদন করতে আমাদের হুকুম দেওয়া হবে।

খ্রিষ্টীয় জীবন আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎ

৩৪। এসো, এটাও লক্ষ করি যে, প্রভু যখন বহুজনকে উদ্দেশ করেন তখন নয়, বরং যখন তিনি প্রেরিতদূতদের উদ্দেশ করে উপদেশ দেন, তখনই সাক্ষ্যমরণ সংক্রান্ত বাণীগুলো পূর্বঘোষিত। কেননা প্রথমত লেখা আছে, *এই বারোজনকে যিশু প্রেরণ করলেন, আর তাঁদের এই নির্দেশ দিলেন: তোমরা বিজাতীয়দের এলাকায় যেয়ো না* (ক), ইত্যাদি। তারপর একথা আসে, *মানুষদের বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের তারা বিচারসভায় তুলে দেবে, ও নিজেদের সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, যেন তাদের কাছে ও*

বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তবু যখন লোকেরা তোমাদের তুলে দেবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন। আর ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। তারা যখন তোমাদের এক শহরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য শহরে গিয়ে আশ্রয় নাও; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল শহরে তোমাদের যাওয়া শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন করবেন [খ]।

এবং লুখ একথা লেখেন, লোকেরা যখন সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের সামনে তোমাদের নিয়ে যাবে, তখন তোমরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কিংবা কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শেখাবেন [গ]; এবং তাঁর সুসমাচারে, বেশ কয়েক পদ পরে, তাই মনে মনে এই সঙ্কল্প নাও যে, নিজেদের পক্ষসমর্থনে কী বলতে হবে, তার জন্য আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না; কেননা আমি তোমাদের এমন মুখ ও প্রজ্ঞা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে না, উল্ট যুক্তিও দেখাতে পারবে না। তখন তোমাদের পিতামাতা, ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা নিজেরাই তোমাদের তুলে দেবে, ও তোমাদের কয়েকজনকে মৃত্যুর হাতেও তুলে দেবে; এবং আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু তোমাদের মাথার একগাছি চুলও নষ্ট হবে না। তোমাদের নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে [ঘ]।

এবিষয়ে মার্ক-ও একথা বলেন, আর লোকেরা যখন তোমাদের নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে, তখন তোমরা কী বলবে, তা নিয়ে আগে থেকে চিন্তিত হয়ো না; বরং সেই ক্ষণে যে কথা তোমাদের দেওয়া হবে, তা-ই বলবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, পবিত্র আত্মাই কথা বলবেন। তখন ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। আর

আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে [ঙ]।

মথিতে পাওয়া সাক্ষ্যমরণ বিষয়ক এ উৎসাহদায়ক বাণীও অন্যান্যদের প্রতি নয়, প্রেরিতদূতদেরই প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল; তেমন বাণী আমাদেরও শোনা উচিত, কেননা তা শোনার মাধ্যমে আমরা সেই প্রেরিতদূতদের ভাই হয়ে উঠব যাঁরা তা শুনেছিলেন, ও সেই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমরাও পরিগণিত হব। বচনটা এরূপ, *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন* [চ]; এবং পরবর্তী পদগুলোতে প্রভু এমনটা শেখান যে, ঐশদূরদৃষ্টিতে [ছ] ছাড়া কেউই সাক্ষ্যমরণের লড়াইতে আসে না; বস্তুত তিনি বলেন, *এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না। তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব* [জ]।

লুকের এই বচনটাও একই অর্থ বহন করে, *আর তোমরা যারা আমার বন্ধু, আমি তোমাদের বলছি, যারা দেহ মেরে ফেলার পর আর কিছুই করতে পারে না, তাদের ভয় করো না। আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কাকে ভয় করতে হবে: তাঁকেই ভয় কর, মেরে ফেলার পর জাহান্নামে নিক্ষেপ করার যাঁর অধিকার আছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কর। পাঁচটা চড়ুই পাখি কি দু' টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তাদের একটাকেও ঈশ্বর ভুলে যান না। এমনকি, তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও রাখা আছে; ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে মূল্যবান। আর আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মানবপুত্রও ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করবেন; কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে* [ঝ]; এবং অন্যত্র, *কেননা যে কেউ আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন নিজের গৌরবে ও পিতার ও*

পবিত্র দূতবাহিনীর গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন [ঞ]। এবং মার্ক একই মনোভাবে একথা লেখেন, *কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে নিজের পিতার গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন* [ট]।

অতএব, যারা আমাদের বিনাশ করে, তারা দেহের জীবন হত্যা করে, কেননা *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন* [ঠ] মথিতে ও লুকে, উভয়েতেই, এই যে একই বচন পাওয়া যায়, তাও সেই একই অর্থ বহন করে। দেহ হত্যা করার পর ওরা ইচ্ছা করলেও প্রাণকে হত্যা করতে পারে না; এমনকি, করার মত ওদের আর কিছুই থাকে না। কেননা যে প্রাণকে স্বীকারোক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত করে তোলা হয়েছে, সেই প্রাণ কেমন করে বিনষ্ট হতে পারে? এবং ইশাইয়াতে যিনি সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে আমাদের উৎসাহিত করেন, সেই “একজন” আপন পুত্রের সঙ্গে এতে নিজের সাক্ষ্য দেওয়াতে যোগ দেন; বচনটা এরূপ, *তোমরাই আমার সাক্ষী, ও আমি নিজে সাক্ষী—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি—আর যাকে আমি বেছে নিয়েছি, আমার সেই পুত্রও সাক্ষী* [ড]।

তোমরা এটাও লক্ষ কর যে, এই আজ্ঞা তথা *যারা দেহ মেরে ফেলার পর আর কিছুই করতে পারে না, তাদের ভয় করো না* [ঢ] যিশুর দাসদের কাছে নয়, তাঁর বন্ধুদেরই কাছে দেওয়া আজ্ঞা [ণ]। অতএব, তাঁকেই ভয় করতে হয় *যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন* [ত]; কেননা *‘মেরে ফেলার পর’* তাঁরই মাত্র *‘জাহান্নামে নিক্ষেপ করার অধিকার আছে’*[থ]। যাদের তিনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, তারা হলো সেইজন যারা তাদেরই ভয় করে যারা দেহকে মেরে ফেলে কিন্তু ‘মেরে ফেলার পর জাহান্নামে নিক্ষেপ করার যাঁর অধিকার আছে’ তাঁকে ভয় করে না। আমরা এমনটা ধরে নিতে পারি যে, যার মাথার চুলের হিসাব রাখা আছে সে যেই হোক না কেন, বচনটা স্পষ্ট ভাবে তাদেরই জন্য সত্য যিশুর খাতিরে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের পুত্রকে মানুষদের সামনে স্বীকার করব, দেব-দেবীর সামনে নয়, যাতে যিনি স্বীকৃত

তিনিও প্রতিদান স্বরূপ ঈশ্বরের সামনে ও নিজের পিতার সামনে আমাদের স্বীকার করেন, ও মর্তে যে তাঁকে স্বীকার করেছিল, তিনি যেন স্বর্গে তাকে স্বীকার করেন।

৩৫। যে কেউ এসমস্ত কিছু বিবেচনা করে, সে কেমন করে *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (ক) প্রেরিতদূতের এই কথা ঘোষণা করবে না? কেননা পিতার সামনে স্বীকারোক্তি কি মানুষদের সামনে স্বীকারোক্তির চেয়ে মহত্তর নয়? আর যিনি স্বীকৃত হয়েছেন, স্বর্গে তাঁর স্বীকারোক্তি কি মর্তে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরদের দেওয়া স্বীকারোক্তির চেয়ে বহুগুণে মহত্তম নয়? কিন্তু যে কেউ মানুষদের সাক্ষাতে অস্বীকার করবে বলে মনে করে, সে তাঁকে স্মরণ করুক যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না ও যিনি একদিন বলেছিলেন, *আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব* (খ)।

এদিকে, যেহেতু মথি লিখেছিলেন, '*আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব*' কিন্তু লুক লিখেছিলেন, '*মানবপুত্রও ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে স্বীকার করবেন*'(গ), সেজন্য আমি এমনটা ধরে নিচ্ছি যে, হয় তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত যিনি, অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যিনি (ঘ), তিনিই সাক্ষ্যদাতাকে স্বর্গে পিতার সাক্ষাতে স্বীকার করেন; কিন্তু মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত যিনি (ঙ), যিনি এর ফলে মানবপুত্র, তিনিই সাক্ষ্যদাতাকে ঈশ্বরের দূতদের সামনে স্বীকার করবেন; তিনিই সেই নারীর গর্ভে জন্ম নিলেন যিনি নিজেও ছিলেন মানুষ, আর সেইজন্য তিনি মানবপুত্র বলে অভিহিত; তা এমন শব্দ যা দ্বারা আমরা যিশু সম্পর্কে তাঁর মানুষ-অবস্থা বুঝি। আর যারা অস্বীকার করে, তাদের বেলায় একই যুক্তি প্রযোজ্য।

উপরন্তু, আমাদের এটাও মেনে নিতে হবে যে, মানুষদের সাক্ষাতে যে পুত্রকে স্বীকার করে, তার পক্ষে যতটা করা উচিত, সেই অনুসারে সে যাদের সাক্ষাতে স্বীকার করে, তাদের কাছে খ্রিষ্টধর্মকে ও খ্রিষ্টধর্মের পিতারই প্রশংসা করে। কিন্তু নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত ও মানবপুত্র যিনি, যে তাঁরই দ্বারা স্বীকৃত, সে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবপুত্রের দ্বারা স্বর্গে পিতার কাছে ও ঈশ্বরের দূতদের কাছে প্রশংসিত। আর যখন যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয় (চ), তখন আমরা কি এমনটা ধরে নেব না যে, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত,

যে স্বর্গে পিতার কাছে ও ঈশ্বরের দূতদের কাছে সেই সুপারিশের যোগ্য বলে বিচারিত? আর যখন যে যোগ্য বলে প্রমাণিত হলো সেই ব্যক্তি ও তারা তার সদৃশ যারা, প্রভু যাদের পীড়ন দ্বারা পরীক্ষা করে ও হাপরে সোনার মত যাচাই করে আহুতিবলি রূপে গ্রহণ করলেন (ছ), তখন যারা পরীক্ষার হাপরে পরীক্ষিত হয়ে অস্বীকার করল, তাদের বিষয়ে আমাদের কী বলতে হবে? অস্বীকারের যোগ্য মানুষদের [অর্থাৎ নকল খ্রিষ্টিয়ানদের] যে অস্বীকার করে, সে স্বর্গে পিতার সাক্ষাতে ও ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাদের পরীক্ষিত বলে কিন্তু প্রমাণিত-নয় বলে অস্বীকার করে।

৩৬। এবং কেবল অস্বীকারের বিরুদ্ধেই যে আমাদের লড়াই করতে হয় এমন নয়, কিন্তু এজন্যও লড়াই করতে হয় যেন, যখন ঈশ্বরের বিরোধীরা আমাদের বিষয়ে এমনটা ধরে নেবে যে, আমরা এমন কষ্ট ভোগ করছি যা সত্যিই লজ্জার যোগ্য, তখন আমরা যেন সেবিষয়ে লজ্জাবোধ না করি। হে আম্ব্রোজ, তুমি যে বহু বহু মহা নগরীতে সম্মান ও অভিনন্দনের পাত্র হয়েছিলে, একথা তোমারই বেলায় বিশেষভাবে সত্য যদি এখন, বলতে গেলে, তুমি যিশুর ক্রুশ বহন করতে করতে ও যিনি তোমাকে শাসনকর্তাদের ও রাজাদের সামনে নিয়ে যাচ্ছেন (ক), তাঁরই অনুসরণ করতে করতে শোভাযাত্রায় চল। তাঁর অভিপ্রায় হলো তোমার সঙ্গে থেকে যাওয়া ও তোমাকে ভাষা ও প্রজ্ঞা প্রদান করা; হে প্রতোক্তেতোস, তুমি যে আম্ব্রোজের সঙ্গী যোদ্ধা, তোমারও বেলায় সেকথা সত্য, ও অন্যান্য সেই তোমাদেরও বেলায় কথাটা সত্য যারা তাদের সঙ্গে সাক্ষ্যদান করছ ও যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা নিজেরাই পূরণ করছ (খ)। এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যাতে ঈশ্বরের পরমদেশের দিকের পথ তোমাদের দেখাতে পারেন, ও এমনটাও যেন দেখাতে পারেন, কী ভাবে তোমরা যেতে পার খেরুবদের মধ্য দিয়ে ও সেই অগ্নিময় খড়্গের মধ্য দিয়ে যা চারদিক-মুখী ও জীবনবৃক্ষের দিকের পথ রক্ষা করে (গ)। কেননা সেই খেরুবগণ ও খড়্গ দু'টোই জীবনবৃক্ষের দিকের পথ রক্ষা করে থাকে যাতে অযোগ্য কেউই সেই পথের মধ্য দিয়ে না যায় ও জীবনবৃক্ষের কাছে পৌঁছবার সাহস না করে। ভিত্তি সেই যিশুখ্রিষ্টের উপরে যারা কাঠ বা ঘাস বা খড় দিয়ে গাঁথল (ঘ) ও বলতে গেলে, অস্বীকারোক্তির সেই কাঠ দিয়ে গাঁথল যা সহজে আগুনে জ্বলে ওঠে ও পোড়াবার জন্য একেবারে উপযুক্ত, অগ্নিময় সেই খড়্গ তাদের বাধা দেবে। কিন্তু

সেই খেরুবগণ তাদেরই গ্রহণ করবে যারা অগ্নিময় সেই খড়্গ দ্বারা স্বভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে না যেহেতু তারা গাঁথবার জন্য এমন কিছু ব্যবহার করেনি যা আগুনে জ্বলে ওঠে; আর সেই খেরুবগণ জীবনবৃক্ষের কাছে ও ঈশ্বর যত গাছ পুবদেশে রোপণ করেছিলেন ও ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছিলেন [ঙ], সেই সমস্ত গাছের কাছেও চালনা করবেন। অতএব, যেহেতু খ্রিষ্টই হলেন পরমদেশ অভিমুখে তোমার পথদিশারী, সেজন্য তোমরা সেই সাপকে অবজ্ঞা কর যে সাপ পরাভূত হয়েছে ও যিশুর পায়ের নিচে চূর্ণ হয়েছে, এমনকি তোমাদেরও পায়ের নিচে চূর্ণ হয়েছে তাঁরই মধ্য দিয়ে যিনি সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরেও তোমাদের অধিকার দিলেন যাতে কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি না করে [চ]।

৩৭। সুতরাং, আমাদের ঈশ্বরের পুত্রকেও অস্বীকার করতে নেই, তাঁর বিষয়ে বা তাঁর বাণী বিষয়েও লজ্জাবোধ করতে নেই; বরং আমাদের এবাণী শুনতে হবে, *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব* [ক], এবং *যে কেউ আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন নিজের গৌরবে ও পিতার ও পবিত্র দূতবাহিনীর গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন* [খ], এবং *কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে নিজের পিতার গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন* [গ]।

যিশু একদিন ‘*ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক’রে ক্রুশ সহ্য করলেন*’ ও সেইজন্য ‘*ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিলেন*’[ঘ]। এবং লজ্জা অবজ্ঞা করায় যারা তাঁর অনুকরণ করে, তারা তাঁর সঙ্গে আসন নেবে ও স্বর্গে *রাজত্ব করবে তাঁরই সঙ্গে* [ঙ] যিনি পৃথিবীতে নয়, কিন্তু আপন শিষ্যদের প্রাণেই শান্তি ও পৃথিবীতে খড়্গ আনবার জন্য এসেছিলেন [চ]। কেননা, যেহেতু *ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর, যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ, ও প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়, ও হৃদয়ের বাসনা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিচার করে* [ছ], সেজন্য এই খড়্গ, বিশেষভাবে এখন, আমাদের প্রাণকে সমস্ত ধারণার অতীত সেই শান্তিরই পুরস্কার প্রদান

করে যা তিনি আপন প্রেরিতদূতদের কাছে রেখে গেছিলেন (জ)। কিন্তু তিনি মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ও স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তির মধ্যে (ঝ) একটা খড়্গ রেখেছেন, যাতে এসময়ে আমাদের স্বর্গীয় অংশ গ্রহণ করায় তিনি পরে, আমরা দু'ভাগে বিভক্ত না থাকার যোগ্য হলে তবেই তিনি আমাদের সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়জন করতে পারেন।

তাছাড়া তিনি পৃথিবীতে কেবল খড়্গ নয়, আগুনও আনবার জন্য এসেছিলেন, যা বিষয়ে নিজে বলেন, *আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত* (ঞ)। অতএব, এই আগুন তোমাদের অন্তরেও জ্বলতে থাকুক যাতে তোমাদের যত পার্থিব ও দৈহিক চিন্তা বিনাশ করে। এবং সেই যে বাপ্তিস্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যিশু সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন (ট), তোমরা এখনই অধিক আগ্রহের সঙ্গে সেই বাপ্তিস্ম নাও। আর তুমি, [হে আম্ব্রোজ,] তোমার যে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই ও বোনেরা আছে, সেই তুমি এই উক্তি স্মরণ কর, '*কেউ যদি আমার কাছে আসে ও নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোনকে … ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না*'। আর তোমরা দু'জনেই, [হে আম্ব্রোজ ও প্রতোক্তেতোস,] এ স্মরণ কর যে, '*কেউ যদি আমার কাছে আসে ও আগে উল্লিখিত সবকিছুর সঙ্গে নিজের প্রাণকেও পর্যন্ত ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না*'(ঠ)। তাই তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রাণ ঘৃণা কর যাতে তা ঘৃণা করায় অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করতে পার। কেননা তিনি বলেন, *এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে* (ড)। অতএব, যিশু যে ঘৃণা শেখান তা যে মঙ্গলকর ও উপযোগী, এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তোমরা অনন্ত জীবনের খাতিরে তোমাদের নিজেদের প্রাণ ঘৃণা কর; এবং আমাদের প্রাণ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রক্ষা করার জন্য যেমন আমাদের নিজেদের প্রাণ ঘৃণা করতে হয়, তেমনি তুমিও, [হে আম্ব্রোজ,] যেহেতু তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই ও বোনেরা আছে, সেজন্য তোমাকে তাদের ঘৃণা করতে হবে যাতে করে, সেই ঘৃণার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠে ও ফলত তাদের উপকার করার জন্য পূর্ণ মুক্তি লাভ ক'রে তুমি যাদের ঘৃণা কর তাদের সহায়তা করতে পার।

৩৮। আর সেইসঙ্গে তাঁরই কথা স্মরণ কর যিনি আত্মায় সেই সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করছিলেন যাদের সাক্ষ্যমরেরা প্রভুর ভালবাসার খাতিরে ফেলে রেখেছিলেন, ও সেই

প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বলছিলেন *দন্ডিতদের মৃত্যু থেকে বাঁচাও* (ক)। শুধু একথা মনে রেখো যে, মাংসের সন্তানেরাই যে ঈশ্বরের সন্তান (খ) এমন নয়। এবং আব্রাহামের বংশধরদের যেমন বলা হয়, *'তোমরা যে আব্রাহামের বংশ, আমি তা জানি'* ও *'তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে'*(গ), তেমনি তোমাদের সন্তানদেরও বলা হবে, 'তোমরা যদি আম্ব্রোজের সন্তান হও, তাহলে আম্ব্রোজেরই কাজ অনুসারে কাজ কর'। আর সম্ভবত তারা সেই অনুসারে কাজ করবে যেহেতু তুমি তাদের সঙ্গে থাকতে যা করতে, তার চেয়ে তেমন মৃত্যুর পরে তুমি তাদের আরও বেশিই সাহায্য করবে; কেননা সেসময় তুমি যদি এমনটা জানতে পার যে তারা তোমার বংশ শুধু নয় বরং তোমার সন্তান, তবে তাদের আরও বেশি সদ্বিবেচনার সঙ্গে ভালবাসবে ও আরও বেশি প্রজ্ঞাময় ভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করবে। তাই তোমার মুখে একথা প্রস্তুত থাকুক, *'যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়'* ও *'যে কেউ নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে'*(ঘ)।

৩৯। সাক্ষ্যমরণের প্রতি তোমাদের আগ্রহে তোমাদের পিতার সেই আত্মাকে স্থান দাও যিনি, নিজেদের ধর্মের জন্য যাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়, তাদের অন্তরে কথা বলেন (ক)। তোমরা যখন যান যে তোমরা ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র এমনকি ভক্তিহীন বলে গণ্য, তখন এই উক্তি গ্রহণ করে নাও, *যেহেতু তোমরা জগতের নও, সেজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত* (খ)। যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাস রেখেছ, তাঁর দ্বারা শেষ পর্যন্ত সেই খ্রিষ্টের খাতিরে বহু অপবাদ ও বহু বিপদ সহ্য কর। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকায়ই এগিয়ে চল, কেননা *যে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে সে পরিত্রাণ পাবে* (গ)। এটাও জেনে নাও যে, পিতর অনুসারে তোমরা আনন্দিত হবে যদিও *এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে যেন তোমাদের বিশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেয়ে এমনকি আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান, সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন যিশুখ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের দিনে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়* (ঘ)। উপরন্তু, "দুঃখকষ্ট" শুনে তা "যন্ত্রণা' অর্থে বোঝ যেইভাবে *যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান*

প্রসব করবে [ঙ] বচনে স্পষ্ট প্রবাশ পায়; কেননা সন্তান প্রসব করার সময়ে নারী আদৌ "দুঃখকষ্ট" ভোগ করে না, "যন্ত্রণাই" ভোগ করে।

খ্রিষ্টের শিষ্যদের জন্য এই বচন উপকারী ছিল, *জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না! কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই। কেননা জগতের যা কিছু আছে—দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত। আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই* [চ]। অতএব, যা লোপ পেতে চলছে তা তোমরা ভালবেসো না; বরং ঈশ্বরের ঈচ্ছা পূরণ করায় পুত্রের ও পিতার ও আত্মার সঙ্গে এক হবার যোগ্য হয়ে ওঠ, ত্রাণকর্তার সেই প্রার্থনা অনুসারে যিনি বলেছিলেন, *আমি ও তুমি যেমন এক, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে এক হতে পারে* [ছ]। *জগৎকে ও জগতের কোন কিছু* [জ] ভালবাসায়, ও অতিরিক্ত ভারী বোঝায় ভারাক্রান্ত ও অস্বীকার-জনিত পতনে ভারাক্রান্ত বিবেক বহন করায় নিজেদের প্রাণ হারিয়ে বা বিনাশ করায় জীবনের কত দিন অর্জন করা সম্ভব? আমাদের এক একজন স্মরণ করুক সে কত কাল সাধারণ মৃত্যু বরণ করতে বিপন্ন হয়েছে, এবং এসো, আমরা এমনটা ভাবি যে হয় তো আমাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে যেন আমাদের নিজেদের রক্তে বাপ্তিস্ম নিয়ে ও সমস্ত পাপ থেকে ধৌত হয়ে আমরা আমাদের জীবনকাল আমাদের সঙ্গী যোদ্ধাদের সঙ্গে স্বর্গীয় বেদির ধারে অতিবাহিত করতে পারি [ঝ]।

৪০। কিন্তু যে কেউ জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তির খাতিরে বা কষ্টভোগের সম্মুখে নিজের দুর্বলতার খাতিরে বা নিজের কাছে সম্ভাব্য যুক্তির খাতিরে এমনটা হতে দেয় যাতে যারা হীনতম আচরণের প্রতি আমাদের মন জয় করতে সচেষ্ট আছে, তারা তাদের নিজেদের দিকে তাকে আনে, ও সে যদি এমনটা অস্বীকার করত যে এক ঈশ্বর ও এক খ্রিষ্ট আছেন এবং অপদূতদের ও ভাগ্য-দেবকে স্বীকার করত, তবে সে এ জানুক যে, সে *'একটা অপদূতের জন্য ভোজনপাট সাজিয়ে'* ও *'ভাগ্য-দেবের জন্য পানপাত্র পূর্ণ করায়'* [ক] প্রভুকে পরিত্যাগ করে ও তেমন অপকর্মে সায় দেওয়ায় তাঁর পবিত্র পর্বতকে ভুলে যায়; এ এমন কিছু যা ইশাইয়া এভাবে বর্ণনা করেন, *কিন্তু তোমরা যারা আমাকে ত্যাগ করছ ও আমার পবিত্র পর্বত ভুলে যাচ্ছ, ও অপদূতের জন্য ভোজনপাট সাজিয়ে থাক, এবং*

নিরূপণী-দেবীর উদ্দেশে পানপাত্র পূর্ণ করে থাক, তোমাদের আমি খড়্গের জন্যই নিরূপণ করব ও তোমাদের সকলকে বধ করা হবে; কারণ আমি ডাকলাম, কিন্তু তোমরা বাধ্য হওনি, আমি কথা বললাম, কিন্তু তোমরা কান দিলে না, বরং আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই তোমরা করেছ ও যাতে আমি প্রীত নই, তা-ই তোমরা বেছে নিয়েছ। অতএব প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন, দেখ, আমার আপন দাসেরা খাবে, কিন্তু তোমরা ক্ষুধায় ভুগবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা পান করবে, কিন্তু তোমরা পিপাসায় ভুগবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা আনন্দিত হবে, কিন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে, কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে, আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে। কারণ তোমরা আমার নাম আমার মনোনীতজনদের পরিতৃপ্তির জন্য রেখে যাবে ও প্রভু তোমাদের বিলুপ্ত করবেন [(খ)]। তাছাড়া, 'প্রভুর ভোজনপাট' যে কী, তোমরা যদি তা বোঝ ও তাতে অংশ নিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের একথাও জানতে হবে যে, *প্রভুর ভোজনপাটের অংশভাগী হবে, আবার অপদূতদের ভোজনপাটেরও অংশভাগী হবে, তা হতে পারে না* [(গ)]। আর যদি আমরা '*আমি তোমাদের বলছি, যে দিনে আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না*'[(ঘ)] বচনের অর্থ বুঝি, ও আমরা এমনটা ইচ্ছা করি আমরা তাদেরই সঙ্গে স্থান পাব যারা খ্রিষ্টের সঙ্গে পান করে, তাহলে এসো, এ সতর্ক বাণী শুনি, *তোমরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করবে, আবার অপদূতদের পাত্র থেকেও পান করবে, তা হতে পারে না* [(ঙ)]।

আর যে কেউ বজ্র-সন্তান যোহনকে [(চ)] একথা বলতে শুনেছে তথা *সে পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার করে … পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি; পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে* [(ছ)], সে যে খ্রিষ্টিয়ান নয় তেমন কথা বলায় সে যে পুত্রকে অস্বীকার করছে তাতে সে কি এমনটায় ভয় পাবে না যেহেতু পুত্রকে অস্বীকার করায় সে পিতার আর অধিকারী নয়? এবং পিতাকেও পাবার জন্য এমন কেইবা থাকবে যে কাজে ও কথায় নিজেকে খ্রিষ্টিয়ান স্বীকার করতে উৎসাহিত হবে না? কারণ যারা স্বীকার করে, তারা পিতাকে পায়।

৪১। অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে পার হওয়ায় আমরা যখন মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি [ক], তখন জগৎ যে আমাদের ঘৃণা করে তাতে আমরা যেন বিস্মিত না হই। কেননা যে কেউ মৃত্যু থেকে জীবনে পার হতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু মৃত্যুতে থেকে গেছে, যারা মৃত্যুর অন্ধকারময় বাসস্থান থেকে, বলতে গেলে, জীবন্ত প্রস্তরে নির্মিত ও জীবনের আলোতে পূর্ণ গৃহগুলোতে পার হয়েছে [খ], সে তাদের ভালবাসতে পারে না। যিশু আমাদের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিয়েছেন [গ], তাই এসো, আমরাও আমাদের প্রাণ সঁপে দিই, আমি তো “তাঁর জন্য” বলছি না, কিন্তু নিজেদেরই জন্য, এবং আমি মনে করি, তাদেরও জন্য যাদের আমাদের সাক্ষ্যমরণে গেঁথে তোলা হবে। খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের জন্য গর্ববোধ করার সময় উপস্থিত; কেননা শাস্ত্রে বলে, *আর শুধু তা নয়, আমরা নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা আশাভ্রষ্ট করে না। শুধু এমনটা দাও যাতে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় পবিত্র আত্মা দ্বারা* [ঘ]। পল যখন বলতে পারতেন, *এফেসসে যদি মানব উদ্দেশ্য নিয়েই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করে থাকতাম* [ঙ], তখন আমরা বলতে পারতাম, ‘জার্মানিতে যদি মানব উদ্দেশ্য নিয়েই আমাকে হত্যা করা হত’[চ]।

৪২। যদি *খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্টের দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে* [ক], তাহলে এসো, খ্রিষ্টের যন্ত্রণা জনিত উৎসাহ সাগ্রহে গ্রহণ করি ও সেই যন্ত্রণা উপচে পড়ুক যদি আমরা সত্যিই সেই উপচে পড়া সান্ত্বনাও আকাঙ্ক্ষা করি যা দ্বারা তারা সকলেও সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হবে যারা শোকার্ত [খ], যদিও হয় তো সেই সান্ত্বনা সকলের জন্য একই হবে না। কেননা যদি সেই সান্ত্বনা প্রত্যেকের জন্য একই হত, তাহলে *খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে* [গ] বচনটা লেখা হত না। যারা যন্ত্রণায় সহভাগী, তারা খ্রিষ্টের সঙ্গে যে যন্ত্রণার সহভাগী হয়, সেই অনুপাতে সান্ত্বনারও সহভাগী হবে। আর আমরা তাঁরই কাছ থেকে এসব কিছু শিখি যিনি অটল নিশ্চয়তার সঙ্গে এ উক্তি উচ্চারণ করেছিলেন তথা, *আমরা জানি, তোমরা যেমন আমাদের যন্ত্রণার, তেমনি আমাদের সান্ত্বনারও সহভাগী হবে* [ঘ]।

[নবী ইশাইয়ার নিম্নলিখিত বাণীর আলোতে অরিগেনেস এখান থেকে ৪৩ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ২ করি ৬:২-১০ ব্যাখ্যা করেন।]

এবং নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে* [ঙ]। আমরা যখন খ্রিষ্টে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির খাতিরে জগতের সামনে রক্ষীবাহিনীর মাঝে পরাজিত হিসাবে নয়, বরং বিজয়ী হিসাবেই জয়যাত্রায় চালিত হচ্ছি, তখন এ সময়ের চেয়ে অধিক প্রসন্নতার কোন্ সময় থাকতে পারে? কেননা খ্রিষ্টে সাক্ষ্যমর যারা তারা তাঁর সঙ্গে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে, ও যেমন তাঁর যন্ত্রণার অংশী হয়ে উঠেছিল তেমনি তাঁর যন্ত্রণায় সাধিত সাহসপূর্ণ কর্মকীর্তির অংশী হয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বিজয়েরও অংশী হয় [চ]। তেমন কর্মকীর্তিসমূহে রয়েছে সেই সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের উপর জয়লাভ যেগুলো অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা পরাভূত ও লজ্জায় অভিভূত অবস্থায় দেখতে পাবে। তবে, যে দিন আমরা সেইসব কিছু থেকে তেমন নিস্তার পাই, সেই দিনের চেয়ে আর কোন্ দিন আরও বড় পরিত্রাণের দিন হতে পারে? আমি কিন্তু তোমাদের অনুরোধ করছি: *'তোমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটিয়ো না'* যেন এমনটা না হয় যে প্রবীণবর্গ বা পরিসেবকবর্গ তোমাদের দ্বারা দোষী বলে পরিগণিত হন; *'তোমরা বরং সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী'* [ছ]। *'মহা নিষ্ঠার সঙ্গে'* তোমরা বলে ওঠ, *আর এখন, আমার নিষ্ঠা কী? সেটা কি স্বয়ং প্রভু নয়?* [জ]; নানা *'ধরনের ক্লেশে'* এতে নিশ্চিত হও যে, *ধার্মিকের অনেক ক্লেশ আছে* [ঝ]; *'প্রয়োজনে'*, এসো, সেই সুখ যাচনা করি যা আমাদের জন্য প্রয়োজন; *'সঙ্কটে'*, এসো, সেই সঙ্কটাপন্ন ও সঙ্কীর্ণ পথে নির্দ্বিধায়ই চলি [ঞ] যাতে জীবনের নাগাল পেতে পারি। এমনটা প্রয়োজন হলে, তবে এসো, আমরা *'প্রহার, কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পরিশ্রম, অনিদ্রা ও অনাহারে'*ও [ট] নিজেদের জন্য সুপারিশ রাখি। কেননা দেখ, প্রভু এখানেই উপস্থিত, ও এক একনকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী দেওয়ার মত মজুরি তাঁর হাতে রয়েছে [ঠ]।

৪৩। এবার এসো, আমরা এমনটা প্রমাণ করি যে, সদ্‌জ্ঞানের সমীচীন কর্ম বিষয়ে আমরা *'সদ্‌জ্ঞান'* বাসনা করেছি; যেকোন পাপকর্ম জনিত যেকোন ধরনের কলুষ থেকে সমস্ত 'সুচিতা' আমাদের অন্তরে ব্যক্ত হোক। সহিষ্ণু ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে ও সহিষ্ণু

খ্রিষ্টের ভাই হিসাবে, এসো, আমাদের যা কিছু ঘটে তাতে ‘*সহিষ্ণুতা*’ দেখাই, কেননা *সহিষ্ণু যে মানুষ, সে বড় সুবুদ্ধির অধিকারী, কিন্তু যে ক্রোধে প্রবণ, সে মূর্খ* (ক)। ‘*গৌরবে*’ নিজেদের জন্য সুপারিশ ক’রে ও সেই গৌরবে গর্বিত না হয়ে গিয়ে আমাদের যখন ‘*ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে*’ নিজেদের জন্য সুপারিশ করতে হয়, তখন এসো, ‘*অপমান*’ও সহ্য করি (খ); আমরা যদি ‘*সুনামের*’ সমুচিত জীবন যাপন করে থাকি ও আমাদের বিষয়ে কুশল কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে এবার এসো, ভক্তিহীনদের কাছ থেকে ‘*দুর্নাম*’ও সহ্য করি। আরও, সত্যপ্রেমিক মানুষদের দ্বারা যদি আমরা ‘*সত্যবাদী*’ বলে প্রশংসিত হয়ে থাকি, তাহলে এবার এসো, যখন লোকে আমাদের ‘*প্রবঞ্চিত*’ বলে, তখন একটু হাসি। যে সমস্ত বিপদ থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি, সেই সমস্ত বিপদের সময়ে অনেকে বলছিল, আমরা নাকি ঈশ্বরের কাছে ‘*সুপরিচিত*’; এবার, যখন আমরা সম্ভবত আরও সুপরিচিত, তখন যে কেউ আমাদের ‘*অপরিচিত*’ বলে চিহ্নিত করতে ইচ্ছা করে সে তা-ই করুক। তাই, আমাদের যা কিছু ঘটছে তা সহ্য করায় আমরা ‘*দণ্ডিত*’ কিন্তু এখনও ‘*মৃতপ্রায়*’ নই, এবং ‘*আনন্দিত*’ হয়েও তবু দেখতে আমরা তাদেরই মত যারা ‘*দুঃখান্বিত*’(গ)।

৪৪। পল কোন এক স্থানে তাদেরই কাছে কথা বলেন যারা প্রথমে নিষ্ঠাবান হয়েছে এবং তাদের সাহস দেন যেন বাণীর কারণে যে দ্বিতীয় পালার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা প্রথম নিষ্ঠার মত নিষ্ঠায় সহ্য করে চলে, *তোমরা আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল—কখনও কখনও সকলের চোখের সামনে নিজেরাই নানা অত্যাচারে ও ক্লেশের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, কখনও কখনও তাদেরই পাশে দাঁড়িয়েছিলে যারা এই ধরনের দুর্দশা ভোগ করছিল। কেননা তোমরা বন্দিদের দুঃখকষ্টের সহভাগী হয়েছিলে, এবং তোমাদের যত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল, তা মনের আনন্দেই মেনে নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে, তোমরা শ্রেয়তর সম্পদের অধিকারী, আর সেই সম্পদ নিত্যস্থায়ী। তাই তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে। তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন* (ক)। অতএব, এসো, সকলের চোখের সামনে নানা অত্যাচারে ও ক্লেশের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ও আমাদের সম্পদ যে

কেড়ে নেয়া হচ্ছে তা সানন্দেই মেনে নিয়ে এখনও যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করি; কেননা আমরা এতে নিশ্চিত যে, আমরা এমন শ্রেয়তর সম্পদের অধিকারী যা পার্থিব বা শারীরিক নয়, বরং সেই সম্পদ এমন যা অদৃশ্য ও অশরীরী। এবং আমরা দৃশ্য বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য করি না, যেহেতু আমরা উপলব্ধি করি যে, সেই সমস্ত কিছু ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অপর সমস্ত কিছু অনন্তকালস্থায়ী (খ)।

বিশ্বাস ক্ষেত্রে অলসতা দণ্ডনীয়

৪৫। এদিকে কেউ না কেউ আছে যারা অপদূতদের স্বভাবের বিষয়ে এমনটা বিচার-বিবেচনা করে না, অর্থাৎ পৃথিবীর কাছাকাছি এই ঘন বায়ুমণ্ডলে টিকে থাকবার জন্য সেগুলোর পক্ষে আহুতি থেকে আগত খাদ্য একান্ত প্রয়োজন, ফলত সেগুলো এমন জায়গাগুলোর উপরে লক্ষ রাখে যেখানে সবসময় রয়েছে ধূম, রক্ত ও ধূপ। আর সেই অনুসারে সেই বিবেচনাহীন লোকেরা বলিদান করা লঘুভার ও নিরীহ ব্যাপার মনে করে। এক্ষেত্রে আমরা বলব যে, যারা ডাকাত ও খুনীদের জন্য, এমনকি মহান এক রাজার বর্বর শত্রুদের জন্য খাদ্য যোগায়, তারা যখন গণকল্যাণ বিরুদ্ধ কাজ করছে বলে দণ্ডিত হয়, তখন যারা বলিদানের মধ্য দিয়ে অনিষ্টের চাকরদের সেই খাদ্য দান করে যা সেগুলোকে এ পার্থিব অঞ্চলের কাছাকাছি থাকবার সুযোগ দেয়, তারা আরও বেশি কঠোর ও মহৎ ন্যায্যতা অনুসারে বিচারিত হওয়ার যোগ্য, বিশেষভাবে তখনই যখন একথা জেনেও যে, *একমাত্র প্রভুর কাছে ছাড়া অন্য দেবতার কাছে যে বলি উৎসর্গ করে, তাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা হবে* (ক), কিন্তু তবু তারা তাদেরই কাছে বলি উৎসর্গ করতে থাকে যারা পৃথিবীর যত অমঙ্গলকর অবস্থার জন্য দায়ী। এমনকি, আমি মনে করি যে, যে অপদূতেরা এসমস্ত অপকর্ম সাধন করে, যারা বলিদান করায় তাদের খেতে দেয়, মানবজাতি-বিরোধী অপকর্ম সাধনকারী সেই অপদূতদের চেয়ে তারা কম দায়ী নয়। কেননা অপদূতেরা ও যারা অপদূতদের পৃথিবীতে রাখে, উভয়ই মানবসমাজে অমঙ্গল আনবার দায়ে যৌথ দায়িত্ব বহন করে, কেননা ধূম ও আহুতি ছাড়া ও তাদের দেহের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত সেই খাবার ছাড়া অপদূতেরা টিকে থাকতে পারত না।

৪৬। উপরন্তু, কেউ না কেউ আছে যারা এমনটা মনে করে যে, নামগুলো এমনিই গতানুগতিক একটা ব্যাপার মাত্র, ও নামগুলো যা যা বর্ণনা করে তার সঙ্গে সেগুলো প্রকৃতিগত কোন সম্পর্ক রাখে না। তাতে তারা মনে করে যে, যখন এক ব্যক্তি বলে, "আমি 'আদি ঈশ্বরকে' বা 'দিওসকে' বা 'জেউসকে' উপাসনা করি", তখন এতে কোন পার্থক্য নেই, একইপ্রকারে যখন এক ব্যক্তি বলে, "আমি 'সূর্যদেবকে' বা 'আপল্লোসকে' বা 'চন্দ্রকে' বা 'আর্তেমিস দেবীকে' বা ভূমিতে স্থিত আত্মাকে' বা 'দেমেত্রা দেবীকে' ও গ্রীকদের প্রজ্ঞাবানেরা যাদের কথা বলে তাদের সম্মান ও মেনে নিই", তখন তাতেও কোন পার্থক্য নেই। এধরনের মানুষকে একথা বলতে হবে যে, নাম-বিষয়টা খুই গভীর ও দুর্বোদ্ধ বিষয়বস্তু; আর কেউ যদি সেটা বুঝত, সে এমনটা দেখত যে, নামগুলো যদি এমনিই গতানুগতিক ব্যাপার মাত্র, তাহলে আমরা যা অপদূত বলে থাকি বা অদৃশ্য অন্য পরাক্রম যখন তাদের ডাকা হয়, তখন যে কেউ তাদের না জেনেও গতানুগতিক সেই নাম উচ্চারণ করত তেমন মানুষের প্রতি তারা বাধ্য হত না। অথচ পূর্ণশ্বাসাঘাত বা শ্বাসাঘাতহীন ও হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরবর্ণ বিশিষ্ট এমন স্বর, পদাংশ ও বাক্য রয়েছে যা জোর গলায় উচ্চারিত হলে অদৃশ্য কোন না কোন প্রাকৃতিক প্রভাব দ্বারা তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করে যাদের আমরা ডাকি। ব্যাপারটা এরকম হলে ও নামগুলো এমনিই গতানুগতিক না হলে, তবে সেই "আদি ঈশ্বরকে" অন্য নাম দিয়ে ডাকা যাবে না, বরং শুধু সেই নামগুলো দিয়ে ডাকা যাবে যে নামে মোশি, নবীগণ ও আমাদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু নিজেই তাঁকে ডাকতেন যেমন 'সাবাহোথ' [সেনাবাহিনীর], 'আদোনাই' [প্রভু], 'শাদ্দাই' [সর্বশক্তিমান], ও পরবর্তীতে 'আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর। '*কেননা*', লেখা আছে, '*এই নাম চিরকালস্থায়ী; আর এটিই পুরুষে পুরুষে হবে স্মৃতিচিহ্ন*'(ক)। এবং আদি-ঈশ্বর বলে উপাসনার পাত্র হবার লক্ষ্যে অপদূতেরা যে নিজ নিজ নাম সেই আদি-ঈশ্বরকে আরোপ করে, তা আদৌ বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা তাদের ব্যবহার নয় যারা সেইভাবে উপাসনা করে যেভাবে আমরা করি, এবং এটা নবীদেরও ব্যবহার নয়, বিধানের পূর্ণতা সেই খ্রিষ্টেরও ব্যবহার নয়, প্রেরিতদূতদেরও ব্যবহার নয়। আমরা প্রয়োজনবোধেই এ সমস্ত কথা উপস্থাপন করেছি, পাছে কেউ না কেউ মিথ্যা যুক্তি দ্বারা আমাদের প্রতারণা করে বা আমাদের যুক্তি একেবারে কলঙ্কিত

করে। তেমন যুক্তিসমূহের বিষয়ে আমাদের সতর্কতাপূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে যাতে আমাদের বিপক্ষদের কাছে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ না দেওয়া হয়।

সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে শেষ উৎসাহ-কাণী

৪৭। উপরন্তু, ঈশ্বরের সঙ্গে একপ্রকার আত্মীয়তার অধিকারী যে প্রাণ, এক ব্যক্তি সেই প্রাণের যুক্তিবিশিষ্ট সত্তা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হয়েও তবু সে তখনও জীবনকে ভালবাসতে পারে; কেননা, জীবন ও প্রাণ দু'টোই বুদ্ধিগত ও অদৃশ্য, এবং অপরাজেয় যুক্তি যেভাবে প্রমাণিত করে, সেই অনুসারে দু'টো অশরীরী। কেননা যুক্তিবিশিষ্ট প্রাণী স্বভাবে যা আকাঙ্ক্ষা করে তা যদি তাদের পক্ষে অসম্ভব ও অপ্রাপ্য হত, তাহলে কেনই বা আমাদের নির্মাতা আমাদের অন্তরে সত্যকার ধর্ম ও তাঁর নিজের সঙ্গে সহভাগিতার সেই আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করতেন যা আমরা হোঁচট খেলেও ঐশইচ্ছার কোন না কোন চিহ্ন রক্ষা করে? আর যেমন এটাই স্পষ্ট যে, আমাদের অঙ্গগুলোর এক একটা স্বভাবেই স্বীয় স্বীয় সম্পর্কটা রক্ষা করার জন্য গঠিত, যথা দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে চোখের সম্পর্ক, শ্রবণযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে কানের সম্পর্ক, তেমনি আমাদের মনও যা কিছু বোধগম্য তার সঙ্গে, ও বোধগম্যের অতীত যিনি সেই ঈশ্বরেরও সঙ্গে নিজের স্বীয় সম্পর্ক রক্ষা করে থাকে। তাই কেনই বা আমরা পিছটান দিয়ে, যা আমাদের বাধা দেয় ও আমাদের প্রাণের উপর চাপ দেয় এই ক্ষয়শীল দেহকে, বহু দুশ্চিন্তাপূর্ণ মনের জন্য যা ভারী বোঝা স্বরূপ এই পার্থিব তাঁবুকে ত্যাগ করতে (ক) ও আমাদের যত বন্ধন ছিন্ন করতে ও রক্তমাংসের যা স্বীয় সম্পদ সেই উত্তাল তরঙ্গ থেকে বিদায় নিতে দ্বিধা করি? (খ)। কেননা তবেই খ্রিষ্টযিশুর সঙ্গে সুখের স্বীয় সম্পদ উপভোগ করতে ও তাঁকে তাঁর পূর্ণতায় তথা সেই জীবনময় বাণীতে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারব; হ্যাঁ, তাঁর দ্বারা পুষ্টিলাভ ক'রে ও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান সেই বহুবিধ প্রজ্ঞা উপলব্ধি ক'রে ও প্রকৃত সত্যে মুদ্রাঙ্কিত হয়ে আমরা জ্ঞানের সত্যকার ও অফুরন্ত আলো দ্বারা মনে প্রদীপ্ত হয়ে সেই সমস্ত কিছুর দর্শন পেতে পারব যা প্রভুর আজ্ঞাবলি দ্বারা আলোকিত চোখে (গ) সেই আলো দ্বারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

৪৮। বহুদিন আগে আমরা যিশুর বাণী শুনেছিলাম ও যথেষ্ট সময় অতীত হয়েছে যে সময়ে আমরা সুসমাচারের শিষ্য হয়েছিলাম, এবং সবাই নিজেদের জন্য ঘর গেঁথেছি। কিন্তু আমরা যে কোথায় সেই ঘর গেঁথেছি, গভীরে মাটি খুঁড়ে শৈলের উপরে বা ভিত ছাড়া বালুর উপরে যে সেই ঘর গেঁথেছি, তা এ বর্তমান লড়াই দেখাবে (ক)। কেননা বৃষ্টি ও বন্যা ও বাতাস (বা লুক যা 'জলস্রোত' বলেন, তা) এনে ঝড়ঝঞ্ঝাই আসন্ন, আর যখন সেই সবকিছু সেই ঘরে আঘাত হানে, তখন হয় সেইসব কিছু ঘর টলাবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় ঘর পড়ে যাবে না যেহেতু ঘরটা শৈল-খ্রিষ্টের উপরেই গাঁথা ছিল, না হয় সেইসব কিছু বাড়িটা দুর্বল বলে প্রমাণিত করবে যেহেতু সেটাতে যা আঘাত হানল তার কারণে বাড়ি পড়ে যাবে। এমনটা না হোক যে আমাদের ঘরের ঠিক সেই দশা হবে, কেননা অস্বীকারোক্তিতে পতন তা বড়ই বটে, বা লুকের কথা অনুসারে, ভিত ছাড়া বাড়ির *ধ্বংস কেমন সাংঘাতিক* (খ)। অতএব এসো, প্রার্থনা করি যেন সেই বুদ্ধিমান লোকের মত হতে পারি যে নিজের ঘর শৈলের উপরে গেঁথেছিল (গ)। সেইসব কিছু তথা '*স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগুলো*' থেকে আগত বৃষ্টি, বা আমাদের শত্রুদের তথা '*সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের*' নদনদী, বা '*এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের*'(ঘ) পাঠানো ঝড়ো বাতাস বা পাতালের আত্মগুলো থেকে আসা জলস্রোত তেমন বাড়িতে আঘাত হানুক, কিন্তু সেগুলো শৈলের উপরে গাঁথা আমাদের ঘরের বিরুদ্ধে নিজেরাই ভেঙে যাবে যার ফলে ঘরের যে পতন হয়নি ও টলমল হতেও শুরু করেনি তা শুধু নয়, তাছাড়া আমাদের কারণে সেইসব কিছু নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলাফল আমাদের উপরে না চালিয়ে বরং নিজেরাই তা ভোগ করবে। আর যখন তোমরা সেই বিরোধী প্রভাবকে চূর্ণ করবে, তখন এসো, আমরা প্রত্যেকে বলে উঠি, আমি *মুষ্টিযুদ্ধ করি*, *কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়* (ঙ)।

৪৯। উপরন্তু, যেহেতু 'বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়লেন', সেজন্য এসো, আমরা এমনটা দেখাই যে, পথের ধারে যারা ছিল তাদের মত নয়, বা পাথুরে জায়গা বা কাঁটাঝোপের মতও নয় বরং উত্তম মাটির মতই আমাদের আত্মা তাঁর বীজ গ্রহণ করল (ক)। যেহেতু যিশুর বাণী পথের ধারেও পড়েনি, কাঁটাঝোপের মধ্যেও পড়েনি, সেজন্য আমাদের উপর যতখানি নির্ভর করে সেই অনুসারে আমরা প্রভুতে গর্ববোধ

করব। কেননা যা বলা হচ্ছিল, আমরা তা বুঝতে পেরেছি। আর সেইজন্যই আমাদের হৃদয়-গভীরে যা বোনা হয়েছিল, সেই ধূর্তজন তা কেড়ে নিতে পারেনি। এমনকি, অনেকেই আমাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, বীজটা কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা হয়নি, কারণ তারা দেখতে পাবে যে, এজগতের চিন্তা হোক, ঐশ্বর্যের প্রতারণা হোক, বা জীবনের অভিলাষ হোক, কোন কিছুই আমাদের আত্মায় বোনা ঈশ্বরের বাণীকে বাধা দিতে পারেনি। আমরা ঈশ্বরের বাণী একবার গ্রহণ করে থাকলে লোকেরা যত খুশিই সন্দেহ করুক সেই বাণী পাথুরে জায়গায় বা উত্তম মাটিতে পড়েছে কিনা। কেননা সেই বাণীর কারণে ইতিমধ্যে ক্লেশ ও নির্যাতন জেগে উঠেছে ও সেই মহা পরীক্ষার কালও এসে গেছে যখন যা কিছু পাথুরে জায়গায় বোনা হয়েছে তা প্রকাশ পাবে, সেইভাবে যেভাবে তারাও প্রকাশ পাবে যারা যথেষ্ট গভীরে মাটি খুঁড়েনি ও যিশুকে নিজেদের প্রাণের গভীরে গ্রহণ করেনি। কিন্তু বাণীকে যে উপলব্ধি করে, সে ফলপ্রসূ হয় ও শতগুণ ফল দিতে দিতে নিষ্ঠা দ্বারা সেই বাণীকে শেষ পর্যন্ত রাখে।

আমরা তো শুনি শাস্ত্র কেমন করে তাদের কথা উপস্থাপন করে যারা পবিত্র শিক্ষা সানন্দে গ্রহণ করেছে বলে দেখিয়ে ক্লেশ ও নির্যাতনের সময়ে হোঁচট খায়। তাদের শিকড় নেই বলে ও ফলত ক্ষণিকের মত বিশ্বাস করে বলেই তারা হোঁচট খায়। মথি অনুসারে পাঠ্যাংশ এ, *সেও আছে যে পাথুরে মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে, কিন্তু তার অন্তরে শিকড় নেই; সে তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা দিলেই তার পতন হয়* (খ); মার্ক অনুসারে আমরা পড়ি, *তারাও আছে যারা পাথুরে মাটিতে বোনা: এরা এমন মানুষ যারা বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে; কিন্তু তাদের অন্তরে শিকড় নেই; তারা তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা দিলেই তাদের পতন হয়* (গ); লুক অনুসারে আমরা পড়ি, *তারাই পাথরের উপরের লোক, যারা শুনে আনন্দের সঙ্গেই সেই বাণী গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের শিকড় নেই: এরা মাত্র ক্ষণিকের জন্যই বিশ্বাস করে, ও পরীক্ষার সময়ে সরে পড়ে* (ঘ)। কিন্তু যারা উত্তম ফল দেয়, তাদের বিষয়ে শাস্ত্র এ শিক্ষা দেয়, *সেও আছে যে উত্তম মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনে তা বোঝে; সে-ই বাস্তবিক ফলবান হয়: সে কখনও একশ' গুণ, কখনও ষাট গুণ, কখনও ত্রিশ গুণ ফল দেয়* (ঙ); অথবা আবার অন্যরাও

আছে যারা উত্তম মাটিতে বোনা: এরা এমন মানুষ যারা সেই বাণী শুনে গ্রহণও করে, এবং কেউ কেউ একশ' গুণ, কেউ কেউ ষাট গুণ, কেউ কেউ ত্রিশ গুণ ফল দেয় (চ); অথবা *আর যা উত্তম মাটিতে পড়ল, তা এমন লোক, যারা সুন্দর ও উদার মনে বাণী শুনে তা আঁকড়ে ধরে রাখে: এরা নিষ্ঠা দ্বারাই ফল দেয়* (ছ)।

সুতরাং, যেহেতু প্রেরিতদূত অনুসারে *তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি* (জ), উত্তম মাটিতেই খেত ও শৈলের উপরেই গাঁথনি, সেজন্য এসো, ঈশ্বরের গাঁথনি হিসাবে আমরা ঝড়ঝঞ্ঝার সামনে অটল হয়ে দাঁড়াই, ও ঈশ্বরের খেত হিসাবে আমরা যেন সেই ধূর্তজন সম্পর্কে বা সেই ক্লেশ ও নির্যাতন সম্পর্কে না ভাবি যা বাণীর কারণে বা এযুগের উদ্বেগ বিষয়ে বা ঐশ্বর্যের প্রতারণা সম্পর্কে বা জীবনের অভিলাষ সম্পর্কে দেখা দেয়; বরং এসমস্ত কিছু অবজ্ঞা করে, এসো, আমরা সেই প্রজ্ঞার আত্মা গ্রহণ করে নিই যা উদ্বেগহীন (ঝ), সেই ঐশ্বর্যের দিকে ধাবিত হই যা সম্পূর্ণরূপে প্রতারণাবিহীন, সেই অভিলাষের দিকে চলি যা, বলতে গেলে, '*পরমানন্দের পরমদেশের*'(ঞ) অভিলাষ। আমাদের প্রতিটি সঙ্কটে, এসো, একথা ভাবি যে, *এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী অতি গুরুতর ভার অর্জন করছে, যেহেতু আমরা দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি* (ট)।

৫০। আমরা যেন এবিষয়েও সচেতন হই যে, যখন আবেলকে অন্যায়কারী সেই খুনী কাইন দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল, তখন তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, তা সেই সকলেরও ক্ষেত্রে উপযুক্ত যাদের রক্ত অন্যায়ভাবে পাতিত হয়েছে; কেননা আমরা মনে করি যে, *তোমার ভাইয়ের রক্তের কণ্ঠ মাটি থেকে আমার কাছে চিৎকার করছে* (ক) বচনটা প্রতিটি সাক্ষ্যমরের বেলায়ও প্রযোজ্য যাদের রক্তের কণ্ঠ মাটি থেকে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করে।

আর এমনটাও হতে পারে যে, যেমন আমরা সেই যিশুর মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছি যিনি এমন নাম পেয়েছেন যা সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম (খ), তেমনি কেউ না কেউ সাক্ষ্যমরদের মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্তি লাভ করে। আর তাঁরা যদি এমনি ধার্মিক মানুষ হতেন কিন্তু সাক্ষ্যমর হতেন না, তাহলে যে উত্তোলনে উত্তোলিত হতেন, সেটার চেয়ে সাক্ষ্যমর হওয়ায় তাঁরা আরও বেশি ঊর্ধ্বতর উত্তোলনে উত্তোলিত। কেননা

সাক্ষ্যমরণে সেই যে বিশেষ ধরনের মৃত্যু হয়, তা ‘উত্তোলন’ বলে অভিহিত করা ন্যায়সঙ্গত, যেইভাবে এ বচন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, *আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (গ)। তাই এসো, আমাদের নিজেদের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে উত্তোলিত করে তাঁকে গৌরবান্বিত করি, কারণ সাক্ষ্যমর নিজের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন। এটাই আমরা যোহন থেকে তখনই শিখেছি যখন তিনি বলেন, *তিনি [পিতর] যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন* (ঘ)।

৫১। আমার সাধ্যমত ও যতখানি সম্ভব হয়েছে এটিই হলো তোমাদের প্রতি আমার কথা যা, প্রার্থনা রাখি, তোমাদের বর্তমান লড়াইতে তোমাদের উপকারে আসবে। কিন্তু যদি এমনটা হয় যে, বিশেষভাবে এখন যখন তোমরা ঈশ্বরের রহস্যগুলো সম্পর্কে আরও বেশি দেখবার যোগ্য হয়েছ, যদি তোমরা এমন মহত্তর ও প্রচুরতর জ্ঞানের অধিকারী হও যা সামনে যা রয়েছে তার জন্য আরও বেশি কার্যকর, যার ফলে আমার এসমস্ত কথা শিশুসুলভ ও অতি সাধারণ বলে তুচ্ছ কর, তাহলে আমি নিজেই বাসনা করছি তেমনটাই যেন তোমাদের বেলায় ঘটে। কেননা তোমরা যেন “আমার দ্বারা” তত নয় বরং “যেকোন উপায়েই” কৃতকার্য হতে পার, এটাই তোমাদের জন্য আসল কথা। ঈশ্বর করুন যেন তোমরা আরও ঐশ্বরিক ও বিবেচনাপূর্ণ কথা দ্বারা, সমস্ত মানব প্রকৃতির সাধ্যের চেয়েও মহত্তর কথা দ্বারা, ও স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রজ্ঞা দ্বারা কৃতকার্য হতে পার।

---

১ (ক) ইশা ২৮-৯-১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ১ করি ৩:১ দ্রঃ।

(গ) লুক ২:৫২ দ্রঃ।

(ঘ) হিব্রু ৫:১২ দ্রঃ।

২ (ক) রো ৮:১৮।

(খ) ২ করি ৪:১৭।

(গ) ২ তি ২:৫ দ্রঃ।

(ঘ) ২ করি ৪:৭।

৩ (ক) ফিলি ৩:২১।

(খ) রো ৭:২৪।

(গ) প্রজ্ঞা ৯:১৫ দ্রঃ।

(ঘ) ২ করি ৫:৪ দ্রঃ।

(ঙ) রো ৭:২৫।

(চ) সাম ৪২:২-৩।

(ছ) সাম ৪২:৪-৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৪ (ক) প্রেরিত ৫:৪১ দ্রঃ।

(খ) মথি ৫:১০-১২; লুক ৬:২৩ দ্রঃ।

(গ) ফিলি ২:৫ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ৪২:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) ফিলি ৪:৭ দ্রঃ।

(চ) ২ করি ৫:৮।

(ছ) সাম ৪২:৬, ১২।

(জ) ইশা ৫১:৭।

(ঝ) ইশা ৬:১০; মথি ১৩:১৫; প্রেরিত ২৮:২৭ দ্রঃ।

৫ (ক) আদি ১২:১।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৯; কল ১:১২ দ্রঃ।

(গ) রো ৮:৬।

(ঘ) ১ পি ২:৯; যাত্রা ১৯:৬; ইশা ৪৩:২০-২১ দ্রঃ।

(ঙ) যাত্রা ২০:৩; ২৩:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(চ) রো ১০:১০ দ্রঃ।

(ছ) ইশা ২৯:১৩; মথি ১৫:৮ দ্রঃ।

৬ (ক) যাত্রা ২০:৪ দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ২০:৫ দ্রঃ।

(গ) এখানে এমনটা মনে হচ্ছে, অরিগেনেস জ্ঞানমার্গ-ভ্রান্তমতপন্থীদের সেই ধারণা পরিদর্শন করছেন যা অনুসারে সাক্ষ্যমরণ তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কেননা, তাদের মতে, মানুষ প্রতিমা পূজা করেলেও ও মুখে প্রভুকে অস্বীকার করলেও যখন মনে প্রভুতে বিশ্বাস রাখে, তখন সাক্ষ্যমরণের আর কী দরকার আছে? অরিগেনেস পুরা এই ৬ অধ্যায়ের যুক্তি ৭ অধ্যায়ে খণ্ডন করেন।

(ঘ) গণনা ২৫:১ দ্রঃ।

(ঙ) গণনা ১:২-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(চ) যাত্রা ৩২:৮ দ্রঃ।

(ছ) দ্বিঃবিঃ ১৩:৪; ৬:৫; মথি ২২:৩৭ দ্রঃ।

(জ) দ্বিঃবিঃ ১৩:৫ দ্রঃ।

(ঝ) কল ২:১৯।

৭ (ক) মথি ১২:৩৬; প্রবচন ১৫:২৬ দ্রঃ।

(খ) এখানে অরগেনেস ৬ অধ্যায়ের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করেন: মানুষ যে প্রভুকে মনে বিশ্বাস করবে ও সেইসাথে তাঁকে মুখে অস্বীকার করবে (৬ অধ্যায় 'গ' টীকা দ্রঃ), তা চলবে না।

(গ) মথি ৫:৩৪।

(ঘ) মথি ৫:৩৫-৩৬ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ১২:৩৬।

(চ) দ্বিঃবিঃ ১৭:৩; ৪:১৯ দ্রঃ।

(ছ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৯।

(জ) মার্ক ১০:১৮; লুক ১৮:১৯; মথি ১৯:১৭ দ্রঃ। অরিগেনেস 'পিতা' শব্দটাও যোগ করেন।

(ঝ) মথি ৪:১০; দ্বিঃবিঃ ৬:১৩; ১০:২০ দ্রঃ।

(ঞ) রো ৮:২০-২১; প্রজ্ঞা ৯:১৫; ১ শামু ২৫;২৯ দ্রঃ।

৮ (ক) দ্বিঃবিঃ ১৮:২০, ২২।

(খ) ১ করি ১২:৮ দ্রঃ।

(গ) সাম ৩৮:১৪-১৫।

৯ (ক) যাত্রা ২০:৫ দ্রঃ।

(খ) কল ১:১৫ দ্রঃ।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩২:২১-২২ সপ্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১০ (ক) ১ করি ৬:১৬।

(খ) মথি ১০:৩২-৩৩। মথি ১০:৩৩ পদ পাণ্ডুলিপিতে নেই কিন্তু বক্তব্যের অর্থের জন্য প্রয়োজন।

(গ) লুক ৬:৩৮; মথি ৭:২; মার্ক ৪:২৪ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ২৩:৩২ দ্রঃ।

(ঙ) লুক ৬:৩৮।

১১ (ক) হিব্রু ৩:১৪ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ৩:১২ দ্রঃ।

১২ (ক) মথি ১৬:২৪-২৫।

(খ) মথি ১৬:২৬-২৭।

(গ) সুসমাচারের উল্লিখিত বচনে ‘প্রতিদিন’ শব্দটা বাদ পড়া।

(ঘ) লুক ৯:২৩-২৫।

(ঙ) সুসমাচারের উল্লিখিত বচনে ‘আমার জন্য ও’ বাক্যটা বাদ পড়া।

(চ) মার্ক ৮:৩৪-৩৫।

(ছ) গা ২:২০।

(জ) আদি ১:২৭ দ্রঃ।

(ঝ) ১ পি ১:১৯ দ্রঃ।

১৩ (ক) ইশা ৪৩:৩-৪ সপ্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১৩:১২ দ্রঃ।

(গ) ২ করি ১২:২, ৪ দ্রঃ।

(ঘ) হিব্রু ৪:১৪।

(ঙ) সাম ১০৪:৪; হিব্রু ১:৭।

(চ) রো ৮:২১।

১৪ (ক) ‘যখন মানবপুত্র’ এর স্থানে অরিগেনেস ভুলবশত ‘যখন ঈশ্বর’ শব্দটা ব্যবহার করছেন।

(খ) মথি ১৯:২৭-২৯।

(গ) এফে ৩:১৫ দ্রঃ।

(ঘ) আদি ১৫:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১৫ (ক) হিব্রু ৪:১২।

(খ) প্রবচন ২৩:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

১৬ (ক) মথি ১৯:২৭-২৯; মার্ক ১০:২৮-৩০ দ্রঃ।

(খ) মথি ২২:৩০; মার্ক ১২:২৫।

১৭ (ক) যোশুয়া ২৪:১৪ক।

(খ) যোশুয়া ২৪:১৪খ।

(গ) যোশুয়া ২৪:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঘ) যোশুয়া ২৪:১৬-১৭।

(ঙ) যোশুয়া ২৪:১৬-১৭।

(চ) ১ শামু ২:২৫।

১৮ (ক) ১ করি ৪:৯।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৯; কল ১:১২ দ্রঃ।

(গ) সাম ৯৮:৮ সত্তরী পাঠ্য ; ইশা ৫৫:১২ দ্রঃ।

(ঘ) ইশা ১৪:৯-১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) ইশা ১৪:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(চ) ইশা ১৪:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ছ) মথি ৫:১৬ দ্রঃ।

(জ) ইশা ১৪:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঝ) ইশা ১৪:১৯-২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঞ) মথি ১০:৩৭।

(ট) ১ রাজা ১৮:২১।

১৯ (ক) সাম ৪৪:১৪-১৭।

(খ) সাম ৪৪:১৮-১৯।

২০ (ক) সাম ৪৪:১৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) সাম ৪৪:২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) সাম ৪৪:২১-২২।

২১ (ক) ২ করি ১:১২।

(খ) সাম ৪৪:২২-২৩।

(গ) রো ৮:৬ দ্রঃ।

(ঘ) প্রবচন ৭:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২২ (ক) উপ ৪:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ২ মাকা ৬:১৯।

(গ) ২ মাকা ৬:২২-২৮।

(ঘ) ২ মাকা ৬:৩০।

(ঙ) ২ মাকা ৬:৩১।

২৩ (ক) ২ মাকা ৭:২।

(খ) ২ মাকা ৭:৫।

(গ) ২ মাকা ৭:৬।

২৪ (ক) প্রজ্ঞা ৩:৬; প্রবচন ১৭:৩ দ্রঃ।

(খ) ২ মাকা ৭:৭।

(গ) ২ মাকা ৭:৮।

২৫ (ক) ২ মাকা ৭:১০-১১।

(খ) ২ মাকা ৭:১৪ দ্রঃ।

(গ) ২ মাকা ৭:১৫-১৭ দ্রঃ।

(ঘ) ২ মাকা ৭:১৮-১৯; প্রেরিত ৫:৩৯।

২৬ (ক) ২ মাকা ৭:২৪।

(খ) ২ মাকা ৭:২৫।

(গ) ২ মাকা ৭:৩০-৩৫।

২৭ (ক) ২ মাকা ৭:৩০-৩৫।

(খ) সাম ১১৮:১৪।

(গ) ফিলি ৪:১৩; ১ তি ১:১২।

২৮ (ক) সাম ১১৬:১২-১৩।

(খ) মথি ২০:২২।

(গ) মার্ক ১৪:৩৬; মথি ২৬:৩৯।

(ঘ) যোয়েল ৩:৫; প্রেরিত ২:২১; রো ১০:১৩।

২৯ (ক) মথি ২৬:৩৯।

(খ) সাম ২৭:১-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) মথি ২৬:৩৯।

(ঘ) সাম ২৭:৩।

(ঙ) মথি ২৬:৩৯।

(চ) লুক ২২:৪২।

(ছ) মার্ক ১৪:৩৬।

(জ) সাম ১১৬:১৩, ১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩০ (ক) মথি ২০:২২।

(খ) মার্ক ১০:৩৮।

(গ) লুক ১২:৫০।

(ঘ) হিব্রু ৯:১৩; ১০:৪; সাম ৫০:১৩।

(ঙ) প্রকাশ ২০:৪; ৬:৯।

(চ) হিব্রু ৫:১; ৭:২৭; ৮:৩; ১০:১২।

(ছ) লেবীয় ২১:১৭-২১।

(জ) ১১ অধ্যায় দ্রঃ।

৩১ (ক) মথি ৭:১৪ দ্রঃ।

(খ) পরমগীত ২:১০-১১।

(গ) সাম ৯২:১৩।

৩২ (ক) মথি ৪:৯।

(খ) সাম ৯৬:৫; ১ বংশ ১৬:২৬ দ্রঃ।

(গ) প্রজ্ঞা ১৫:১০।

(ঘ) যেরে ১৬:১৯ দ্রঃ সত্তরী পাঠ দ্রঃ।

(ঙ) যেরে ১৬:১৯; ১৪:২২।

৩৩ (ক) দা ৩ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) এস্থার ৪:১৭ঙ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) যোব ৩১:২৭-২৮।

৩৪ (ক) মথি ১০:৫।

(খ) মথি ১০:১৭-২৩।

(গ) লুক ১২:১১-১২।

(ঘ) লুক ২১:১৪-১৯।

(ঙ) মার্ক ১৩:১১-১৩।

(চ) মথি ১০:২৮।

(ছ) 'দূরদৃষ্টি' : প্রার্থনা প্রসঙ্গ ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।

(জ) মথি ১০:২৯-৩৩।

(ঝ) লুক ১২:৪-৯।

(ঞ) লুক ৯:২৬।

(ট) মার্ক ৮:৩৮।

(ঠ) মথি ১০:২৮; লুক ১২:৪।

(ড) ইশা ৪৩:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঢ) লুক ১২:৪।

(ণ) যোহন ১৫:১৫ দ্রঃ।

(ত) মথি ১০:২৮।

(থ) লুক ১২:৫।

৩৫ (ক) রো ৮:১৮।

(খ) মথি ১০:৩৩।

(গ) মথি ১০:৩২; লুক ১২:৮।

(ঘ) কল ১:১৫; ২ করি ৪:৪; প্রজ্ঞা ৭:২৬ দ্রঃ।

(ঙ) রো ১:১৩।

(চ) ২ করি ১০:১৮।

(ছ) প্রজ্ঞা ৩:৬।

৩৬ (ক) মথি ১৬:২৪; মার্ক ৮:৩৪; লুক ৯:২৩।

(খ) কল ১:২৪ দ্রঃ।

(গ) আদি ৩:২৪।

(ঘ) ১ করি ৩:১২ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ২:৮-৯।

(চ) লুক ১০:১৯; রো ১৬:২০ দ্রঃ।

৩৭ (ক) মথি ১০:৩৩।

(খ) লুক ৯:২৬।

(গ) মার্ক ৮:৩৮।

(ঘ) হিব্রু ১২:২; ৮:১।

(ঙ) ২ তি ২:১২।

(চ) মথি ১০:৩৪।

(ছ) হিব্রু ৪:১২।

(জ) ফিলি ৪:৭; যোহন ১৪:২৭ দ্রঃ।

(ঝ) ১ করি ১৫:৪৯।

(ঞ) লুক ১২:৪৯; মথি ১০:৩৪।

(ট) লুক ১২:৫০।

(ঠ) লুক ১৪:২৬।

(ড) যোহন ১২:২৫।

৩৮ (ক) সাম ৭৯:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) রো ৯:৮ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৮:৩৭, ৩৯।

(ঘ) মথি ১০:৩৭, ৩৯।

৩৯ (ক) মথি ১০:২০ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৫:১৯ দ্রঃ।

(গ) মথি ১০:২২।

(ঘ) ১ পি ১:৬-৭।

(ঙ) আদি ৩:১৬।

(চ) ১ যোহন ২:১৫-১৭।

(ছ) যোহন ১৭:২১ দ্রঃ।

(জ) ১ যোহন ২:১৫; মথি ১০:৩৯; ১৬:২৫; মার্ক ৮:৩৫; লুক ৯:২৪; সাম ৩৮:৪ দ্রঃ।

(ঝ) প্রকাশ ৬:৯ দ্রঃ।

৪০ (ক) ইশা ৬৫:১১; প্রবচন ৯:২ দ্রঃ।

(খ) ইশা ৬৫:১১-১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১০:২১।

(ঘ) মথি ২৬:২৯।

(ঙ) ১ করি ১০:২১।

(চ) মথি ৩:১৭ দ্রঃ।

(ছ) ১ যোহন ২:২২-২৩।

৪১ (ক) যোহন ৫:২৪; ১৫:১৮; ১ যোহন ৩:১৪ দ্রঃ।

(খ) ১ পি ২:৫; যোহন ৮:১২; এফে ২:২০-২২ দ্রঃ।

(গ) ১ যোহন ৩:১৬ দ্রঃ।

(ঘ) রো ৫:৩-৫ দ্রঃ।

(ঙ) ১ করি ১৫:৩২।

(চ) যেমন প্রেরিতদূত পল (১ করি ১৫:৩২ দ্রঃ) এফেসসের কথা বলেন, তেমনি অরিগেনেস উদাহরণ স্বরূপ জার্মানির কথা উত্থাপন করেন কেননা রোম-সম্রাট মাক্সিমিনুস আগেকার সম্রাট আলেক্সান্দার সেভেরুসকে জার্মানিতে পরাজিত করেছিলেন ও যখন অরিগেনেস পুস্তিকা লিখছিলেন তিনি তখনও জার্মানিতে ছিলেন।

৪২ (ক) ২ করি ১:৫।

(খ) মথি ৫:৪ দ্রঃ।

(গ) ২ করি ১:৫।

(ঘ) ২ করি ১:৭ দ্রঃ।

(ঙ) ইশা ৪৯:৮; ২ করি ৬:২। নবী ইশাইয়ার এ বাণীর আলোতে অরিগেনেস এখান থেকে ৪৩ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ২ করি ৬:২-১০ ব্যাখ্যা করেন।

(চ) কল ২:১৫ দ্রঃ।

(ছ) ২ করি ৬:৩ দ্রঃ।

(জ) সাম ৩৯:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঝ) সাম ৩৪:২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঞ) মথি ৭:১৪ দ্রঃ।

(ট) ২ করি ৬:৫।

(ঠ) ইশা ৪০:১০; ৬২:১১; সাম ৬২:১২; রো ২:৬; প্রকাশ ২:২৩; ২২:১২।

৪৩ (ক) প্রবচন ১৪:২৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ২ করি ৬:৭-৮।

(গ) ২ করি ৬:৮-১০।

৪৪ (ক) হিব্রু ১০:৩২-৩৬।

(খ) ২ করি ৪:১৮ দ্রঃ।

৪৫ (ক) যাত্রা ২০:১৯।

৪৬ (ক) যাত্রা ৩:১৫।

৪৭ (ক) প্রজ্ঞা ৯:১৫ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ১:২৩; ১ করি ১৫:৫০ দ্রঃ।

(গ) সাম ১৯:৮; এফে ১:১৮ দ্রঃ।

৪৮ (ক) মথি ৭:২৪-২৮; লুক ৬:৪৮-৪৯ দ্রঃ।

(খ) লুক ৬:৪৯।

(গ) মথি ৭:২৪।

(ঘ) এফে ৬:১২ দ্রঃ।

(ঙ) ১ করি ৯:২৬।

৪৯ (ক) মথি ১৩:৩-৮।

(খ) মথি ১৩:২০-২১।

(গ) মার্ক ৪:১৬-১৭।

(ঘ) লুক ৮:১৩।

(ঙ) মথি ১৩:২৩।

(চ) মার্ক ৪:২০।

(ছ) লুক ৮:১৫।

(জ) ১ করি ৩:৯।

(ঝ) প্রজ্ঞা ৭:২৩।

(ঞ) আদি ৩:২৩ সত্তরী পাঠ্য।

(ট) ২ করি ৪:১৭-১৮।

৫০ (ক) আদি ৪:১০।

(খ) ১ পি ১:১৯; প্রকাশ ৫:৯; ফিলি ২:৯।

(গ) যোহন ১২:১২।

(ঘ) যোহন ২১:২৯।